পরিচয়

কলামন্দিরে নান্দীকার

৫টি কল্যাণকর উদ্দেশ্যে ১টি ধ্রুপদী নাটকের

৫টি বিশেষ অভিনয়

অতিথি শিল্পী শম্ভু মিত্র অভিনীত

নির্দেশনা : রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

* ২৯শে মে মঙ্গলবার ৬-৩০টা : কমলচন্দ্র ওয়েলফেয়ার সেন্টারের গৃহনির্মাণকল্পে
* ৩০শে মে বুধবার ৬-০০টা : সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজের গৃহনির্মাণকল্পে
* ২রা জুন শনিবার ৬-৩০টা : ইপার রেমিডিয়াল স্কুলের মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য
* **৩রা জুন রবিবার ৩টেয় : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলি প্রকাশকল্পে**
* ৩রা জুন রবিবার ৬-৩০টা : কেয়া চক্রবর্তীর রচনাবলি প্রকাশকল্পে

পরিচয়

১৯৫৬ সালে সংবাদপত্র রেজিসট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১ প্রকাশের স্থান—৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

২ প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক

৩ মুদ্রক—দেবেশ রায়, ভারতীয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭

৪ প্রকাশক—ঐ ঐ ঐ

৫ সম্পাদক—দেবেশ রায়, ভারতীয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৯

৬ পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর যে-সকল অংশীদার মূলধনের একশতাংশের অধিকারী, তাঁদের নাম ও ঠিকানা :

১। গোপাল হালদার, ফ্ল্যাট-১৯, ব্লক এইচ, সি. আই. টি. বিল্ডিংস, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪॥ ২। সুনীলকুমার বসু, ৭৩/এল, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৯॥ ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯॥ ৪। হিরণকুমার সান্যাল, ১২৪, রাজা সুবোধ-চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা-৪৭॥ ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭॥ ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭॥ ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭॥ ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৫/বি, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯॥ ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১।৩, ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯॥ ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১, নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-১২॥ ১১। বিনয় ঘোষ, ৪৭।৩, যাদবপুর সেনট্রাল রোড, কলকাতা-৩২॥ ১২। সত্যজিৎ রায়, ফ্ল্যাট-৮, ১।১ বিশপ লেফ্রয় রোড, কলকাতা-২০॥ ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায় (মৃত), ৪৫।৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯॥ ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯/এ, কবির রোড, কলকাতা-২৬॥ ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২/বি, সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২৯॥ ১৬। শান্তিময় রায়, 'কুসুমিকা', ৫২, গরফা মেন রোড, কলকাতা-৩২॥ ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, পূর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম॥ ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (মৃত), ৯।১, কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা-১৯॥ ১৯। নিবেদিতা দাশ, ৫৩/বি, গরচা রোড, কলকাতা-১৯॥ ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (মৃত), ৩/সি, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা-১৯॥ ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত

স্ট্রীট, কলকাতা-২০ ॥ ২২। শান্তা বসু, ১৩।১এ, বলবাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৪ ॥ ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭২, ডঃ শবৎ ব্যানার্জি বোড, কলকাতা-২৯ ॥ ২৪। ধীবেন বাষ, ১০।৬, নীলবতন মুখার্জি রোড, হাওড়া ॥ ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ ॥ ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩/ডি, ফিবোজ শাহ্ বোড, নয়াদিল্লী ॥ ২৭। সলিলকুমাব গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০, বামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬ ॥ ২৮। সুনীল সেন, ২৪, বসা রোড সাউথ (থার্ড লেন), কলকাতা-৩৩ ॥ ২৯। দিলীপ বসু, ২০০/এল, শ্যামা-প্রসাদ মুখার্জি বোড, কলকাতা-২৬ ॥ ৩০। সুনীল মুন্সী, ১৩, গবচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯ ॥ ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায, ২, পাম প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ৩২। হিমাদ্রিশেখব বসু, ৯/এ, বালিগঞ্জ ষ্টেশন বোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৩৩। শিপ্রা সবকাব, ২৩৯।এ, নেতাজী সুভাষ বোড, কলকাতা-৪০ ॥ ৩৪। অচিন্ত্যেশ ঘোষ, হিন্দুস্থান জেনাবেল ইনসিওবেন্স সোসাইটি লিমিটেড, ডি. বি. সি. বোড, জলপাইগুড়ি ॥ ৩৫। চিন্মোহন সেহানবীশ, ১৯, ডঃ শবৎ ব্যানার্জি বোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৩৬। বণজিৎ মুখার্জি, পি ২৬, গ্রেহামস লেন, কলকাতা-৪০ ॥ ৩৭। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাবতীয় দূতাবাস, ঢাকা, বাঙলাদেশ ॥ ৩৮। অমল দাশগুপ্ত, ৮৬, আশুতোষ মুখার্জি বোড, কলকাতা-২৫ ॥ ৩৯। প্রদ্যোৎ গুহ, ১/এ, মহীশূব বোড, কলকাতা-২৬ ॥ ৪০। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ৪০, বাধামাধব সাহা লেন, কল্কাতা-৭ ॥ ৪১। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫/বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯ ॥ ৪২। দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায, ৬১২।১, ব্লক-ও, নিউ আলিপুব, কলকাতা-৫৩ ॥ ৪৩। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮, বিপিনবিহাবী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ ৪৪। নির্মাল্য বাগচি, ফ্ল্যাট-বি সি ৩, পিকনিক পার্ক, পিকনিক গার্ডেন বোড, কলকাতা-৬ ॥ ৪৫। তরুণ সান্যাল, ৩১।২, হবিতকী বাগান লেন, কলকাতা-৬ ॥ ৪৬। বিদ্যা মুন্সী, ১৩, গবচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯ ॥ ৪৭। বেদুইন চক্রবর্তী, ফ্ল্যাট-২, ১০, বাজা বাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ ॥ ৪৮। অমিয় দাশগুপ্ত, ২, যদুনাথ সেন লেন, কলকাতা-৬ ॥ ৪৯। অজয় দাশগুপ্ত, ২০৮, বিপিনবিহাবী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ ৫০। সুবেন ধরচৌধুবী (মৃত), ২০৮, বিপিনবিহাবী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥

আমি দেবেশ বায় এতদ্বাবা ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসাবে সত্য।

স্বাঃ দেবেশ রায়

২০. ৩. ৭৯

'ইন্দিরা'-প্রকাশিত

নবজীবনের গান

ও

অন্যান্য

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

'পরিচয়'-কার্যালয়ে

পাওয়া যায়

৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৭

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

অশ্বমেধের ঘোড়া

পরিচয় কার্যালয়ে

পাওয়া যায়

৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৭

অখণ্ড বিশ্বাস

প্রথম ও শেষ কথা

যে কোন জনকল্যাণ সংস্থার পক্ষে এই বিশ্বাস অপরিহার্য।

নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই এই বিশ্বাস অর্জন করা অসম্ভব। ঐতিহ্যসমৃদ্ধ এই মহানগর। সেখানে প্রথম ভূগর্ভ রেল তৈরির কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত অজস্র কর্মী। আপনাদের এই অখণ্ড বিশ্বাসে তাঁরা আজ অনুপ্রাণিত।

আপনাদের সক্রিয় সমর্থনই আমাদের অগ্রগতির মূলমন্ত্র। এই সমর্থনেই আমাদের কাজের গতি আজ দ্রুততর, সুদূরের স্বপ্ন নিকটতর। প্রয়োজনীয় অর্থের আনুকূল্যে প্রায় সর্বত্রই আমরা কর্মতৎপর। শেষ লক্ষ্যে অব্যাহত গতি।

বিশ্বাস ও সমর্থন এমনি করেই অসম্ভবকে সম্ভব করে।

এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যার ফলে দূরতম স্বপ্ন নিকটতর হয়ে মধুর বাস্তবে পরিণত হয়।

দীপেন্দ্রনাথেব আকস্মিক অকাল প্রয়াণে আমাদেব শোকে ও বেদনায় তাঁব ঘনিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী সকলকেই আমবা একান্ত কবে পেযেছি। তাঁর শ্রদ্ধেয় আদর্শস্থানীয় গুকজন, প্রাণপ্রতিম সুহৃদ এবং স্নেহভাজন কনিষ্ঠ সকলেই আমাদের মূহ্যমান চিত্তকে স্নেহ, সমবেদনায় আশ্রয় দিযেছেন। আমাদেব শোকসন্তপ্ত দিনগুলিতে যাঁরা আমাদেব সঙ্গে ছিলেন, তাঁব আত্মাব উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্রদ্ধায় ছিলেন অংশভাক, তাঁদের সকলকে আমাদেব শ্রদ্ধাবনত চিত্তেব কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিভিন্ন সংস্থাব পক্ষ থেকে আমবা অজস্র শোকবার্তা পেযেছি, পত্রোত্তব দেওয়ার অক্ষমতা জানিযে ক্ষমা প্রার্থনা কবি ও আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবি।

চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয়

৪৮ বর্ষ ৭ম ও ৮ম সংখ্যা মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮৫ ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৭৯

পরিচয় প্রাঃ লিমিটেড-এর পক্ষে দেবেশ রায় কর্তৃক গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লে
থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

'পরিচয়'-এর পঞ্চাশ বৎসরে পৌঁছনোর আর-যখন সামান্যই বাকি তার পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সের সম্পাদকের এই স্মরণসংখ্যা অবশেষে আমাদের বের করতে হল।

ছাপার ব্যাপারে দীপেন্দ্রনাথ খুব খুঁতখুঁতে ছিলেন। বেশ কিছু বছর তিনি প্রায় একা 'পরিচয়'-এর সব লেখার সব প্রুফ দেখতেন। আর সেই ক-টি বছরে প্রায়-নির্ভুল ছাপা সম্ভব এমন একটি ধারণাও তিনি দিতে পেরে-ছিলেন। খুব ঝরঝরে, পরিষ্কার, একটু বোধহয় সাবেকি ছাঁচ ছিল তাঁর পছন্দ। সে সব কথা ভেবে এই সংখ্যা বের করতে লজ্জাই হচ্ছে। ছাপাখানার ধর্মঘট, টাইপ ফাউণ্ড্রির নানা গোলমাল, সবার ওপরে বিদ্যুৎ সরবরাহের অনিশ্চয়তা—এই সব কারণে আমাদের কাছে সবচেয়ে জরুরি হয়ে উঠেছিল ছেপে বের করাটাই। আর এমন তাড়াহুড়োতে যা যা ঘটার তাই হয়েছে।

এই সংখ্যা প্রকাশে সবার কাছ থেকেই আমরা সাহায্য পেয়েছি। অনেকে হয়ত লিখে উঠতে পারেন নি—লেখাটা বড় বেদনাদায়ক বলে। একটু দেরিতে হাতে আসায় একটি-দুটি লেখা আর দেয়া গেল না।

দীপেন্দ্রনাথের কাগজপত্র থেকে উদ্ধার করে শ্রীমতী চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন তাঁর পুরনো লেখাগুলি। 'পরিচয়'-এর কর্মী শ্রীমতী সুলেখা মল্লিক সেই সব খোঁজাখুঁজি ও টোকাটুকিতে খুব খেটেছেন। প্রুফ পরীক্ষায় যত্ন নিয়েছেন শ্রীপ্রশান্ত মিত্র ও শ্রীকেশব দাস।

১৮ মে, ১৯৭৯

সম্পাদক, পরিচয়

দীপেন্দ্রনাথের রচনা

'একজনের নাম দীপেন্দ্রনাথ'

প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রস্তুতিতে দীপেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতাটি করেছিলেন, দিল্লিতে। পরে ১৯৭০-এ এই লেখাটি পড়েছিলেন আকাশবাণীর কলকাতার বাঙলা গল্পের সাম্প্রতিক প্রবণতা সম্পর্কে এক আলোচনায়।

"একটা গল্প বলি। একজনের নাম দীপেন্দ্রনাথ। সে নিজের সম্পর্কে বেজায় খুঁতখুঁতে, কিন্তু পিতৃপুরুষের দেওয়া এই নাম তার খুব পছন্দ। দীপ-ইন্দ্র থেকে দীপেন্দ্র, অর্থাৎ সূর্য। লোকটা নিজের নাম সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। আর তার শুদ্ধতা বজায় রাখতেও সাধ্যমতো চেষ্টা করে থাকে।

কিন্তু বানান আর ব্যাকরণের প্রাথমিক সূত্রটুকুও সকলে মেনে চলে না। তাই নানা জনের হাতে পড়ে তার নামের অর্থ হরেক রকম হয়ে উঠল।

জেলখানায় একদিন সে চিঠি পেল। খামের ওপর প্রেরক তার নামের বানান লিখেছেন দ-য় ব-ফলা দীর্ঘ ই-কার, অর্থাৎ দ্বীপেন্দ্র। মানে—দ্বীপ। খামের ভেতরটা শূন্য ছিল। হাতের লেখা দেখে কিছুতেই সে বুঝতে পারল না ফাঁকা একটা এনভেলাপ কে পাঠিয়েছে। লোকটা হঠাৎ ধাক্কা খেল। এতদিন নিজেকে সে অনন্ত সৌরলোকের অবিচ্ছিন্ন অংশ মনে করত। জেলখানায় বসেও অনুভব করত আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আর ভিয়েতনাম মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম ইতিহাসের একই সূত্রে বাঁধা। চিঠি বিহীন সেই খামের দিকে তাকিয়ে লোকটা এই প্রথম একবার নিজের চারপাশ খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। তারপর নিজেকে সমুদ্রে ঘেরা নিঃসঙ্গ এক দ্বীপ কল্পনা করে হঠাৎ শিউরে উঠল।"

লোকটার এক শিল্পী বন্ধু ছিলেন। জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি বাড়ি বয়ে এসে একদিন লোকটিকে তাঁর চতুর্থ একক প্রদর্শনীর আমন্ত্রণপত্র দিয়ে গেলেন। লোকটা বেজায় খুশী হয়ে কার্ডখানা হাতে নিয়ে দেখল—তার নামের বানান লেখা হয়েছে দ-য়ে ব-য়ে হস্তি, অর্থাৎ দ্বিপেন্দ্র। শিল্পী রঙ আর রেখা বোঝেন ভালো, বাংলা বানান-টানান বেচারির আসেই না। এই নিয়ে সে খুব এক চোট ঠাট্টা করতে যাবে—হঠাৎ বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল। নিজের কুচ্ছিত মুখ আর উঁচু দাঁত কটা সে স্পষ্টই দেখতে পেল। তারপর দীর্ঘশ্বাস চেপে ভাবল—তাকে হস্তি এবং মূর্খ বলা যায় বৈকি! একদা এই বন্ধুর সঙ্গেই তো সে তার প্রথম ও অন্তিম প্রদর্শনী করেছিল।

যথাদিনে সে বন্ধুর "ক্রুদ্ধ আর বিমূর্ত আর বৈপ্লবিক" চিত্রাবলীর প্রদর্শনীতে গিয়ে ক্লাউন সিরিজের ভাঁড়ের সঙ্গে নিজের মুখের সাদৃশ্য দেখে একটুও বিস্মিত হলো না। বরং বেশ কিছু অনুরাগিণী পরিবৃত বন্ধুর শিল্প বিষয়ে নানা গূঢ় আর আত্মসন্তুষ্ট আলোচনা মন দিয়ে শুনল। তারপর সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে চেপে এলাকায় দৌড়ল। সেখানে মধ্যবর্তী নির্বাচন বয়কট করার জন্য কয়েকটা সুন্দর পোস্টার পড়েছে। তাকে নির্বাচন সফল করার আহ্বান জানিয়ে কয়েকটা ব্যানার আঁকতে হবে।

আর, তাদের সমস্ত কাঁটা ধন্য করে, তারপর একদিন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের আকাশে আলোর ফুল ফুটল। যুক্তফ্রন্টের বিজয় উৎসব!

তাকে চারদিক থেকে পরিচিতজনেরা "দীপেন দীপেন" বলে ডাকতে লাগলেন। সে কার ডাকে আগে সাড়া দেবে? ক রয়েছেন সব থেকে সামনে, যদি তাকে প্রথম সাড়া দেয়—খ তাহলে অবধারিত ভাবে নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করবেন। আর গ ভাববে ক নেতা, তাই সে তাঁকেই আগে রেকগনাইজ করছে। এবং ঘ ভাববে—বুদ্ধিজীবীরা মজুরের ডাকে সাড়া দেবে কেন?

কাউকে হাত নেড়ে, কাউকে চোখের ইশারায়, কাউকে হেসে, কাউকে বা দুটো কথা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে করতে সে ভাবতে লাগল—এই উৎসব সভায় তাকে খুঁজে বার করতে হবে, সেই মেয়েটিকে। ১৯৬৭ সালের বাইশে নভেম্বর এই প্যারেড গ্রাউণ্ডে যুক্তফ্রন্টের সভা করতে এসে এক অজ্ঞাতনামা তরুণী রক্তের ছোপধরা সবুজ মাঠে আড় হয়ে অচৈতন্য পড়েছিল। তার দিকে পেছন ফিরে উদ্যত অস্ত্র হাতে ক'জন সান্ত্রী দূরের কয়েকটা

গাছ কিছু মানুষের দিকে তাকিয়ে হিংস্র ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিল। বুট আর মোজাপরা লোমশ পাগুলোর কাছে যেন বা আকস্মিক আক্রমণে হতচেতন বাঙলাদেশ, যেন হাড়িকাঠের সামনে একরাশ ঝরা ফুল।

আজকের উৎসব সভায় লোকটা তাই সেই তরুণীকে খুঁজছিল। সে চাইছিল ঝাণ্ডা আর মানুষের তরঙ্গের মধ্যে সেই রমণী হাসিমুখে বুক চিতিয়ে হেঁটে বেড়াক।

ঘুরতে ঘুরতে জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা। গলায় লাল রোমাল বাঁধা আট-ন-বছরের দুরন্ত ছেলেটার হাত শক্ত করে ধরে রেখে জয়ন্তী তার সঙ্গে কথা বলছে—হঠাৎ হাজার হাজার মশালে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের আকাশ আলো হয়ে উঠল। আর পাখির ডানার মতো ঝাণ্ডা উড়ছে। আর জয়ধ্বনির সমুদ্রকল্লোল।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে লোকটার সাধ হলো চীৎকার করে গান গেয়ে ওঠে: "সার্থক জনম আমার .." ॥

মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে জয়ন্তী বলল: তোমাদের সত্যাগ্রহ সার্থক হলো দীপেন।

লোকটা উত্তর দিতে যাবে, তার আগে জয়ন্তীর হাতের বাঁধনে হাঁপিয়ে ওঠা বালক অবজ্ঞার সঙ্গে বলল: ছাই। দীপেন আবার একটা নাম! মানে কি?

লোকটা থতমত খেয়ে ভাবল—সত্যিই তো দী-পে-ন—এই শব্দ-সমষ্টির তো কোন অর্থ হয় না অথচ প্রায় সকলে তাকে এই নামেই ডেকে থাকে। কারণ পুরো নামটা বেজায় লম্বা, আর মানুষের স্বভাবই হচ্ছে বড়কে সুবিধেমতো ছোটো করে নেওয়া।

সভা শেষ হতে এখনও অনেক বাকি। কিন্তু প্রিয়তম নেতার বক্তৃতা শেষ হয়েছে। তার শ্রোতাদের বড় একটা অংশ মশাল হাতে শ্লোগান দিতে দিতে বাড়ি যাচ্ছে। প্যারেড গ্রাউণ্ডটাকে এখন খেলা শেষের ফুটবল গ্রাউণ্ডের মতো মনে হচ্ছে। মশালের সেই ছোটাছুটির দিকে তাকিয়ে লোকটা অন্যমনে ভাবতে লাগল—তাইতো! মানে কী? বালককে কী উত্তর দেবে? এই উৎসব সভায় দাঁড়িয়ে সে কি বলবে—কিছু লোক তাদের সুবিধের জন্য পবিত্র একটি নামকে নিছক অর্থহীন শব্দ-সমষ্টিতে পরিণত করেছে। সে তার বোঝা টেনে বেড়াচ্ছে মাত্র।

জয়ন্তী মুখ টিপে হেসে বলল : কেন, সুন্দর নাম। ডীপ মানে জানো না? দীপেন হচ্ছে গভীর, যাকে বলে অতলান্ত।

বালক সন্দেহে চোখ কুঁচকে বলল : কিন্তু কাকু কি সাহেব?

জয়ন্তী বলল : কাকু সাহেব বাঙালী সব। কাকু যে—

বালক বাধা দিয়ে বলল : তাহলে কাকু কিছু না!

জয়ন্তী বলল : তাহলে তোমার বাবুও কিছু না!

বালক রেগে উঠে বলল : কেন? আমার বাবু তো শ্রীবিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কি সাহেবদের মতো নাম?

লোকটা এতক্ষণে প্রশ্ন করল : বিপ্লব মানে কী?

বালক গম্ভীর হয়ে বলল : তুমি আমার দিদিমণি যে পড়া জিজ্ঞেস করছ?

লোকটা হেসে ফেলল। বালকও বেহাই পেয়ে খুশী। কিছুটা তোষা-মোদের সুরেই যেন বলল : ডি ডবল-ই পি ডীপ। ডীপ মানে গাঢ়। হ্যাঁ মা, গাঢ় মানে কি গভীর?

জয়ন্তী আড় চোখে লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল : হ্যাঁ।

আশ্চর্য এই সময়। কখনো সোজা কখনো জটিল পথ বেয়ে নিরন্তর সে তার ধ্রুব লক্ষ্যের দিকে চলেছে।

মানুষ ভিয়েতনামের জঙ্গলে বন্দুক হাতে লড়ছে। মানুষ গ্রীসের সামরিক কারাগারে লেনিন জন্মশতবার্ষিকী পালন করছে। মানুষ আফ্রিকার অন্ধকারে আলোর উপাসনায় মেতেছে। মানুষ কিউবার তামাক ক্ষেতে সভ্যতার অজেয় বনিয়াদ গড়ছে। মানুষ ভারতবর্ষের বসিরহাটে বেনামী জমি দখল করে সমবায় খামার গড়ে মহাভারতের দেশকে এক যুগসন্ধিক্ষণে পৌঁছে দিয়েছে।

আশ্চর্য এই সময়। নিজ গ্রহের সীমা অতিক্রম করে মানুষ তার সভ্যতাকে এক অভূতপূর্ব সম্ভাবনার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে।

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ আর ঐতিহাসিক এক শহরে মশার কামড় খেয়ে বৃষ্টির জলে ভেসে রোদের তাপে শুকিয়ে সেই মানুষটা বাঁচছে। সেই মানুষটা এই আশ্চর্য আর জটিল সময়ের সঙ্গে, এই গ্রহের সঙ্গে, অনন্ত সৌর জগতের সঙ্গে মানব সভ্যতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখার জন্য লড়াই করছে।

" লোকটা নিজের সম্পর্কে বেজায় খুঁতখুঁতে। নিজের নাম সম্পর্কে ভয়ানক স্পর্শকাতর। সে চায় শুদ্ধতা বজায় রেখে চলতে।

আর মাঝে মাঝেই ধাক্কা খায়। আর মাঝে মাঝেই নিজেকে প্রশ্ন করে—আমি কে? আমি কি সূর্য না জন্তু, আমি কি বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপ, না গভীর কোনো অস্তিত্ব? নাকি আমি কিছু না, কয়েকটা অর্থহীন শব্দের সমষ্টিমাত্র?

এই ভাবে বাঁচতে বাঁচতে লোকটা নিরন্তর নিজেকে খুঁজছে, নিজের নামের অর্থ খুঁজছে। আর, অনন্ত সৌরজগতের পটভূমিতে নিজেকে দাঁড করিয়ে বারবার প্রশ্ন করছে—আমি কে! আমি কেন! আমি কোথায়!"

লোকটা জানে সময়ের দায় মেটানোই হলো সময়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার একমাত্র শর্ত।

আমার মনে হয় আত্মসনাক্তকরণের এই আকুতি, ভবিষ্যতের কাছে এই সময়ের সাক্ষ্য বহনের আন্তরিক প্রয়াসই রবীন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ, ধূর্জটি-প্রসাদ, মানিক বাঁড়ুজ্যের বাঙলা গল্পের সাম্প্রতিক প্রবণতা হতে পারত!

১৭ই মার্চ, ১৯৭০

সূর্যমুখী

'পরিচয়', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১, জুন, ১৯৫৪-তে প্রকাশিত। এটি 'পরিচয়'-এ দীপেন্দ্রনাথের প্রথম রচনা—পূর্ব পাকিস্তান সফর সেরে।

ভয় ছিল ভেঙে পড়ব। ভয় ছিল হয় তো মুখ তুলে তাকাতে পারবো না। যেন বর্তমান শতাব্দীর অপরাধবোধ চেপে বসছে আমার কাঁধে। উত্তর দাবি করছে, চাইছে জবাব।

চিনতাম না। তবু, এতগুলি বিছানার মধ্যেও এক দৃষ্টিপাতে তাঁকে খুঁজে নিলাম। সাদা শাড়ি, সাদা জামার মধ্যে একখানি শ্বেত-মূর্তি। পায়ের দিকে খাটের গায়ে ঝোলানো জ্বরের চার্ট। ওদিকে একটা মিট্‌সেফ। ওপরে সুকান্তর বই কখানা ছড়ানো।

সুভাষদা আলাপ করিয়ে দিলেন। ইলা মিত্র আমার মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন। আবার তাকালেন। আবার চোখ বন্ধ করলেন। তারপর আবার তাকালেন, এবং তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

সুভাষদার হাতে নাজিম হিকমতের কবিতা। বললেন, পড়ে শোনাই ?

কিছুক্ষণ তাঁরও মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ইলা মিত্র। তারপর ঘাড় নাড়লেন আস্তে আস্তে। সঙ্গে ছিলেন আনোয়ার। তিনি বললেন ঃ আপনি বসুন সুভাষদা। বসে বসে পড়ুন।

বিছানাতেই বসলেন সুভাষদা কোনো রকমে। আমি তখনো দাঁড়িয়ে। ইলা মিত্র আঙুল দিয়ে ইশারা করে আমাকেও বসতে বললেন। অন্যমনস্ক ছিলাম। বসতে গিয়ে ইলা মিত্রের পায়ে আঘাত দিয়ে ফেললাম। চমকে সরে গিয়ে কপালে হাত ঠেকালাম আমি। দেখলাম, ইলা মিত্রের সেই রোগা রোগা হাতখানাও কপালের ওপর। না, মুহূর্তের জন্যও তাঁর মন নিষ্ক্রিয় হয় নি।

সুভাষদা বইয়ের পাতা উল্টিয়ে কবিতা খুঁজছিলেন। আমি দেখিয়ে দিলাম 'কলকাতার বাঁড়ুজ্যে'। পড়তে সুরু করলেন তিনি। পরপর পড়লেন আরও অনেক কবিতা। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠছেন ইলা মিত্র। কবিতায় যেখানে যেখানে অত্যাচারের বিবরণ আছে, সেইখানে চমকে উঠছেন হঠাৎ। সমস্ত দেহটা মুচড়ে, বিছানার ওপর বুক চেপে শুয়ে তিনি যেন চাইছেন শুধু শরীরের যন্ত্রণা নয়, মনের কতগুলো দুঃস্বপ্নকেও গুঁড়িয়ে ফেলতে।

তারপর আস্তে আস্তে নামল প্রশান্তি। স্থির, শান্ত চোখে ওপরের দিকে চেয়ে তিনি শুনতে লাগলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠ, নাজিম হিকমতের বাংলা অনুবাদ। কি আশ্চর্য যোগাযোগ, অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম।

তারপরেই মনে পড়ল।

গাঁয়ের চাষীরা বিদ্রোহ করলে, তেভাগা চাই। রাতারাতি জোতদার পাইক পাঠিয়ে মাটির বাঁধ কেটে দিল। বললে, জমিতে ধানের বদলে মাছের চাষ করবে সে। ভেসে গেল ঘর-দোর খেত-খামার। জল থইথই সেই মাটিতে তবু আশ্চর্যভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল একটা খেজুর গাছ। সেই পরিবেশে গাছটাকে দেখে অবাক হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল কান্না আর প্রতিজ্ঞা মেশানো এক সুকঠিন শপথ যেন।

ইলা মিত্রের মুখ আর চোখে আজ আবার দেখলাম সেই আকাশ-মুখীনতা।

ঠিক তখনই ভদ্রলোক এলেন। কবিতা-পড়া থামে নি কিন্তু। আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকেই প্রশ্ন করলেন তিনি: আপনি তো কাল যাচ্ছেন? ভদ্রলোকের গলায় অন্তরঙ্গতা।

হেসে বললাম: হ্যাঁ।

সুভাষবাবু তো পরশু যাচ্ছেন?

আবার বললাম: হ্যাঁ।

মনোজবাবুরা আজ চলে গেলেন, না?

এবারও একই উত্তর দিলাম। কোনো সন্দেহ মনে জাগে নি। দিনে লক্ষবার লক্ষজনকে দিতে হয়েছে কে কবে ফিরছেন তার ফিরিস্তি। সুতরাং—।

ভদ্রলোক হঠাৎ বোকার মতো একটু হাসলেন। ততক্ষণে সুভাষদা কবিতা পড়া থামিয়ে আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। অপ্রতিভের মতো আগন্তুক তাঁকে নমস্কার জানালেন। তারপর চারদিকে একবার তাকিয়ে ইলা মিত্রকে অত্যন্ত দ্রুত একটা নমস্কার নিবেদন করে চলে গেলেন তিনি।

ইলা মিত্র আমার দিকে তাকিয়ে ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন: কে?

বললাম: চিনি না তো।

সুভাষদার দিকে তাকালেন তিনি। তিনিও আমার কথারই প্রতিধ্বনি করলেন। হঠাৎ দুষ্টু মেয়ের মতো ফিক্ করে হেসে ফেললেন ইলা মিত্র। তারপর ফিসফিস করে বললেন: আই-বি।

ও। হেসে উঠলেন সুভাষদা। তারপর আবার ঝুঁকে পড়লেন কবিতার বইয়ের ওপর।

ঠিক কিছুক্ষণ গেল। তারপর এল নতুন একটা দল। কয়েকজন ভদ্রলোক এবং একটি ভদ্রমহিলা। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। চোখে কপোর ফ্রেমের চশমা। পরনে থান।

শুনলাম তিনি নাকি কোনো এক রাজবন্দীর মা। যতদূর মনে পড়ছে আনোয়ার বললেন, জেল-আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন এঁর ছেলে। তবু তো তিনি মা। ইলা মিত্রের মাথায় কপালে কয়েকবার হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। কোনো কথা বললেন না মা। কোনো কথা বলল না কেউ।

চোখ বুজে কুঁকড়ে ইলা মিত্র শু'য়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে মা কয়েক পা দূরে সরে গেলেন। এবং ছোট্ট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেলেন তাঁর দল নিয়ে।

আবার শুরু হল কবিতা-পাঠ। আই-বি-র অন্য একটি লোক এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। গলা বাড়িয়ে দেখতে চাইলেন কী বই পড়া হচ্ছে। আনোয়ারের হাতে ছিল সুভাষদার 'ভূতের বেগার'। আমার ইশারায় না নিজের বুদ্ধিতে জানি না, আনোয়ার বইটা বুকের ওপর এমন ভাবে চেপে ধরলেন যাতে দূর থেকে দেখা যায় বইটার নাম—ভূতের বেগার। ভদ্রলোক চলে গেলেন।

সেদিনের এক ঘণ্টায় অভিজ্ঞতা। কত রকমের কত লোকজন আসছেন ইলা মিত্রকে দেখতে। কথা কেউই বলছেন না। নীরবে শ্রদ্ধা জানিয়ে, স্নেহ জানিয়ে চলে যাচ্ছেন তাঁরা, বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেও দেন না আশপাশের রোগিণীরা। বলেন : আপনারা এবার যান। ওঁর শরীর ভালো নেই। শুনলাম হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, জমাদার প্রত্যেকেরই নাকি ইলা মিত্রের ওপর সশ্রদ্ধ সতর্ক দৃষ্টি। তাই তিনি বেঁচে আছেন, বেঁচে উঠছেন। আর মুহুর্মুহু আসছেন আই-বি-র লোকেরা। ইলা মিত্রের মুখের দিকে তাকাবার সাহস তাঁদের নেই। চোরের মতো ঘোরা-ফেরা করছেন বারবার। এবং চলে যাচ্ছেন।

গান শুনতে ইচ্ছে করে? হঠাৎ সুভাষদা জিজ্ঞেস করলেন। আমাদের মুখের দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে ইলা মিত্র ঘাড় নাড়লেন। যেন, 'না' বললে আমরা দুঃখ পাব, তাই 'হ্যাঁ' বলছেন। আনোয়ারকে সুভাষদা বললেন, 'মাঝে মাঝে রেকর্ড এনে আপনারা গান শুনিয়ে যাবেন।' আমি জুড়লাম, 'কেন, আপনাদের গায়কও তো আছেন অনেক।' ইলা মিত্র তাকিয়ে রইলেন একভাবে। আমাদের কোনো কথা শুনলেন কি শুনলেন না, বোঝা গেল না।

ঘণ্টা বেজে গেছে, এবার আমরা যাব। সুভাষদা এগিয়ে গেছেন। আমি ইলা মিত্রকে বললাম, 'কাল দুপুরে চলে যাচ্ছি। আর তো আসতে পারব না। কলকাতায় আপনাকে আমরা নিয়ে যাবই। তখন আবার দেখা হবে। আপনি আবার সেরে উঠবেনই।'

অভিভূতের মতো আমার দিকে চেয়ে রইলেন ইলা মিত্র। যেন অবাক হয়ে আমার কথা শুনছেন।

একটু থেমে আমি বললাম, 'এবার যাই ?'

কোনো কথা বললেন না তিনি। একভাবে তাকিয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে চলে এলাম।

আমি আর সুভাষদা এক ঘরে শুই। সেই রাতেই ঘুমোবার আগে দেখলাম সুভাষদা বসে বসে কী লিখছেন। পরদিনও ঘুম থেকে উঠে দেখি, তখনও বসে বসে কি লিখছেন। অনেক আগেই ওঁর চা-টা-র পর্ব সারা হয়ে গেছে।

আনোয়ার আর আবদুল এসে পড়লেন। সুভাষদা গেলেন ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে। সেই ফাঁকে পাতা উল্টে দেখলাম, নতুন কবিতা—

অন্ধকার পিছিয়ে যায়
দেয়াল ভাঙে বাধার
সাতটি ভাই পাহারা দেয়
পারুল, বোন আমার—

মনে হল আনন্দে চিৎকার করে উঠি। ইলা মিত্রকে দেখার আগেই, তাঁকে নিয়ে আমার অনেক কিছু লেখার ইচ্ছে ছিল। পড়েছিলাম গোলাম কুদ্দুসের কবিতা—স্তালিন-নন্দিনী, ফুচিকের বোন ইলা মিত্রের সেই আশ্চর্য বন্দনা। কিন্তু রোগশয্যায় ইলা মিত্রকে দেখে বারবার খালি মনে হয়েছে, তিনি যেন আরো কিছু, অন্য কিছু। অনেক ভেবেও সেই বিশেষ কথাটি কিছুতেই মনে আনতে পারি নি। আজ সুভাষদার কবিতায় যেন নিজেরই প্রাণের প্রতিচ্ছবি দেখলাম। মনে হল সত্যিই তিনি—পারুল বোন আমার।

তারপর হঠাৎ মনে হল, আর একবার যেতে হবে আমায়। এখনই। কালকে চলে আসবার সময় ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম, তেমন সুর ওখানে বেজে ওঠে নি। হয়তো আজ সেই অভাব মিটবে।

সাইকেল রিক্সায় চড়ে হাসপাতালের প্রাঙ্গণে পৌছলাম। ওখানে তখন বিপুল উত্তেজনা। সুদৃশ্য পোস্টারে আগেই দেয়াল ছেয়ে গেছে। আজ ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন।

ছাত্ররা অনেকে এসে পাশে দাঁড়ালেন। বললাম : আজ দুপুরে পালাচ্ছি। একবার দেখা করতে চাই।

ওটা জেনানা-ওয়ার্ড। সঙ্গে পাস্‌ না থাকলে সকালে ঢোকা সম্ভব নয়। একজন ছাত্র আমাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন।

যেতে যেতে বললাম, 'ফুল কিনতে পাওয়া যায় না?'

উনি লজ্জিতভাবে হেসে বললেন, 'না। ঢাকায় ঐ একটা মস্ত অভাব।'

আশেপাশে অজস্র ফুল ফুটে আছে। দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছও লালে লাল। কিন্তু কৃষ্ণচূড়া আনার সময় ছিল না। এখানেও মালিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। নিরাশ হয়েই ফিরতে হল আমাকে। আমি তখন মরিয়া। কোনো দিকে না তাকিয়েই হঠাৎ বাগান থেকে তাজা সূর্যমুখী ফুল একটা ছিঁড়ে নিলাম।

কিন্তু কি আশ্চর্য। হলে ঢুকে ইলা মিত্রের দিকে চোখ পড়তেই দেখি, তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। আমি তাঁকে দেখার আগেই পারুল বোন আমাকে দেখেছেন। সেই হাসিতে আছে অভ্যর্থনা, আছে আহ্বান।

কাছে এগিয়ে গেলাম। বললাম, 'আজ দুপুরে আমি চলে যাচ্ছি। যাবার আগে আপনাকে দেখার জন্য আর একবার না এসে কিছুতেই পারলাম না।'

তখনও পারুল বোন হাসছেন। যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ হেসেছেন তিনি। সে হাসিতে শব্দ নেই। চোখ আর মুখ দিয়ে সে হাসি লাবণ্যের মতো ঝরে পড়ে। জানি না আজকের সূর্যে, আজকের সকালে কী মায়া ছিল।

বললাম, 'আপনার জন্য ফুল এনেছি।'

সেই রোগা রোগা হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন। তারপর সূর্যমুখী ফুলটা রাখলেন মাথার পাশে বিছানার ওপর।

বললাম, 'আপনার শরীর খারাপ। কিন্তু কোনো কথাই কি বলতে পারবেন না?'

অবশেষে ইলা মিত্র কথা বললেন। অত্যন্ত মার্জিত গলা, শিক্ষিত উচ্চারণ। স্পষ্ট সুরে বললেন, 'কী করে বলব বলুন তো। কথা বললেই যে গলা দিয়ে রক্ত পড়ে। এই তো একটু আগে স্টমাক-ওয়াশ করে গেল। আমি যে নিশ্বাস নিতেই কষ্ট পাচ্ছি।' কথাগুলো আক্ষেপের। কিন্তু আশ্চর্য, বললেন হেসে-হেসে।

আমি বললাম, 'কুদ্দুস সাহেবের কবিতাটা পড়েছেন আপনি?'

লজ্জায় তার মুখটা রাঙা হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে জানালেন, পড়েছি।

আমি বললাম, 'ও কিন্তু একা কুন্দুসের কথা নয়, আমাদের সকলের কথা। সকলের—সমস্ত পূব আর পশ্চিমবাংলার। পারুল বোন গভীর স্বরে বললেন, 'জানি। আপনাদের জন্যেই বাঁচব আমি। আপনাদের জন্যেই আমাকে বাঁচতে হবে।'

আমি বললাম, 'শুধু আমার নয়, আমাদের অনেকেরই জানার কৌতূহল ছিল, আজ আপনি কী ভাবছেন, আজ আপনি কী বলতে চান। সে প্রশ্নের উত্তর পেলাম। ওখানে গিয়ে বলব আপনার কথা। বলব, আপনি বাঁচবেন। আমাদের জন্যেই বাঁচবেন। বেঁচে আবার বাঁচাবেন অন্যকে। সত্যি, বেঁচে আপনাকে উঠতেই হবে।'

আশ্চর্য মমতার সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে পারুল বোন বললেন, 'হাঁ, বলবেন। তাই বলবেন আপনি।'

আরো কিছুক্ষণ ছিলাম। অন্য কথাও হল। ছাত্রবন্ধুটি দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললাম, 'এইবার যেতে হবে। এখানে আর আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। তবে কলকাতায় নিশ্চয়ই।'

সে কথার উত্তরে হঠাৎ পারুল বোন বললেন, 'যাওয়ার আগে বলি, সকলকে আমার মে-দিবসের অভিনন্দন।'

চমকে উঠলাম। বোঝাতে পারব না আমার তখনকার অবস্থা। এসেছিলাম ইলা মিত্রকে সান্ত্বনা দিতে, প্রেরণা জোগাতে! কিন্তু, এ কোন শিক্ষা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি? আজ পয়লা মে, হাসপাতালে ঢুকে সে কথা আমি সাময়িকভাবে ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য! রোগ-যন্ত্রণা আর সীমাহীন মানসিক সংঘাতের মধ্যেও তো আমার পারুল বোন ঠিক সে কথা মনে রেখেছেন।

আবার নতুন করে তাকালাম তাঁর দিকে। দেখলাম বিছানার ওপর শুয়ে ইলা মিত্র, পাশে আমার দেওয়া সূর্যমুখী ফুল। দু' জনেরই চোখ আকাশের দিকে, সূর্যের দিকে।

বললাম, 'চলি দিদি?'

একমুখ হেসে পারুল বোন ঘাড় নাড়লেন।

আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম।

লেনিন শতাব্দী

১৯৭৮-এ দীপেন্দ্রনাথ 'লেনিন শতাব্দী' নামে একটি কাব্য-সংকলন সম্পাদনা করেন— উপলক্ষ : লেনিন শতবর্ষ। তাঁর ভূমিকার একটি অংশ উদ্ধৃত হল।

১৮৭০ সালের ২২এ এপ্রিল একটি মানুষ জন্মেছিলেন—ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ। নচিকেতার মতো 'নরক'-এ গিয়ে তিনি জীবনের রহস্য উপলব্ধি করলেন। ১৯০০ সালে লেনিন হয়ে জাললেন নাচিকেত অগ্নি 'ইসক্রা'। তারপর ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে একটি রাষ্ট্র জন্ম নিল—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র।

এই মানুষ এবং এই দেশ পৃথিবীকে যে-আশ্চর্য উপহার দিল—তারই নাম সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা। সেই সভ্যতা বরফে ফুল ফোটাল, মরুতে নদী বহাল, মহাকাশে ওড়াল মানব সভ্যতার বিজয়পতাকা।

তাই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ইলিচ লেনিনের প্রতি মানুষের ভালোবাসার অন্ত নেই। তাই এই লেনিন শতাব্দীতে মরুভূমি, মেরুদেশ ও সমুদ্র-ঘেরা দ্বীপ--পৃথিবী গ্রহের যেখানে সূর্যের আলো পৌছয়, সেখানেই লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে। গ্রীসের ফ্যাসিস্ট কারাগার, বলিভিয়ার জঙ্গল, ভিয়েতনামের পাহাড়, আফ্রিকার খনি, সমাজতান্ত্রিক দেশের সমবায় খামারে একই সঙ্গে লেনিন-উৎসব চলছে। এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে মহাভারতের এই দেশের বাঙালি কবিরাও ইতিহাসের সেই ধারার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করলেন।

লেনিন ছিলেন কবির কবি। আজন্ম ধ্রুপদী সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পের শুদ্ধ রুচিতে গঠিত লেনিন তাই বিপ্লব-পরবর্তী সমস্ত হঠকারিতার সামনে বুক পেতে

দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—প্রলেতারীয় সংস্কৃতি কোনো ভুঁইফোড় বস্তু নয়, একমাত্র বেজন্মাদেরই ঐতিহ্য বলে কিছু থাকে না। আবার 'ঐতিহ্য'-অনুসরণের নামে দেশ-কাল-শ্রেণী-নিরপেক্ষ যে-'সৃষ্টি', যা সময় ও মানুষের পক্ষে নয়—তাকেও লেনিন কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছেন। প্রলেতারীয় সংস্কৃতি গ্রহণ ও বর্জনের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গ'ড়ে উঠবে, শিল্পের নিয়মে তার শরীর নির্মিত হবে, শ্রেণীচেতনা কমিটমেণ্ট আর অন্বয় হবে আত্মা—লেনিনের এই বোধ সভ্য মানুষের ইতিহাসে এ-যাবৎ অবরুদ্ধ সৃষ্টির এক মহান সম্ভাবনাকে এই প্রথম পৃথিবীতে ভগীরথের মতো আবাহন করল। আর, নদী বইল। নদী আজও বয়। সোভিয়েত রাষ্ট্র নতুন সংস্কৃতি ও তার স্রষ্টাদের চোখের মণির মতো সযত্নে লালন করল। তাই গৃহযুদ্ধের সেই ছন্নছাড়া দিনেও একজন নর্তকীর মোজার অভাব লেনিনকে বিচলিত করত, প্রচণ্ড আপত্তি ওঠা সত্ত্বেও 'বলশয়' থিয়েটার-এর জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যয় অব্যাহত রাখার প্রশ্নে তিনি লুনাচারস্কির পাশে দাঁড়াতেন।

আর, কবিদের মর্যাদা সম্পর্কে লেনিন সব সময় সচেতন ছিলেন।

ভালো গদ্যের থেকে মাঝারি কবিতা লেখা সোজা—গর্কীর এ-মন্তব্য তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছিল।

তাই তিনি সব দেশের কবিদেরই আত্মার আত্মীয়, সব ভাষার কবিতারই অন্যতম বিষয়। তাই পৃথিবী জুড়ে কবিরা কবিতা লিখে লেনিনকে বন্দনা করেন, আবার তার মধ্য দিয়ে কবিতাকেও বন্দনা জানান। তাই শুধু "বিপ্লব স্পন্দিত বুকে"ই নয়, সৎ সৃষ্টির প্রতিটি সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবিরা নিজেদের মধ্যে লেনিনের সেই অমোঘ উপস্থিতি অনুভব করেন।

তারপর সৃষ্টি। আর, সৃষ্টি মানেই তো অন্বয়। এবং কে না জানেন—লেনিন ও অন্বয় সমার্থক শব্দ হয়ে গেছে।

সামনের শতাব্দীতে মানুষ গ্রহান্তরে লেনিন-উৎসব করবেন। এমন দিনও আসবে যখন অনন্ত সৌরলোকের দিকে দিকে সেই উৎসব ছড়িয়ে পড়বে। অপরাজেয় মানুষ তার সভ্যতার রাঙা নিশান হাতে মহাশূন্যে নতুন থেকে নতুনতর ইতিহাস সৃষ্টি করতে থাকবে।

কিন্তু তার আগে এই গ্রহকে লেনিনের নামের যোগ্য করতে হবে। এই গ্রহকে লেনিন হতে হবে।

কৈশোরে তিনি জারের পুলিশকে বলেছিলেন—এ-দেয়াল ভাঙবে, যৌবনে

সহকর্মীকে বলেছিলেন—সাইবেরিয়া বদলাবে, প্রৌঢ় বয়েসে ওয়েলসকে বলেছিলেন—রুশদেশের অন্ধকার গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের বাতি জ্বলবে, মৃত্যুর আগে দেশবাসীদের বলেছিলেন—শিশু সোভিয়েতকে রক্ষা করো ··দুনিয়া পাল্টে যাবে।

লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে, হচ্ছে। পৃথিবীর মানচিত্রের গায়ে কৃষ্ণচূড়ার মতো লেনিনের স্বপ্ন নিয়তই ফুটে উঠছে। এই গ্রহ ক্রমেই লেনিন হচ্ছে।

এই হয়ে ওঠা কোনো উদারনৈতিক বা হঠকারী সহজসাধনের পথে সম্ভব ছিল না। দেশে দেশে তার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে আরও দিতে হবে। ভারতবর্ষের সামনে অপেক্ষা করছে কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রান্তর। কে না জানেন সত্য সহজে মেলে না! কে না বোঝেন কী দুস্তর পথ বেয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভকে লেনিন হতে হয়েছিল!

এই শতাব্দী তাই কঠোর আর অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে। ১৯৭০ সালের মানুষ বুঝেছে মুক্তির অব্যাহত সংগ্রাম আর লেনিন হয়ে ওঠার সাধনাই শ্রেষ্ঠ লেনিন-উৎসব।

সেই উৎসবের আর্তি ও উল্লাসই 'লেনিন শতাব্দী'। এই সঙ্কলন তাই সন্ধিলগ্নের বাঙলাদেশ ও ভারতবর্ষের অমোঘ জন্মযন্ত্রণার কান্না আর শঙ্খধ্বনির, এক অনন্য অর্কেস্ট্রা।'

কবিরা এইভাবেই শিল্প ও সময়ের ঋণ পরিশোধ করেন, ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হন।

রচনাপঞ্জি

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপেন্দ্রনাথের অভ্যেস, সেই কৈশোর থেকেই, লেখা কোথায় প্রকাশ হল, তা নোটবইয়ে টুকে রাখা। লেখার-কপি তিনি রাখতে পারতেন না। শেষে তাঁর এই লেখার-বিবরণ-টোকা নোট-বইটি হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর প্রায় সারা জীবনেরই রচনাপঞ্জি, কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য সহ। বাংলা সাহিত্যে এই বোধহয় প্রথম, একজন লেখক তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ রচনাপঞ্জি তৈরি করে গেলেন।

দীপেন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জিটি, যেমন তাঁর তৈরি, আমরা অবিকল প্রকাশ করছি। পদ্ধতিগত সঙ্গতির খাতিরে দু-একটি জায়গায় তথ্যগুলোর পরম্পরা আর তাঁর ব্যবহৃত যতিচিহ্ন—ব্র্যাকেট, কোলন, ড্যাস ইত্যাদি—বদলেছি, দুটি জায়গায় বানান। ইংরেজি হরফে ইংরেজি তারিখ, বা কোথাও বাংলা হরফে, মূলেই আছে।

আমার জানা কিছু তথ্য, তাঁর জীবনের প্রাসঙ্গিক কোনো খবর, ক্বচিৎ ক্ষীণ মন্তব্য—জুড়েছি, তৃতীয় ব্র্যাকেটে। শেষের নোটগুলোও আমার। এ-ব্যতীত আর সব কিছুই দীপেন্দ্রনাথের।

মার্চ, ১৯৭৯

দেবেশ রায়

১৩৫৫ [১৯৪৮-১৯৪৯]

[দীপেন্দ্রনাথের জন্ম : ১০ নভেম্বর, ১৯৩৩]

আমার দেশের মানুষ। কিশোর (দৈনিক) ৫ই পৌষ, সোমবার

[পনের বছর বয়সে প্রকাশিত এই রচনাটি প্রথম মুদ্রিত প্রকাশিত লেখা]

১৩৫৭ [১৯৫০-১৯৫১]

কিশোর সংগঠন। সবুজের অভিযান, নববর্ষ (বৈশাখ)

শ্রীঅজিতকুমার ঘোষালের ছদ্মনামে লিখিত

সবুজের অভিযান। সংকলন, (সম্পাদনা), নববর্ষ (বৈশাখ)[১]

আলো। শিশুসাথী, অগ্রহায়ণ

স্বাধীন অনুবাদ

১৩৫৮ [১৯৫১-১৯৫২]

[১৯৫২ সালে দীপেন্দ্রনাথ প্রথম বিভাগে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বর্ষ সাহিত্যে ভর্তি হন]

দূরের মায়া। শিশুসাথী, বৈশাখ

দূরের মায়া। শিশুসাথী, জ্যৈষ্ঠ

দূরের মায়া। শিশুসাথী, আষাঢ়

প্রথম প্রেম। পুনশ্চ, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়

দুঃখের পূর্ণিমা। শিশুসাথী, আশ্বিন

রামধনু। মৌচাক, চৈত্র

আগামী। [উপন্যাস]। প্রথম খণ্ড—মাঝি, গ্রন্থ

প্রথম প্রকাশ পনেরই কার্তিক (১৯৫১)

দ্বিতীয় প্রকাশ পনেরই অগ্রহায়ণ

[১৮ বছর বয়সে রচিত ও প্রকাশিত এটি দীপেন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস ও প্রথম প্রকাশিত বই। 'ঘরোয়া', সাপ্তাহিক, শারদীয়, ১৯৭৮-এ পুনর্মুদ্রিত। অন্নদাশঙ্কর রায় উপন্যাসটির ভূমিকা লিখে দেন।]

১৩৫৯ [১৯৫২-১৯৫৩]

জিজ্ঞাসা। অভিক্রমা, বৈশাখ

ঝলক। [?]

উত্তরকাল, পুনশ্চ, জীবনকথা, শিশির, অভিক্রমা

গ্রহণ। নতুন সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ

ঘরোয়ানা। রবিবাসরীয় সত্যযুগ, ১৫ই আষাঢ়, 29th June, 52

ঝলক। রবিবাসরীয় সত্যযুগ, ১১ই শ্রাবণ, 27th July, 52

সে

কর্মী রবীন্দ্রনাথ। রবিবাসরীয় সত্যযুগ, ১লা ভাদ্র, 17th August, 52

কর্মী রবীন্দ্রনাথ। রবিবাসরীয় সত্যযুগ, ১৫ই ভাদ্র, 31st August, 52

কিন্তু। জাতক, পূজা সংকলন, আশ্বিন

য়্যাকসিডেন্ট। অচলপত্র, পূজা-সংখ্যা-নয়, ভাদ্র-আশ্বিন

বৃত্ত। ঝরনা, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন

ডাক। অভিক্রমা, পূজা সংখ্যা, আশ্বিন

আমড়া। রূপবাণী, কার্তিক

শঙ্খ। সুজনী প্রকাশের পুস্তিকা, কার্তিক

মুক্তি। ছাত্র-ছাত্রী, অগ্রহায়ণ-পৌষ

না। নতুন সাহিত্য, ফাল্গুন

শঙ্খ। (গল্প) পুস্তিকা—প্রকাশ, কার্তিক

[আগেও একবার উল্লেখিত]

১৩৬০ [১৯৫৩-১৯৫৪]

পথিক। শিক্ষসাথী, বৈশাখ

সানাই। নতুন সাহিত্য, আশ্বিন

কবিরাজ। উত্তর স্বাক্ষর, আশ্বিন

কান্না। ছাত্র-ছাত্রী, আশ্বিন

আজ-কাল-পরশু। অগ্নি আখর, আশ্বিন

শুঁয়োপোকা। প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা, অগ্রহায়ণ

উজান। সংকলন, (সম্পাদনা), আশ্বিন

গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যুগ্ম-সম্পাদক

১৩৬১ [১৯৫৪-১৯৫৫]

[১৯৫৪-তে দীপেন্দ্রনাথ আই-এ পাশ করে স্কটিশচার্চ কলেজে তৃতীয় বর্ষে বাংলায় অনার্সসহ ভর্তি হন। তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে নিতে আপত্তি করা হয়]

১৩৬১-৬৭ পর্যন্ত নিয়মিত লেখা হয় নি। কোন কোন লেখা বাদ থাকতে পারে। ২৪. ১১, ৭০ [ইংরেজি তারিখ]

কাছের যারা। গল্প-সংকলন, বৈশাখ, (১৯৫৪)

গ্রহণ, বৃত্ত, সানাই, মডেল, কিন্ত, মহাকাব্যের ভূমিকা

আরেক ঢাকায়।[২] নতুন সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ

[১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জিতলে পশ্চিমবঙ্গের লেখক-প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ঢাকা যান। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই দলে ছিলেন]

সূর্যমুখী। পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ

[১৯৫৪-তে ঢাকা সফরে হাসপাতালে ইলা মিত্র-কে দেখার[৩] রিপোর্টাজ। এটিই 'পরিচয়'-এ দীপেন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত লেখা]

সেতু। শঙ্খ, জ্যৈষ্ঠ

বিদ্যুৎ। রবিবাসরীয় স্বাধীনতা, ১৯শে ভাদ্র, 5th Sept, 54

মন। চলমান, শারদীয় সংকলন, আশ্বিন

গান। পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা

অমৃত। নতুন সাহিত্য, শারদীয় সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন

বনাম। সাঁকো, শারদীয় সংখ্যা, আশ্বিন

এজেন্ট। কল্পনা-সাহিত্য, শারদীয় সংকলন, আশ্বিন

বিজ্ঞানের রূপকথা। চতুষ্কোণ, অগ্রহায়ণ-মাঘ

'জ্ঞানবাব কথা'-র [দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত] সমালোচনা

ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইড প্রসঙ্গ। উজান, চৈত্র

আলোচনা

কাছের যারা। গল্প-সংকলন

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ৬১

[আগে একবার উল্লেখিত]

উজান। (সম্পাদনা), ফাল্গুন, ৬১

১৩৬২ [১৯৫৫-১৯৫৬]

[স্কটিশ চার্চ কলেজে চতুর্থ বর্ষের ছাত্র]

বর্ষণ। চতুষ্কোণ (মাসিক), বৈশাখ

পুস্তক-পরিচয়। পরিচয়, আষাঢ়

নোবেল পুরস্কার ও বিশ্বসাহিত্যের সমালোচনা

শ্লোক। আগামী, শ্রাবণ

মালি। পাতাবাহার, আশ্বিন

স্টাডি। পরিচয়, আশ্বিন কার্তিক

একটি লোক-হাসানো গল্প। নতুন সাহিত্য, আশ্বিন-কার্তিক

অমৃতকুম্ভ। কল্পনাসাহিত্য, আশ্বিন

পালুসকর। নতুন সাহিত্য, অগ্রহায়ণ

বিয়োগপঞ্জি

দক্ষিণের পাঁচালি। আগামী, চৈত্র

১৩৬৩ [১৯৫৬ ১৯৫৭]

[১৯৫৬-তে দীপেন্দ্রনাথ বি-এ পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হন]

দক্ষিণের পাঁচালি। আগামী, বৈশাখ

রবীন্দ্র প্রসঙ্গে। নতুন সাহিত্য, বৈশাখ

আলোচনা

মুহূর্ত। পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ

'জীবনী বিচিত্রা। নতুন সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ

সমালোচনা

দক্ষিণের পাঁচালি। আগামী, আষাঢ়

টনির স্বপ্ন'। পরিচয় আষাঢ়

সমালোচনা

শাঁখা-সিঁদুর। পরিচয়, ভাদ্র-আশ্বিন

ভাসান। নতুন সাহিত্য, আশ্বিন-কার্তিক

হিসাব। কল্পনা সাহিত্য, শ্রাবণ-আশ্বিন

অ-শারদীয় সাহিত্য। লোকায়ত শরৎ সংকলন

আলোচনা

সার্কাস। যাত্রী, শারদীয় সংখ্যা

তিন ভুবন। বিংশ শতাব্দী, অগ্রহায়ণ

'গোধূলির রং'। পরিচয়, অগ্রহায়ণ

পুস্তক-পরিচয়

১৩৬৩ [১৯৫৭-১৯৫৮]

'জুয়াড়ী', 'বাড়িওয়ালী'। পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ

সমালোচনা

নেয়ারের খাট, মেহগিনি পালঙ্ক, একটি ছুটি সন্ধ্যা। একতা, (বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা), আশ্বিন

[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মৃত্যু নিয়ে লেখা রিপোর্টাজ]

সম্পর্ক। স্বাধীনতা, শারদীয় সংখ্যা

তৃতীয় ভুবন। উপন্যাস, নতুন সাহিত্য, শারদীয় সংখ্যা

'বেলুগিনের বিবাহ', 'মানুষের জন্ম', 'পিতা ও পুত্র', 'তৃষ্ণা'। পরিচয়, চৈত্র

সমালোচনা

১৩৬৫ [১৯৫৮-৫৯]

[১৯৫৮ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাংলায় এম-এ পাশ করেন। ফল বেরোয় ১৯৫৯ এর ফেব্রুয়ারিতে]

ঘাম। পরিচয়, নববর্ষ সংখ্যা

[এই গল্পটি নিয়ে 'পরিচয়'-এ ও প্রগতিশীল সাহিত্য-রসিক মহলে বিতর্ক হয়।]

ছাত্র অভিযান (নবপর্যায়)। (সম্পাদনা), শ্রাবণ

শিক্ষাজগৎ, প্রসঙ্গকথাঃ শিক্ষার অধিকার, মৃত্যুহীন, ছাত্রসংবাদ—১ম সংখ্যার এই ৪-টি লেখা আমার।

[বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের আসানসোল সম্মেলনে, ১৯৫৮, দীপেন্দ্রনাথ ছাত্র ফেডারেশনের মুখপত্র 'ছাত্র অভিযান'-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন]

তৃতীয় ভুবন। উপন্যাস, গ্রন্থ, ভাদ্র, আগস্ট, ১৯৫৮

ছাত্র অভিযান। ২য় সংখ্যা (সম্পাদনা), ভাদ্র-আশ্বিন

বিজ্ঞানাচার্য অধ্যাপক জোলিও কুরীর মৃত্যুতে, অভিনন্দন, মাধবপুরের ইতিকথা, শিক্ষাজগৎ ছাত্রসংবাদ—২য় সংখ্যার এই ৫টি লেখা আমার।

আমার হাতে শেষ সংখ্যা। এই পর্যায়ে আরও একটি সংখ্যা বোধহয় বেরিয়েছিল। সম্পাদক হিসাবে আমার নাম থাকলেও আমি কিছু দেখি নি।

নরকের প্রহরী। পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা

বাঁশিওলা। নয়া দমদম, শারদীয় সংখ্যা

'মূল্যা রুজ'। পরিচয়, পৌষ

পুস্তক পরিচয়

'চৈত্রদিন'। পরিচয়, মাঘ

পুস্তক-পরিচয়

তৃতীয় ভুবন। উপন্যাস, ভাদ্র ১৩৬৫

[আগে উল্লেখিত]

ছাত্র অভিযান। (সম্পাদিত), শ্রাবণ, ভাদ্র-আশ্বিন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের মুখপত্র

[আগে উল্লেখিত]

একতা। (সম্পাদিত), ডিসেম্বর, ১৯৫৮

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ প্রকাশিত বার্ষিকী

১৩৬৬ [১৯৫৯-১৯৬০]

উৎসবের আহ্বান। ত্রিমাত্রিক, [?] সংকলন, বৈশাখ

চিঠি। ছোটগল্প, শারদীয় সংখ্যা

চর্যাপদের হরিণী। পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা

কয়েকটি মৃত্যু। চতুষ্কোণ, শারদীয় সংকলন

মৃত শহর। বসন্ত। নতুন সাহিত্য, শারদীয় সংখ্যা

একটি গাভীর মৃত্যু। নয়া দমদম, শারদীয় সংখ্যা

'চা মাটি মানুষ'। পরিচয়, কার্তিক

পুস্তক-পরিচয়

'বর্ষা বিজয়'। পরিচয়, কার্তিক

কজ্জল সেন নামে

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে। রবিবাসরীয় স্বাধীনতা, ৬ই ডিসেম্বর, ৫৯

'তিন তাসের খেলা'। পরিচয়, পৌষ

পুস্তক-পরিচয়

'সাগরে মিলায় ডন', 'ধীর প্রবাহিণী ডন'। পরিচয়, পৌষ

কজ্জল সেন নামে

পি. এ. বি.-র আলোকচিত্র প্রদর্শনী। যুগান্তর, ৬ই ফাল্গুন, ১৯.২ ৬০

সংস্কৃতি সংবাদ। পরিচয়, চৈত্র

১৩৬৭ [১৯৬০-১৯৬১]

পাস্তেরনাক। পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ

সংস্কৃতি সংবাদ: বিবোগপঞ্জী

'প্রবন্ধ পত্রিকা'। পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ

পত্রিকা-প্রসঙ্গ। কজ্জল সেন নামে

জটায়ু। ছোটগল্প : নতুন রীতি, আষাঢ়

'আমেরিকায় শিশিরকুমার'। পরিচয়, আষাঢ়

পুস্তক-পরিচয়

চর্যাপদের হরিণী। গল্প-সংকলন, শ্রাবণ, জুলাই ১৯৬০

ভাসান, কয়েকটি পৃথিবী (তিন ভুবন), ঘাম, নরকের প্রহরী, চর্যাপদের হরিণী

ফুল ফোটার গল্প। পরিচয়, ভাদ্র-আশ্বিন

প্রহরা। নতুন সাহিত্য, কার্তিক-পৌষ

অশ্বমেধের ঘোড়া। ছোটগল্প, শারদীয় সংখ্যা

পরীক্ষা। স্বাধীনতা, শারদীয় সংখ্যা

দিনে দিনে। ঋতায়ন, শারদীয় সংখ্যা

আকাশ। জাগৃহি, আশ্বিন

চিঠি। স্বর্ণসম্পুট, শারদীয় সংগ্রহ

পুনর্মুদ্রণ। 'ছোটগল্প', শারদীয় ১৩৬৬ [থেকে]

সার্কাস। কালীঘাট সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পত্রিকা, শারদ সংকলন

পুনর্মুদ্রণ। 'যাত্রী', শারদীয় ১৩৬৩ [থেকে]

জটায়ু। উত্তরণ, ভাদ্র

পূর্ববঙ্গের পত্রিকা। বিশেষ···সংখ্যা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের। পুনর্মুদ্রণ। 'ছোটগল্প : নতুন রীতি', আষাঢ় [থেকে]

'বঙ্গবাসী কলেজ পত্রিকা'। পরিচয়, কার্তিক

পত্রিকা-প্রসঙ্গ। কজ্জল সেন নামে

শিল্পীর স্বাধীনতা ও মানুষের মুক্তি (সার্ত্র)। পরিচয়, কার্তিক

সংস্কৃতি সংবাদ

অশ্বমেধের ঘোড়া। এই দশকের গল্প, সম্পাদক—বিমল কর, অগ্রহায়ণ

পুনর্মুদ্রণ। 'ছোটগল্প' শারদীয় ১৩৬৭ [থেকে]

সংস্কৃতি সংবাদ। পরিচয়, অগ্রহায়ণ

আমাদের যৌবন ও স্বাধীনতা। স্বাধীনতা, রবিবার, ১০ পৌষ, ২৫.১২.৬০

ষোড়শ প্রতিষ্ঠা দিবস সংখ্যা

ঈশ্বরের সহিত সংলাপ ১ ও ২। আশাবরী, অগ্রহায়ণ

'উত্তরণ'। পরিচয়, পৌষ

পত্রিকা প্রসঙ্গ। কজ্জল সেন নামে

সভ্যতার প্রহরী ও কারাগার (সেকেবাস), অ্যাংগ্রি ওল্ড ম্যান এবং অন্যান্য।
পরিচয়, পৌষ

সংস্কৃতি-সংবাদ

ঈশ্বরের সহিত সংলাপ ৩। আশাবরী, পৌষ

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ১। বিংশ শতাব্দী, পৌষ

'মুরলীধর বসু', 'ইউজিন ডেনিস'।

সংস্কৃতি-সংবাদ, বিয়োগপঞ্জী

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ২। বিংশ শতাব্দী, মাঘ

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ৩। বিংশ শতাব্দী, ফাল্গুন

সংস্কৃতি সংবাদ। পরিচয়, চৈত্র

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ৪। বিংশ শতাব্দী, চৈত্র

চর্যাপদের হরিণী। গল্প সংকলন, প্রকাশক—মিত্রালয়, জুলাই ১৯৬০

[আগে উল্লেখিত]

১৩৬৮ [১৯৬১-১৯৬২]

উঃ ভুঃ ফুঃ। অমৃত, প্রথম সংখ্যা, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৬৮, শুক্রবার, 12 5.61

কাজল সেন নামে

হিসাব। সেরা সেরা লেখকের শ্রেষ্ঠ গল্প, বৈশাখ

সাহিত্য সেবক সমিতি-র পক্ষে 'কত কথা' কর্তৃক প্রকাশিত।

পুনর্মুদ্রণ। কল্পনা সাহিত্য, শ্রাবণ আশ্বিন, ১৩৬৩ [থেকে]।

মহাবিদ্যার গুপ্তকথা। অমৃত, ২২ জ্যৈষ্ঠ 26 5 61

'অমৃত'-পত্রিকার লেখা দুটি বিদেশী রচনা অবলম্বনে।

আমার 'পরিচয়'-এর ছদ্মনাম ছিল কজ্জল সেন, মণীন্দ্র রায় সেটাকে কাজল সেন করে দেন। পরে তাকেই আবার করেন দীপান্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে অবশ্য আমি এখানে ছদ্মনাম ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলাম না।

['অমৃত'-সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশ-প্রস্তুতিতে দীপেন্দ্রনাথের সঙ্গে মণীন্দ্র রায়-এর প্রায় দৈনন্দিন সংযোগ ছিল। তাঁরা কাছাকাছি থাকতেন—এও একটা কারণ। দীপেন্দ্রনাথ বহু পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। পরে, তাঁর 'স্বয়ংবর সভা' প্রকাশ নিয়ে তাঁর সঙ্গে এই পত্রিকার মতভেদ হয়—এই পত্রিকায় তিনি আর লেখেন নি।]

স্বয়ংবর সভা। মানসী, জ্যৈষ্ঠ

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ৫। বিংশ শতাব্দী, জ্যৈষ্ঠ

হায় ছায়াবৃতা। (প্রকাশক), জ্যৈষ্ঠ

প্যাট্রিস লুমুম্বা-র স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কবিতা সংকলন

আইজেনষ্টাইন চলচ্চিত্র উৎসব প্রসঙ্গে। পরিচয়, আষাঢ়

সংস্কৃতি সংবাদ

'হায় ছায়াবৃতা'। ২য় মুদ্রণ, আষাঢ়

গগনঠাকুরের সিঁড়ি ৬। বিংশ শতাব্দী, শ্রাবণ

প্রথম শোকের স্মৃতি। কথাকলি, আষাঢ়-শ্রাবণ

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ৭। বিংশ শতাব্দী, ভাদ্র

কলেজ ষ্ট্রীটের হৃদপিণ্ড। অমৃত, ২২ ভাদ্র, 8. 9. 61

দীপান্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামে

সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পরিচয়, ভাদ্র

কজ্জল সেন নামে

সংস্কৃতি সংবাদ। পরিচয়, ভাদ্র

পরিপ্রেক্ষিত। স্বাধীনতা, শারদীয় সংখ্যা, আশ্বিন

অশোকবন। মানসী, দেয়ালী সংখ্যা, কার্তিক

রবীন্দ্র শতবর্ষে শান্তি উৎসব। পরিচয়, কার্তিক

সংস্কৃতি সংবাদ

ধূর্জটিপ্রসাদ ও অন্যান্য। পরিচয়, অগ্রহায়ণ

সংস্কৃতি-সংবাদ

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ৮। বিংশ শতাব্দী, অগ্রহায়ণ

গোয়া ও অন্যান্য। পরিচয়, পৌষ

সংস্কৃতি-সংবাদ

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ৯। বিংশ শতাব্দী, পৌষ

অমরেন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য। পরিচয়, মাঘ

সংস্কৃতি সংবাদ

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ১০। বিংশ শতাব্দী, মাঘ

স্পেশাল ট্রেণ। নতুন পদক্ষেপ, গন্ধর্ব, নভেম্বর-জানুয়ারী ৬১-৬২

একটি গ্রামের গল্প। ফসল, গল্প সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ

এক অঙ্গে এত রূপ ও অন্যান্য। পরিচয়, চৈত্র

সংস্কৃতি সংবাদ

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি ১১। বিংশ শতাব্দী, চৈত্র

১৩৬৯ [১৯৬২-১৯৬৩]

সম্পাদকীয়। (সম্পাদিত), সাহাপুর-নিউ আলিপুর যুব উৎসব স্মারক সংকল
বৈশাখ, মে ৬২

সাহাপুর-নিউ আলিপুর যুব উৎসব : বৈশাখ, মে ৬২

রমেশচন্দ্র সেন। পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ, June, 62

বিয়োগপঞ্জী, সংস্কৃতি-সংবাদ

পুস্তক পরিচয়। পরিচয় আষাঢ়, July, 62

কজ্জল সেন নামে

সংস্কৃতি সংবাদ। পরিচয়, আষাঢ়

তৃতীয় পরিকল্পনা। শারদীয় স্বাধীনতা, আশ্বিন, Sept. 1962

মৃত্যুর ইতিহাস। শারদীয় ছোটগল্প, আশ্বিন

উৎসর্গ। পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা, আশ্বিন

কাটা সৈনিক। নতুন সাহিত্য, শারদীয় সংখ্যা, আশ্বিন

দায়ী। চতুষ্কোণ, শারদীয় সংখ্যা, আশ্বিন

১৩৭০ [১৯৬৩-১৯৬৪]

[এই বছর দীপেন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাঁর মনোহরপুকুর রোডের ভাড়া বাড়িতে এই বাড়িতে তিনি ১৯৬৩-তেই উঠে এসেছিলেন, তাঁদের নিউ আলিপুরের পারিবারি আবাস ছেড়ে, তাঁর প্রথম সন্তানের জন্মকালে। এই সময় থেকে দীপেন্দ্রনাথের গ উপন্যাস লেখার সংখ্যা কমে আসতে থাকে।]

অশ্বমেধের ঘোড়া। গল্প সংকলন, আষাঢ়, জুন—১৯৬৩, প্রকাশক—সৃজনী

মৃতশহর। বসন্ত, জটায়ু, অশ্বমেধের ঘোড়া, স্বয়ংবর সভা, প্রহরা

সাপ্তাহিক বসুমতী। ৬৮ বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ৬ কার্তিক, ১৩৭০

ইংরেজি ২৪. ১০. ৬৩ থেকে ২৬ সংখ্যা, ৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৭০,

ইংরেজি ২১ ১১. ৬৩ পর্যন্ত কার্যকালে বিভিন্ন বিভাগে রচনা।

[এই প্রায় একমাস দীপেন্দ্রনাথ সাপ্তাহিক বসুমতীতে চাকরি করেছেন। তখন বি বড়িশার সাজের আটচালায় থাকেন।]

১৩৭১ [১৯৬৪-১৯৬৫]

ঘাম। তরুণ লেখকদের স্বনির্বাচিত প্রেমের গল্প, বৈশাখ, May 64

বিনা অনুমতিতে অজ্ঞাতে সংকলিত

[প্রতিবাদে দীপেন্দ্রনাথ অনশন করেছিলেন। শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়-এর অনুরোধে প্রত্যাহার করেন।]

১৩৭২ [১৯৬৫-১৯৬৬]

কুট্টি খড়ম। পরিচয়, আন্তর্জাতিক গল্প সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র, March-April 6

ভিয়েতনামী গল্প। হ্যানয় প্রকাশিত (১৯৬৫) 'The Fire Blazes' গ্রন্থ থেকে। লেখক Thuy Thu, গল্প—The Little Wooden Sandal।

১৩৭৪ [১৯৬৭-১৯৬৮]

[প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন দীপেন্দ্রনাথকে সাংবাদিক রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। তখন তিনি 'কালান্তর'-পত্রিকার কর্মী।]

নবযাত্রা। দৈনিক কালান্তর, নববর্ষ ক্রোড়পত্র, ১লা বৈশাখ, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৬৭

'প্রচ্ছন্ন স্বদেশ' : একটি সাক্ষাৎকার। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২২ বৈশাখ, ১৩৭৪, ৬ই মে, ১৯৬৭, শনিবার

কুট্টি খড়ম। দূর-সুদূর, গোপাল হালদার সম্পাদিত সংকলন, বৈশাখ

ভিয়েতনামী গল্পের অনুবাদ। পুনর্মুদ্রণ [পরিচয়, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৭২ থেকে]

একটি সঙ্গীতের জন্য। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২৭শে মে, শনিবার, ১৯৬৭

একটি সঙ্গীতের জন্য (শেষাংশ)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ৩রা জুন, শনিবার, ১৯৬৭

দুর্ভিক্ষ ও খরাক্লিষ্ট বাঁকুড়া-পুরুলিয়া দেখে এলাম (১ম পর্ব)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১০ই জুন, শনিবার, ১৯৬৭

প্রথমে, 'সর্বনাশ এড়ানো যাবে না', পরে, 'শ্মশান বন্ধু' নাম দিয়েছিলাম। সে নাম ছাপা হয় নি।

[আমাকে বলেছিলেন 'শ্মশানবন্ধুর চিঠি' নাম দিয়েছিলেন]

দুর্ভিক্ষ ও খরাক্লিষ্ট বাঁকুড়া-পুরুলিয়া দেখে এলাম (২য় পর্ব)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৭ই জুন, শনিবার, ১৯৬৭

বাঁকুড়া-পুরুলিয়া দেখে এলাম (৩য় পর্ব)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ৮ই জুলাই ১৯৬৭

নাম ছোট হয়েছে

ক্ষেত ফলিয়ে খেতে পায় না—ক্ষেত মজুর। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২২শে জুলাই, ১৯৬৭

আসলে এটি 'দুর্ভিক্ষ ও খরাক্লিষ্ট বাঁকুড়া-পুরুলিয়া দেখে এলাম' রচনাটির চতুর্থ কিস্তি।

বসিরহাটের রামলক্ষ্মণ ভাইয়েরা জোট বাঁধছে। দৈনিক কালান্তর, ২৪শে জুলাই, ১৯৬৭

১৫. ৭ ৬৭ তারিখে পার্টি অফিসে কৃষক সভার আঞ্চলিক নেতা ও কর্মীদের interview করি, ১৭ ৭ ৬৭ তারিখে লিখি।

ভূমিহীন মানবগোষ্ঠীর রক্ত ও অশ্রুকে নক্ষত্রের অক্ষরে গেঁথে তুলুন। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২৯শে জুলাই, ১৯৬৭

আসলে এটিও 'দুর্ভিক্ষ ও খরাক্লিষ্ট বাঁকুড়া পুরুলিয়া দেখে এলাম' রচনাটির পঞ্চম কিস্তি। এটির শিরোনামও আমার দেওয়া নয়।

দরিদ্র দেশের দীনজন। সাপ্তাহিক কালান্তর, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭

অবশেষে 'দুর্ভিক্ষ ও খরাক্লিষ্ট বাঁকুড়া পুরুলিয়া দেখে এলাম' রচনার শেষ (ষষ্ঠ) কিস্তি প্রকাশিত হল। এই নামটিও আমার দেওয়া নয়।

নূতন পরিস্থিতি। দৈনিক কালান্তর, ১৫ই বৈশাখ, ১৩৭৪, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৬৭

এস এ ডাঙ্গের লেখার অনুবাদ

জর্জি ডিমিট্রভ। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৭ই জুন ১৯৬৭

ইলজিয়া কিওলিওভস্কি লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ, ১৮ই জুন ডিমিট্রভের জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের আলোকচিত্র প্রদর্শনী। দৈনিক কালান্তর, সোমবার ২৯শে জানুয়ারি, ১৯৬৮

জনমত বিভাগে প্রকাশিত চিঠি

মানুষের জন্মের কাহিনীকার ম্যাকসিম গর্কীর জন্মশতবার্ষিকী। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৬. ৩. ৬৮

দৈনিক Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের কর্ষিত অনুবাদ

আমিও তো রক্ত দিতে চাই। শারদীয় আন্তর্জাতিক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৬৭ (৩০.৯.৬৭)

হওয়া না-হওয়া। পরিচয়, আশ্বিন ১৩৭৪, অক্টোবর ১৯৬৭

মিলাবে মানব জাত। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৬৭।

লেখার তারিখ ১৯. ১১. ৬৭

মালার ইতিবৃত্ত। সাপ্তাহিক কালান্তব, ২বা ডিসেম্বর, ১৯৬৭

পদচিহ্ন। সাপ্তাহিক কালান্তব, ২৩শে ডিসেম্বর. ১৯৬৭

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এই দুই অধিকারে অশুভ শক্তিব নখের দাগ। দৈনিক কালান্তর, ১৪ই জানুয়ারি, ১৯৬৮

৯ই জানুযারি সাহিত্যিকদেব সভায গৃহীত প্রস্তাব। আমার লেখা, আমিই উত্থাপন কবি। সম্পাদকীয note ও শিরোনামটি বার্তা-সম্পাদকেব দেওয়া।

নচিকেতাব দেশ। দৈনিক কালান্তর, ৩১. ১ ৬৮, ১৭ই মাঘ ১৩৭৪

২৩শে জানুয়াবি লিখি, শেষটুকু ২৫শে।

'কার্যানন্দ নগর'-এ মার্সাই-এর শ্রমিক নেতা। দৈনিক কালান্তব, ১. ৩. ৬৮, ১৭. ১১. ১৩৭৪

উঠো, জাগো ও ভুখে বন্দী। সাপ্তাহিক কালান্তব, শনিবাব, ২. ৩. ৬৮

ওপবেব লেখা দুটি যথাক্রমে ফ্রান্সের বিউ ও কষ্টারিকাব ভার্গাস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ওপবেব দুটি লেখা যথাক্রমে ২২ ও ২৪ ফেব্রুযারি লিখিত।

'ঘোড়েওয়ালাবাবু'।[৪] সাপ্তাহিক কালান্তর, ৯. ৩. ৬৮

নক্ষত্র মালাকার সম্পর্কে ধারাবাহিক রচনাব প্রথম কিস্তি

[দীপেন্দ্রনাথ ১৯৬৮ সালে পাটনায় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিব কংগ্রেসে গিযেছিলেন। সেই সভাস্থলেব নাম হযেছিল 'কার্যানন্দনগব'। সেখানে বিদেশী প্রতিনিধিদেব সঙ্গে ছাড়াও বিহাবের নক্ষত্র মালাকাবের সঙ্গেও তাঁর অনেক গল্প হয়]

গৃহযুদ্ধের লেখক। আন্তর্জাতিক, মার্চ ১৯৬৮ (৯.৩.৬৮)

ওপবের দুটি লেখা যথাক্রমে ২৬ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারি লিখিত

'ঘোডেওয়ালাবাবু' (দ্বিতীয় পর্ব)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৬. ৩, ৬৮

'ঘোডেওয়ালাবাবু' (তৃতীয় পর্ব)। সাপ্তাহিক কালান্তব, ২৩. ৩. ৬৮

অন্ধকার দ্বিপ্রহর। দৈনিক কালান্তর (বিশেষ ক্রোড়পত্র), ২৮. ৩ ৬৮

গর্কির লেখার অনুবাদ, কোথাও সংক্ষেপিত অনুবাদ বা অবলম্বন

রাজার রাজা। সাপ্তাহিক কালান্তব, ৩০. ৩. ৬৮

গর্কির লেখার অনুবাদ, কোথাও সংক্ষেপিত অনুবাদ বা অবলম্বন

'ঘোড়েওয়ালাবাবু' (চতুর্থ পর্ব)। সাপ্তাহিক কালান্তব, ১৩.৪ ৬৮, চৈত্র-সংক্রান্তি '৭৪

১৩৭৫ [১৯৬৮-১৯৬৯]

'ঘোড়েওয়ালাবাবু' (পঞ্চম পর্ব)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬৮ ৭ই বৈশাখ, ১৩৭৫

লেনিনের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষভাবে প্রকাশিত সংখ্যা

'ঘোড়েওয়ালাবাবু' (শেষ পর্ব)। সাপ্তাহিক কালান্তর, মে-দিবস সংখ্যা, ২৭শে এপ্রিল

ইতিহাস কথা বলে। দৈনিক কালান্তর, মে-দিবস বিশেষ সংখ্যা, ১. ৫. ১৯৬৮ বুধবার, ১৮ই বৈশাখ ১৩৭৫

ট্রাকটেনবুর্গ-এর লেখা অনুসরণে। কোথাও-বা ভাষান্তর।

ইতিহাস কথা বলে। সাপ্তাহিক কালান্তর, মার্কসের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা, শনিবার, ৪ঠা মে, ১৯৬৮

দৈনিকের লেখাটিই আমার অজ্ঞাতসারে এবং ঈষৎ সংক্ষেপিত আকারে পুনর্মুদ্রিত

যুব উৎসব স্মারকপত্র, ১৯৬৮। ১লা জুন, ১৯৬৮

আমি নির্বাচিত সম্পাদক, সম্পাদনাও করি। কিন্তু সম্পাদক হিসেবে নাম প্রকাশ করি নি।

এই ভারতবর্ষ। সাপ্তাহিক কালান্তর, ৬ জুলাই ১৯৬৮

আমার দেওয়া নাম ছিল, 'সেই ভারতবর্ষ'

শ্রাবণ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৬৮ থেকে 'পরিচয়' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক হিসেবে আমার নামও প্রকাশিত হতে থাকে। অবশ্য তার আগের সংখ্যা (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় May-June-July—বাধ্য হয়েই একসঙ্গে বেরোয়) থেকেই আমরা সম্পাদনার কাজ শুরু করি।

দৈনিক 'কালান্তর'এর 'রবিবারের পাতা'র সম্পাদক হিসেবে 'কালান্তর'-এর শারদীয় সংখ্যার সম্পাদনাও আমি করি। অবশ্য আমার নাম দিই নি। দুই শারদীয় সংখ্যা করে পুজোয় নিজে কিছুই লিখতে পারলুম না।

একবার বিদায় দাও মা। দৈনিক কালান্তর, ৩১. ১০. ৬৮ বৃহস্পতিবার, ১৪ই কার্তিক ১৩৭৫

প্রথম সম্পাদকীয়

একটি বিতর্কমূলক লাঠিচালনা। দৈনিক কালান্তর, ৩১. ১০. ৬৮

সাইরেন। দৈনিক কালান্তর, বুধবার ৬ই নভেম্বর ১৯৬৮

রক্তকরবী। দৈনিক কালান্তর, বুধবার ১৩ই নভেম্বর

বিমলচন্দ্র ঘোষের সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুরস্কার লাভ। দৈনিক কালান্তর, ১৩ই নভেম্বর

বার্তা-সম্পাদকের নির্দেশে লেখা 'রাইট আপ'

'মানবতার উত্থান'। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ১০ই নভেম্বর, ১লা অগ্রহায়ণ

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু। দৈনিক কালান্তর, বৃহস্পতিবার,
২০শে নভেম্বর

দেয়ালের লিখন। দৈনিক কালান্তর, শুক্রবার ২৯শে নভেম্বর
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

দুই শতকের সেতু ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ। দৈনিক কালান্তর, সোমবার,
১৬ই ডিসেম্বর, ১লা পৌষ
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

তেলের ভেজাল: কি ও কেন। দৈনিক কালান্তর, শুক্রবার, ২০ ডিসেম্বর,
৫ই পৌষ
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

বিশ্বভারতী: অচলায়তন। দৈনিক কালান্তর, বুধবার, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮,
১০ই পৌষ ১৩৭৫
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

সীমানার বিরোধ কমছে। দৈনিক কালান্তর, সোমবার, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮,
১৫ই পৌষ, ১৩৭৫
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

কে দায়ী হবে? দৈনিক কালান্তর, মঙ্গলবার, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮, ১৬ই
পৌষ, ১৩৭৫
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

একটি বিবেচনার বিষয়। দৈনিক কালান্তর, শুক্রবার, ৩রা জানুয়ারি, ১৯৬৯,
১৯শে পৌষ, ১৩৭৫
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

পাক-ভারত সম্পর্ক: দ্বিপক্ষীয় যুক্ত প্রতিষ্ঠান। দৈনিক কালান্তর, ১২. ১. ৬৯,
২৮ ৯. ১৩৭৫
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

আমি ইণ্ডিয়া। সাপ্তাহিক কালান্তর, শনিবার, ১৮. ১ ১৯৬৯
লেখা ১৫ ১ ৬৯। পত্রিকা বেরিয়েছে ১৬.১.৬০

অর্জুন, অর্জুন, আজ লক্ষ লক্ষ জনগণমন। দৈনিক কালান্তর, শুক্রবার,
১৭. ১. ৬৯
লেখা ১৫. ১ ৬৯

সইউজ ৯। দৈনিক কালান্তর, শনিবার, ২৫. ১. ৬৯, ১১ মাঘ ১৩৭৫
১৯ ১ ৬৯ তারিখে লিখিত

আজ অন্যদিন। দৈনিক কালান্তর, সোমবার, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, ২৭ মাঘ ১৩৭৫

ফুল ফোটার গল্প। দৈনিক কালান্তর, ১৪. ২. ৬৯, ২রা ফাল্গুন ১৩৭৫

আজ অন্যদিন। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৫ ২ ৬৯, ৩রা ফাল্গুন ১৩৭৫
ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে পুনর্মুদ্রিত

সরকার এখন শ্রমিকদের হাতিয়ার। দৈনিক কালান্তর, বুধবার ২৬ মার্চ ৬৯, ১২ চৈত্র ১৩৭৫

সভ্যতার পিলসুজ। দৈনিক কালান্তর, ২৯ মার্চ ১৯৬৯, শনিবার
২৬ তারিখে লিখিত

মরনে নেহি দেগা। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ৩০ মার্চ ১৯৬৯

মানুষের জয়যাত্রাকে রোধ করা যায় না। দৈনিক কালান্তর, বৃহস্পতিবার, ৩ এপ্রিল, ১৯৬৯
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগের জন্য লিখিত। বড় হয়ে যায় বলে ওঁরা প্রবন্ধাকারে ছেপেছেন।

'মানুষের জয়যাত্রা'। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ১৩. ৪. ৬৯, ৩০. ১২. ১৩৭৫
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

১৩৭৬ [১৯৬৯-১৯৭০]

কমরেড সুধাংশু দাশ। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ১৪ই বৈশাখ ৭৬, ২৭ ৪. ৬৯
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত।

ভাতা বাড়িল। দৈনিক কালান্তর, বুধবার ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ২১শে মে ১৯৬৯
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

ইনিচ প্রদীপ। দৈনিক কালান্তর, (রবিবারের পাতা), ২১ আষাঢ়, ৬ই জুলাই

লেনিনের বাঁচা। দৈনিক কালান্তর, (রবিবারের পাতা), ২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই ১৯৬৯

অর্জুন কবি। দৈনিক কালান্তর, (রবিবারের পাতা), ৪ শ্রাবণ ৭৬, ২০ জুলাই ৬৯
[বিষ্ণু দে র ষাট বৎসর পূর্তিতে]

ঊনসত্তরের পরিপ্রেক্ষিত। পরিচয়, আষাঢ়, জুলাই

শ্রীভি. ভি. গিরি : একটি মানুষ। দৈনিক কালান্তর, বৃহস্পতিবার, ৪ ভাদ্র, ২১ আগস্ট

ভি. ভি গিরির অভিনন্দন। দৈনিক কালান্তর, ২১ আগস্ট ১৯৬৯

গিরির অভিনন্দনবার্তার অনুবাদ

ভি ভি গিরি : একটি মানুষ। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২৩ আগস্ট

দৈনিকের লেখাটির পুনর্মুদ্রণ

'সাধারণ মানুষের সেবক'কে সাধারণ মানুষের অভিনন্দন। দৈনিক কালান্তর, সোমবার, ২৫ আগস্ট ১৯৬৯

PTI প্রচারিত সংবাদের অনুবাদ

হো-চি-মিন, তুমি বাঁচো। পরিচয়, সমালোচনা সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৭৬, অগাস্ট ১৯৬৯

বিয়োগপঞ্জী বিভাগে প্রকাশিত

আরও একটু মৃত্যু। দৈনিক কালান্তর, বৃহস্পতিবার, ১৩ই নভেম্বর ১৯৬৯, ২৭শে কার্তিক ১৩৭৬

'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

ওরা এসেছিল। দৈনিক কালান্তর, ১ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬, ১৭ নভেম্বর ১৯৬৯

শিরোনাম চীফ রিপোর্টারের দেওয়া

১৬ নভেম্বর ওরা এসেছিল। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২২ নভেম্বর, ৬ অগ্রহায়ণ

ভ্যান ত্রয় স্কুল। দৈনিক কালান্তর, ১৯ অগ্রহায়ণ, ৫ই ডিসেম্বর

কে জাগে। দৈনিক কালান্তর, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬, ৯ ডিসেম্বর ১৯৬৯

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের গলায় একই মালা। দৈনিক কালান্তর, ১৮ ১২ ৬৯, ২ পৌষ ১৩৭৬, বৃহস্পতিবার

বিশেষ সংবাদদাতা নামে

স্বপ্নে জাগরণে অবিরাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম (১)। সাপ্তাহিক কালান্তর, শনিবার, ২৭. ১২. ৬৯, ১১ পৌষ ১৩৭৬

স্বপ্নে জাগরণে অবিরাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম (২)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ৩রা জানুয়ারি ১৯৭০, ১৮ পৌষ

তোমার নাম আমার নাম। পরিচয়, অগ্রহায়ণ, ডিসেম্বর ১৯৬৯

'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিভাগে প্রকাশিত

স্বপ্নে জাগরণে অবিরাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম (৩)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১০ই জানুয়ারি, ১৯৭০

লেনিন জন্মশতবার্ষিকী যুব উৎসব। দৈনিক কালান্তর, ১৫.১.১৯৭০, ১লা মাঘ ১৩৭৬

রচনাটি পশ্চিমবঙ্গ লেনিন জন্মশতবার্ষিকী যুব উৎসব প্রস্তুতি কমিটির নামে প্রকাশিত

স্বপ্নে জাগরণে অবিরাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম (৪)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৭ই জানুয়ারি ১৯৭০

স্বপ্নে জাগরণে অবিরাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম (৫)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭০

লেখক সমবায়। রবিবারের পাতা, দৈনিক কালান্তর, ২৫. ১. ১৯৭০

স্বপ্নে জাগরণে অবিরাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম (৬)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৭০

এখন কি করছেন। দৈনিক কালান্তর, ৩. ২. ৭০

স্বপ্নে জাগরণে অবিরাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম (শেষাংশ)। সাপ্তাহিক কালান্তর, ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

লেনিন শতাব্দী (১)। দৈনিক কালান্তর, ৮. ২ ৭০

আমেরিকা

[পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লেনিন জন্মশতবর্ষ জয়ন্তীর বিবরণ]

লেনিন শতাব্দী (২)। দৈনিক কালান্তর, ৯, ২. ৭০

উলিয়ানভস্ক-এ পৃথিবীর ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সম্মেলন, সোভিয়েতে একদিন কমিউনিস্ট সাববোৎনিক

লেনিন শতাব্দী (৩)। দৈনিক কালান্তর, ১০. ২. ৭০

জাপান

লেনিন শতাব্দী (৪)। দৈনিক কালান্তর, ১১. ২. ৭০

কানাডা

লেনিন শতাব্দী (৫)। দৈনিক কালান্তর, ১২ ২. ৭০

কঙ্গো, কিউবা

লেনিন শতাব্দী (৬)। দৈনিক কালান্তর, ১৩. ২. ৬০

সিংহল, ইরান: তেহ্‌রান

লেনিন শতাব্দী (৭)। দৈনিক কালান্তর, শনিবার, ১৪. ২. ৭০

ভিয়েতনাম

লেনিন শতাব্দী (৮)। দৈনিক কালান্তর, ১৫. ২. ৭০

চেকোস্লোভাকিয়া

লেনিন শতাব্দী (৯)। দৈনিক কালান্তর, ১৬ ২. ৭০

সুইডেন

লেনিন শতাব্দী (১০)। দৈনিক কালান্তর, ১৭. ২. ৭০

গ্রেট ব্রিটেন

লেনিন শতাব্দী (১১)। দৈনিক কালান্তর, ১৮. ২. ৭০
ইংলণ্ড, ফ্রান্স

লেনিন শতাব্দী (১২)। দৈনিক কালান্তর, ১৯. ২. ৭০
আমেরিকা

লেনিন শতাব্দী (১৩)। দৈনিক কালান্তর, ২০. ২. ৭০
ইতালি

লেনিন শতাব্দী (১৪)। দৈনিক কালান্তর, ২১. ২. ৭০
কিউবা

একুশে ফেব্রুয়ারি। দৈনিক কালান্তর, ২১.২ ৭০

লেনিন শতাব্দী (১৫)। দৈনিক কালান্তর, ২২.২.৭০
কিউবা

লেনিন শতাব্দীতে শিল্পী-সাহিত্যিকদের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ২২.২.৭০

লেনিন শতাব্দী (১৬)। দৈনিক কালান্তর, ২৩.২.৭০
চিলি, কলম্বিয়া

লেনিন শতাব্দী (১৭)। দৈনিক কালান্তর, ২৪.২.৭০
আফ্রো-এশীয় সংহতি সমিতি, অল আফ্রিকা ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস, কঙ্গো, নাইজিরিয়া

লেনিন শতাব্দী (১৮)। দৈনিক কালান্তর, ২৫ ২.৭০
ইরাক, ইরান, সিরিয়া

লেনিন শতাব্দী (১৯)। দৈনিক কালান্তর, ২৬ ২.৭০
লেবানন, ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র

লেনিন শতাব্দী (২০)। দৈনিক কালান্তর, ২৭.২.৭০
সুদান

লেনিন শতাব্দী (২১)। দৈনিক কালান্তর, ২৮.২.৭০
জাপান

লেনিন শতাব্দী (২২)। দৈনিক কালান্তর, ১.৩.৭০
লাকসেমবার্গ

লেনিন শতাব্দী (২৩)। দৈনিক কালান্তর, ২.৩.৭০
বেলজিয়াম, ফিনল্যাণ্ড

লেনিন শতাব্দী (২৪)। দৈনিক কালান্তর, ৩.৩.৭০
ফ্রান্স

লেনিন শতাব্দী (২৫)। দৈনিক কালান্তর, ৪ ৩.৭০

ফ্রান্স

লেনিন শতাব্দী (২৬)। দৈনিক কালান্তর, ৫ ৩.৭০

চেকোস্লোভাকিয়া

লেনিনের বাঁচা: দুর্গাপুর আঞ্চলিক লেনিন শতবার্ষিকী উৎসব স্মারক পত্র (২-৬ মার্চ)

পুনর্মুদ্রণ

লেনিন শতাব্দী (২৭)। দৈনিক কালান্তর, ৬.৩.৭০

বুলগেরিয়া

লেনিন শতাব্দী (২৮)। দৈনিক কালান্তর, ৭ ৩ ৭০

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র

লেনিন শতাব্দী (২৯)। দৈনিক কালান্তর, ৮ ৩ ৭০

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র

সম্পাদকীয়। লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী যুব উৎসব স্মারকপত্র, ৭—১৫ই মার্চ

লেনিন শতাব্দী (৩০)। দৈনিক কালান্তর, ৯.৩.৭০

পোল্যাণ্ড

লেনিন শতাব্দী (৩১)। দৈনিক কালান্তর, ১০.৩.৭০

মস্কো-চীন

লেনিন শতাব্দী (৩২)। দৈনিক কালান্তর, ১১ ৩.৭০

ইংল্যাণ্ড

লেনিন শতাব্দী (৩৩)। দৈনিক কালান্তর ১২ ৩.৭০

ইংল্যাণ্ড

লেনিন শতাব্দী (৩৪)। দৈনিক কালান্তর, ১৩ ৩.৭০

ইংল্যাণ্ড

লেনিন শতাব্দী (৩৫)। দৈনিক কালান্তর, ১৪ ৩.৭০

স্কটল্যাণ্ড

লেনিন শতাব্দী (৩৬)। দৈনিক কালান্তর, ১৫.৩ ৭০

স্কটল্যাণ্ড

লেনিন শতাব্দী (৩৭)। দৈনিক কালান্তর, ১৬ ৩.৭০

কানাডা, সান মারিনো, জেনেভা

লেনিন শতাব্দী (৩৮)। দৈনিক কালান্তর, ১৭ ৩ ৭০

পাকিস্তান

লেনিন শতাব্দী (৩৯)। দৈনিক কালান্তর, ১৮.৩.৭০

আমেরিকা

লেনিন শতাব্দী (৪০)। দৈনিক কালান্তর, ১৯.৩ ৭০

আমেরিকা

লেনিন শতাব্দী (৪১)। দৈনিক কালান্তর, ২০.৩ ৭০

বার্মা, সুদান

লেনিন শতাব্দী (৪২)। দৈনিক কালান্তর, ২১.৩ ৭০

ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ব্রিটেন

লেনিন শতাব্দী (৪৩)। দৈনিক কালান্তর, ২২.৩.৭০

ইসক্রা ও লেনা

তীতুমীর নগরের ডাক। দৈনিক কালান্তর, ২৯.৩,৭০

সম্পাদকীয়

'পরিচয়'-এ নক্ষত্র মালাকার। দৈনিক কালান্তর, ৮.৪.৭০, ২৫.১২.৭৬

সংবাদ

সংগ্রামী যুবকদের সভায় নক্ষত্র মালাকার। দৈনিক কালান্তর, ১০.৪.৭৬

সংবাদ

পুস্তক পরিচয়। দৈনিক কালান্তর, রবিবারের পাতা, ১২.৪.৭০, ২৯.১২.৭০

কম্বোডিয়ায় মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদে। পরিচয়, চৈত্র ১৩৭৬

বাঙলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের বিবৃতি

লেনিন সরণী। পরিচয়, চৈত্র ১৩৭৬, এপ্রিল ১৯৭০

প্রকাশিত হয়েছে ২৮. ৫ ৭০

লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী যুব উৎসব স্মারকপত্র ১৯৭০। (সম্পাদনা)

৭—১৫ই মার্চ

সম্পাদনা: 'কালান্তর' লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা। ১৯৭০, ২২ এপ্রিল

১৩৭৭ [১৯৭০-১৯৭১]

হরিপদ রঞ্জিতের অহঙ্কার। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১ শ্রাবণ ১৩৭৭, ১৮ ৭.৭০

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। দৈনিক কালান্তর, ২ শ্রাবণ ১৩৭৭, ১৯ জুলাই ১৯৭০

'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

সর্দার। সাপ্তাহিক কালান্তর, জমি দখল সংখ্যা (১)। ৮ শ্রাবণ ৭৭, ২৫.৭.৭০

পঞ্চম বর্ষ। দৈনিক কালান্তর, ২১ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর, ১৯৭০

লেনিন শতাব্দী। সম্পাদনা, মঙ্গলবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০

লেনিনের উদ্দেশে নিবেদিত বাঙলা কবিতা সঙ্কলন

আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন স্মারকপত্র। সম্পাদনা, পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তুতি সম্মেলন ৪-৫ অক্টোবর

বিজয়া দশমী। দৈনিক কালান্তর, শনিবার ১০.১০.৭০, ২৩.৬.৭৭

বাংলার মানুষ কোথায় ? দৈনিক কালান্তর, বুধবার, ২৮ ১০ ৭০ ১১ই কার্তিক ৭৭

'জনমত' বিভাগে শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

একে বন্ধ করা দরকার। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ১লা নভেম্বর ১৯৭০, ১৫ই কার্তিক

'জনমত' বিভাগে তপন উপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

গুরু ও শিষ্য সম্পর্কে দুই বিচার কেন ? দৈনিক কালান্তর, ৩. ১১. ৭০, ১৭ ৭. ৭৭

'জনমত' বিভাগে নচিকেতা দাস ছদ্মনামে প্রকাশিত

কুৎসা প্রচারে রুশ-ভারত মৈত্রী ক্ষুণ্ণ হবে না। দৈনিক কালান্তর, ৪. ১১. ৭০, ১৮. ৭. ৭৭

'জনমত' বিভাগে সিরাজ ইসলাম ছদ্মনামে প্রকাশিত

ব্যাপারটি কি খুবই পরিষ্কার। দৈনিক কালান্তর, ১ জানুয়ারি ১৯৭১, ১৬ পৌষ ১৩৭৭

'জনমত' বিভাগে শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

আমরা কি করব ? দৈনিক কালান্তর, শুক্রবার, ১৫. ১. ৭১. ১লা মাঘ ১৩৭৭

'জনমত' বিভাগে তপন উপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

গণশক্তির দুই পৃষ্ঠায় দুই বক্তব্য কেন ? দৈনিক কালান্তর, ২৩ জানুয়ারি

'জনমত' বিভাগে সিরাজ ইসলাম ছদ্মনামে প্রকাশিত

সি. পি. এম-এর স্বীকারোক্তি। দৈনিক কালান্তর, ২৫. ১. ৭১, সোমবার

'জনমত' বিভাগে তপন উপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

প্রার্থী চাই। দৈনিক কালান্তর, সোমবার, ২৫. ১. ৭১, ১১ মাঘ ১৩৭৭

'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

মাও চিন্তার আত্মঘাতী আগুন। দৈনিক কালান্তর, ২৯. ১. ৭১

'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

প্রতাপচন্দ্রের বঙ্গদর্শন। দৈনিক কালান্তর, ৫. ২ ৭১, ২২ মাঘ ১৩৭৭

'জনমত' বিভাগে তপন উপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

সি. পি এম-এর এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে হবে? দৈনিক কালান্তর, ৯. ২ ৭১

'জনমত' বিভাগে নচিকেতা দাস ছদ্মনামে প্রকাশিত

উহারা সি. পি এম : উহারা থানা হইতে আসিয়াছিল। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৩. ২. ৭১

শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

উহারা সি. পি. এম : উহারা থানা হইতে আসিয়াছিল। দৈনিক কালান্তর, ১৪. ২. ৭১

পুনর্মুদ্রণ

কৃষিবিপ্লব ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পার্থক্য হচ্ছে মাত্র ৪ কোটি ভোট। দৈনিক কালান্তর, ১৮. ২. ৭১

শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

উহারা সি. পি. এম : উহারা থানা হইতে আসিয়াছিল

পুনর্মুদ্রণ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা পরিষদ কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত

না, ভুলিনি এবং ভুলব না। দৈনিক কালান্তর, ২. ৩ ৭১

শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

দুঃখে জীবন জীর্ণ। দৈনিক কালান্তর, ৭ ৩ ৭১

না, ভয় করিব না। দৈনিক কালান্তর, ৯ ৩. ৭১

শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

ভুলিনি ভুলব না। দৈনিক কালান্তর, ১০ই মার্চ ১৯৭১, ২৫ ফাল্গুন ১৩৭৭

ডাক আসিয়াছে। দৈনিক কালান্তর, বুধবার, ১০ ৩ ৭১, ২৫. ১১ ৭৭

সমবেত পাপ ও তার প্রায়শ্চিত্ত। দৈনিক কালান্তর, ২৯ ৩. ৭১

'জনমত' বিভাগে শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

প্রস্তাব। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ৪ ৪. ৭১, ২১. ১২ ৭৭

জেনোসাইড বনাম মুক্তিযুদ্ধ। দৈনিক কালান্তর, ১০ ৪. ৭১ ২৭. ১২. ৭৭

'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

বাঙলাদেশ-সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতির আবেদন : দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ১১, ৪. ৭১, ২৮. ২. ৭৭

আহুতি। দৈনিক কালান্তর, মঙ্গলবার, ১৩ই এপ্রিল ৭১, ৩০ চৈত্র ১৩৭৭

লেনিন শতাব্দী সম্পাদনা, সেপ্টেম্বর ১৯৭০

লেনিনের উদ্দেশে নিবেদিত কবিতা সংকলন

[আগে উল্লিখিত]

১৩৬৮ [১৯৭১—৭২]

বাংলাদেশের জন্য ঐক্য। দৈনিক কালান্তর, রবিবার ১৮ই এপ্রিল, ১৯৭১, ৪ঠা বৈশাখ ১৩৭৮

আমরা আপনাদের দিকে আছি। দৈনিক কালান্তর, ২০.৪.৭১

এবারের রবীন্দ্র উৎসব। দৈনিক কালান্তর, ১৫.৭১, ১৭.১ ৭৮

'জনমত' বিভাগে প্রকাশিত

আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি। দৈনিক কালান্তর, ২.৭.৭১, ১৭.৩.৭৮

বাঙলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি থেকে প্রেরিত স্বাক্ষর-বিহীন রচনাটিই ভিন্ন শিরোনামায় দৈনিক 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত হয়।

অপরাজেয় জন্মদিন। দৈনিক কালান্তর, ১৭ই অগাস্ট, মঙ্গলবার, ৩১শে শ্রাবণ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। দৈনিক কালান্তর, ১৫ই সেপ্টেম্বর বুধবার, ২৯শে ভাদ্র

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৮ই সেপ্টেম্বর

দৈনিক কালান্তরে প্রকাশিত লেখাটির পুনর্মুদ্রণ।

মার্কিন সরকারের মানবসেবা ও আসন্ন জাহাজডুবি। দৈনিক কালান্তর, ২০-এ সেপ্টেম্বর, ৩ আশ্বিন

'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

শবদের যুক্তফ্রন্ট : বাঙলা গল্পের সাম্প্রতিক প্রবণতা। গল্প কবিতা, শারদীয় সংখ্যা, আশ্বিন, সেপ্টেম্বর ১৯৭১

মণি সিং-এর জীবনের একটি অধ্যায়। পরিচয়, শারদীয়, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৮, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৭১

বিদ্যাসাগরের গোপাল ও মানিক বাঁড়ুজ্যে। আন্তর্জাতিক, শারদীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৭১

১০২তম জন্মদিবস ও জাতীয় সংহতি সপ্তাহ। দৈনিক কালান্তর, সোমবার, ৪ অক্টোবর ১৯৭১, ১৭ আশ্বিন ১৩৭৮

প্রথম সম্পাদকীয়

সিংহ চর্মাবৃত। দৈনিক কালান্তর, ৫ অক্টোবর
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

পিংপং বনাম ভ্যানত্রয়। দৈনিক কালান্তর, ৬ অক্টোবর
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

জন্মদিনের প্রতিশ্রুতি। দৈনিক কালান্তর, ৭ অক্টোবর
প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়

শেখ মুজিবের পক্ষে বিশ্ববিবেক। দৈনিক কালান্তর, ৮ অক্টোবর
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আরেকটি চক্রান্ত। দৈনিক কালান্তর, ১১ ১০.৭১
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

খুচরা পয়সার কৃত্রিম অভাব ও তার প্রতিকার। দৈনিক কালান্তর, ১৩.১০.৭১
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

ভুট্টো, প্রস্তুত হও! দৈনিক কালান্তর, ১৩.১০.৭১, বুধবার
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

বাঙলা দেশ প্রসঙ্গে আরও একটি অগ্রসর পদক্ষেপ। দৈনিক কালান্তর, ২২.১০.৭১
দ্বিতীয় সম্পাদকীয়

ইন্দিরা কংগ্রেস কি ভেবে দেখবে? দৈনিক কালান্তর, ২৫.১০ ৭১
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতি আহ্বান: আয় রে ভাই লড়াইয়ে যাই। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ৫.১২.৭১, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

প্রস্তাব। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ১৯.১২.৭১, ৩ পৌষ ১৩৭৮
ভারতরাষ্ট্র কর্তৃক বাঙলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারকে স্বীকৃতিদান উপলক্ষে বাঙলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের উৎসব সভায় গৃহীত মূল প্রস্তাব

লেনিনের দশহাত। সাপ্তাহিক কালান্তর, শনিবার, ১ ১. ৭২
[ইউক্রেনের সোভিয়েত-ভারত সংস্কৃতি সমিতির আমন্ত্রণে সোভিয়েত ভ্রমণের বিবরণ]

লেনিনের দশহাত। সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৫. ১. ৭২

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামই এই মুহূর্তের শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম। দৈনিক কালান্তর, সোমবার, ১৭. ১ ৭২
'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

লেনিনের দশ হাত। সাপ্তাহিক কালান্তর, ২৯. ১. ৭২

শহীদ মিনার। দৈনিক কালান্তর, রবিবার, ২০ ফেব্রুয়ারি, ৭ ফাল্গুন
১৯ ফেব্রুয়ারি লেখা

নেয়ারের খাট, মেহগিনি পালঙ্ক ও একটি ছুটি সন্ধ্যা। মানিক বিচিত্রা, মে দিবস ১৯৭১

রক্তাক্ত কারা? কে আক্রমণকারী? দৈনিক কালান্তর, ৫ মার্চ ১৯৭১

এক বৃদ্ধের প্রার্থনা। দৈনিক কালান্তর, ৭ মার্চ
'জনমত' বিভাগে শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো। পরিচয়, একুশে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা

হওয়া না-হওয়া। (গল্প সংকলন), মঙ্গলবার ২৩ ফাল্গুন, ১৩৭৮, ৭ মার্চ, ১৯৭১

আমার স্বপ্নের জন্য। দৈনিক কালান্তর, শনিবার, ১১ মার্চ, ২৭ ফাল্গুন।

মণি সিং-এর জীবনের একটি অধ্যায়। সংবাদ, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ১৯৭২, রবিবার, ১২ চৈত্র, ২৬. ৩. ৭২

হওয়া না-হওয়া। (গল্প সংকলন)। ফেব্রুয়ারী ১৯৭২
ফুল ফোটার গল্প, অশোকবন, পরিপ্রেক্ষিত, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, নির্বাসন, উৎসর্গ, হওয়া না-হওয়া
[আগে উল্লেখিত। দুই উল্লেখে প্রকাশ তারিখের পার্থক্য আছে]

১৩৭৯ [১৯৭২-৭৩]

অভাব নাটক: একটি আবেদন। বহুরূপী জয়ন্তী সংখ্যা, ১ মে ১৯৭২

ভিয়েতনাম: উৎসবের আহ্বান। পরিচয়, মার্চ-এপ্রিল (১৬ ৫. ৭২, প্রকাশিত)

সম্পাদকীয়। পরিচয়, মার্চ এপ্রিল '৭২, ফাল্গুন চৈত্র ১৩৭৮
অস্বাক্ষরিত

চিরন্তন আগুন। আন্তর্জাতিক, জুলাই ১৯৭২

'পরিচয়'-এর একচল্লিশ বছর পূর্তি: একটি আবেদন। দৈনিক কালান্তর, রবিবার ২০ আগস্ট, ১৯৭২

শান্তি ও সংহতির জাতীয় সম্মেলন। দৈনিক কালান্তর, শনিবার, ২৬. ৮. ৭২,
ফিচার

শান্তি ও সংহতির জাতীয় সম্মেলন। দৈনিক কালান্তর, বুধবার, ৩০ ৮. ৭২

আমার যৌবনস্বপ্নে ছেয়ে গেছে বিশ্বের আকাশ। দৈনিক কালান্তর,

শান্তি ও সংহতির জাতীয় সম্মেলন। দৈনিক কালান্তব, ববিবাব, ১৭ সেপ্টেম্বর।

বিচার। দৈনিক কালান্তব, সাবা ভাবত শান্তি ও সংহতি সম্মেলন সংখ্যা, বুধবাব, ২০ সেপ্টেম্বব ১৯৭২

ভিয়েতনাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেব কবব খুঁড়ছেই। দৈনিক কালান্তর, শুক্রবাব ২৭ অক্টোবব

'প্রসঙ্গক্রমে' বিভাগে প্রকাশিত

পবিশিষ্ট

[দীপেন্দ্রনাথ ১০৭৩-৭৪ সাল পর্যন্ত তাঁব বচনাপঞ্জি তৈবি বেখে গেছেন; তাবপব থেকে প্রধানত 'পবিচয' ও 'কালান্তব'-এ প্রকাশিত তাঁব বচনাগুলিব একটি তালিকা আমরা তৈবি কবেছি। এ-তালিকাও অসম্পূর্ণ; তাঁব 'বচনা-সমগ্র'-য আমবা এই সময়েব পূর্ণতব তালিকা প্রকাশ কবতে পাবব, আশা কবি।

'পবিচয'-এব পক্ষ থেকে মালবিকা চট্টোপাধ্যায এই সমযে প্রকাশিত লেখাগুলি সন্ধান ও বচনাপঞ্জিব এই অংশ তৈবি কবেছেন।

অনুল্লেখিত কোনো বচনাব সন্ধান কাবো জানা থাকলে দযা কবে আমাদেব জানাবেন।]

১৩৮১ [১৯৭৪-১৯৭৫]

ফ্যাসিস্ট বিবোধী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি। পবিচয়, ফাল্গুন-চৈত্র, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭৫

ভাবতে ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থানেব প্রযাসেব বিরুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদেব আবেদন-সহ ১৯৭৫-এব ২৬ এপ্রিল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে অনুষ্ঠিত সমাবেশেব বিবরণ।

এফ্রো-এশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকা: সমস্যা ও প্রতিকারের পথ। পবিচয়, জানুয়াবি

১৩৮২ [১৯৭৫-১৯৭৬]

সংগ্রাম, ভালোবাসা আব জয়ের প্রতীক আর্নেস্ট থেলমান। পবিচয়, বৈশাখ-আষাঢ়, মে-জুলাই ১৯৭৫

ফ্যাসিবাদেব বিরুদ্ধে মানবজাতির বিজয়েব ত্রিশতম বার্ষিকী উপলক্ষে। পরিচয়, বৈশাখ-আষাঢ, মে-জুলাই, ১৯৭৫

['পবিচয', ফ্যাসিস্ট-বিবোধী বিশেষ সংখ্যায, মে-জুলাই ১৯৭৫, চল্লিশেব দশকে প্রকাশিত বাজনৈতিক ও সাহিত্যিক পত্র-পত্রিকা পুস্তক-পুস্তিকা থেকে নানা লেখা সংগৃহীত হয। এই বচনাগুলিব পবিচিতিমূলক ভূমিকা দীপেন্দ্রনাথ লেখেন—অনেকগুলি। এই লেখাগুলি সংগ্রহ কবতে এই সময তিনি চল্লিশেব দশকেব পত্র-পত্রিকা নিযে প্রচুব গবেষণা কবেন। ফলে নোটগুলি মিলে যেন একটি সম্পূর্ণ বচনারই আভাস মেলে। এই সংখ্যায, একমাত্র 'সমুদ্রেব মৌন' বচনাটিব ভূমিকা ব্যতীত 'সম্পাদক, পরিচয' স্বাক্ষবিত আব সব নোটই দীপেন্দ্রনাথেব।]

নো পাসারন। কালান্তব (দৈনিক), ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ২ জুন, ১৯৭৫

[ফ্যাসিস্ট-বিবোধী আন্দোলনেব পবিপ্রেক্ষিতে কলকাতায জয়প্রকাশ নাবাযণেব সভায সি পি এম-এব যোগদান উপলক্ষে লিখিত]

বিনয় রায়। কালান্তর (দৈনিক), ২১ আষাঢ, ৬ জুলাই, ১৯৭৫

বিশ্বরঞ্জন দে। পবিচয়, অগ্রহায়ণ, ডিসেম্বর, ১৯৭৬

[বিয়োগপঞ্জি]

সত্যজিৎ বায়-এব 'জন-অরণ্য' প্রসঙ্গে কিছু কথা। পরিচয়, পৌষ-মাঘ, জানুয়াবি-ফেব্রুযাবি, ১৯৭৬

সম্পাদকীয়। পবিচয়, পৌষ-মাঘ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়াবি, ১৯৭৬,

[১ ও ২ মে, ১৯৭৬-এ পশ্চিমবাংলা প্রগতি লেখক সংঘ-এব সম্মিলনেব বিবরণ। পত্রিকাব সংখ্যা মে মাসেব শেষে বেবোয। এই সংখ্যা থেকেই দীপেন্দ্রনাথ 'পবিচয'-এব একক সম্পাদক নিযুক্ত হন।]

•

১৩৮৩ [১৯৭৬-১৯৭৭]

আমার বুলার জন্য। কালান্তর (সাপ্তাহিক), ২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ, ১৯৭৭

উডাওরে উর্ধ্বে লাল নিশান। কালান্তর (দৈনিক), ২৭ ফাল্গুন, ১১ মার্চ, ১৯৭৭

১৩৮৪ [১৯৭৭-১৯৭৮]

ববীন্দ্রনাথেব ছোটগল্প-ব উপব 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রেব বিশেষ সংখ্যায একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয।

'ঘবোযা' সাপ্তাহিক পত্রে কযেকটি ফিচাব লেখেন। ক্ষীবোদ নট্টকে নিযে ববিবাবেব কালান্তবে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয।

এই বচনাগুলি প্রকাশের সঠিক তাবিখ সন্ধান করা হচ্ছে।

১৩৮৪ [১৯৭৮-১৯৭৯]

পাড়ি। পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা, আগস্ট-অক্টোবর
[শেষ প্রকাশিত রচনা]

টীকা

১ এই সংকলনটি সম্পর্কে দীপেন্দ্রনাথ ১৭২৭৮-এ একটা চিঠিতে লিখেছেন, (সাধন দাশগুপ্তকে) সম্পাদক হিসেবে আমি চিরকালই দুঃসাহসী। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার আগে কিশোর বয়সে একবার 'সবুজের অভিযান' নামে একটি সংকলন করেছিলাম। আমি তখন অসুস্থ—বছর দুই টানা রোগশয্যায়। চিঠি দিয়ে অনেকের লেখা পেয়েছিলাম। তার মধ্যে একজন ছিলেন 'বনফুল'। তিনি রীতিমতো একটি গল্প লিখলেন যার কিশোর হিন্দু নায়ক পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিল পশ্চিমবাংলায় একটি মুসলমানের বুকে ছুরি বসিয়ে। সোজা সাম্প্রদায়িক উস্কানির গল্প, কোনো আড়াল নেই। আমি প্রায় বালক ছিলাম তখন। সেই গল্পকে পালটে একেবারে সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর গল্প করে দিলাম।·· ···

২ 'পরিচয়'-এর বর্তমান সংখ্যায় সন্‌জীদা খাতুন-এর রচনাটিতে দীপেন্দ্রনাথের এই সফর সম্পর্কে কিছু কথা আছে।

৩ ইলা মিত্র-কে এই দেখা ও ইলা মিত্র-র জীবন দীপেন্দ্রনাথের লেখকজীবনে এক পুরাণ হয়ে উঠেছিল যেন। এ-বিষয়ে তাঁর কয়েকটি লেখা আছে, 'ফুল ফোটার গল্প' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইলা মিত্র-র ওপর প্রথম লেখা ও 'পরিচয়'-এও তাঁর প্রথম লেখা 'সূর্যমুখী', এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হল।

৪ এই সংখ্যায় জ্যোতি দাশগুপ্ত-এর রচনায় এই লেখাটি কি করে শুরু হল সে-বিষয়ে তথ্য আছে।

[দীপেন্দ্রনাথ এই নোটটিও রেখে গেছেন, তাঁর কাগজপত্রের ভেতর]

জন্ম : শুক্রবার ২৪ কার্ত্তিক ১৩৪০
১০ নভেম্বর ১৯৩৩

নাম—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছদ্মনাম—১. কজ্জল সেন
২. শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
তপন উপাধ্যায়, নচিকেতা দাস, সিরাজ ইসলাম, কাজল সেন, দীপান্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামেও একটি-দুটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

জন্ম তারিখ—২৪ কার্তিক ১৩৪০
১০ নভেম্বর ১৯৩৩

প্রথম প্রকাশিত বচনা—আমাব দেশের মানুষ। দৈনিক 'কিশোব', সোমবার, ৫ পৌষ, ১৩৫৫।

গ্রন্থ তালিকা—১. আগামী (প্রথম খণ্ড : মাঝি)
শ্রেণী—উপন্যাসিকা
প্রকাশকাল—১৪ কার্তিক ১৩৮৫ (১৯৫১)

২. কাছেব যারা
শ্রেণী—গল্প সঙ্কলন
প্রকাশকাল—বৈশাখ ১৩৬১ (১৯৫৪)

৩ তৃতীয় ভুবন
শ্রেণী—উপন্যাস
প্রকাশকাল—ভাদ্র ১৩৬৫ (১৯৫৮)

৪ বর্ষাপদেব হবিণী
শ্রেণী—গল্প সঙ্কলন
প্রকাশকাল—শ্রাবণ ১৩৬৭ (১৯৬০)

৫ অশ্বমেধের ঘোড়া
শ্রেণী—গল্প সঙ্কলন
প্রকাশকাল—আষাঢ় ১৩৭০ (১৯৬৩)

৬. হওযা না-হওয়া
শ্রেণী—গল্প সঙ্কলন
প্রকাশকাল—ফাল্গুন, ১৩৭৮ (১৯৭২)

সম্পাদিত গ্রন্থ—১. লেনিন শতাব্দী
শ্রেণী—কাব্য সঙ্কলন
[লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে লেনিনেব উদ্দেশে নিবেদিত ১০০ জন বাঙালি কবির কবিতা]
প্রকাশকাল—ভাদ্র ১৩৭৭ (১৯৭০)

২ প্রতিরোধ প্রতিদিন
ফ্যাসিবিরোধী রচনা সংকলন
প্রকাশকাল—১৩৮৩ (ডিসেম্বব ১৯৭৫)

সম্পাদিত পত্রিকা—পরিচয়

প্রথম প্রকাশকাল—শ্রাবণ ১৩৩৮, আগস্ট ১৯৩১। শ্রাবণ ১৩৭৫, আগস্ট ১৯৬৮ থেকে অন্যতম সম্পাদক

ঠিকানা—৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭।

এছাড়া ছাত্রজীবন থেকে বিভিন্ন সঙ্কলন ও পত্রিকা সম্পাদনা করেন

১. সবুজের অভিযান (১৩৫৭)
২ উজান (১৩৬০)
৩ ছাত্র অভিযান [বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের মুখপত্র] (১৩৬৫)
৪. একতা [কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী] ১৩৬৫
৫. আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় যুব উৎসব স্মারক সম্মেলন (১৩৬৯, ১৩৭৫, ১৩৭৭)
৬. পশ্চিমবঙ্গ আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন স্মারকপত্র (১৩৭৭)
৭. শারদীয় কালান্তর (১৩৭৫, ১৩৭৬, ১৩৭৭, ১৩৭৮, ১৩৭৯)
৮ কালান্তর [লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা] (১৩৭৭, ১৯৭০)

গগন ঠাকুরের সিঁড়ি

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুম যে ভেঙেছে, এটুকু বুঝতে খানিক সময় লাগল। গড়িয়ে খাটেব একদিকে চলে এসেছিল। চোখ খুলতেই টেবিলেব তলা দিয়ে দেয়ালের কোণে চোখ আটকাল। অন্ধকাব। শীত কবছিল। ঘুমেব মধ্যেই কখন বিছানাব চাদরটা টেনে গায়ে জড়িয়েছে জানে না। আব একটু কুঁকড়ে শুলো। রাত যায় নি। এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙল কেন? আশ্চর্য, ইচ্ছে করলে আজ আমি সূর্যোদয় দেখতে পাবি। কবে যেন একটা সূর্যোদয় দেখে, কবে যেন আমাব জীবনে একটা, কবে যেন সূর্যোদয় ·

তন্দ্রায় তলিয়ে যেতে যেতে নিশানাথ প্রশ্নটা ভাবছে, এমন সময় পাশেব বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠল। নিশানাথ একটু বিব্রত বোধ কবল। কারণ ভোব বাতে শাঁখ বড বাজে না। আজ কি কোনো পুজো? আজ তাবিখ কত?

দূরে আবার কোথায় শাঁখ বাজল। আর পলকে নিশানাথ নিজেব ভুল বুঝল। দুপুবে ঘুমিয়েছিল, তারপব সন্ধে নেমে অন্ধকাব হয়েছে। এখন বাত্রি।

নিশানাথ কানেব কাছে যেন অস্ফুট উচ্চারণ শুনল, রাত্রি। তার তাবৎ শবীব অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে বাত্রিব ইন্দ্রিয়গুলিকে অনুভব কবল। আসলে রাত তাব কাছে নিছক একটি ধ্বনি নয়। তাব স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতাব পবিমণ্ডলে শব্দটি এক বিশেষ অনুষঙ্গ আনে। নিশানাথকে কেউ ঠেলে তুলল।

পোষাক পালটে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে রাস্তায় নামতেই মনে পড়ল, মুখ ধোয়া হয় নি, চুল আঁচড়ানো হয় নি, আরো কি যেন একটা - যা পেটে আসছে অথচ মনে আসছে না।

নিশানাথ হেসে ফেলল। বেশ ভেবেছি। কথাটা আর একবার মনে হতেই নিশানাথ প্রায় শব্দ করে হেসে উঠে লক্ষ্য করল জনৈক মাথা ভাঙা গ্যাসপোস্টের গায়ে ঝোলানো একটা দড়ির মাথা থেকে সিগারেটে আগুন ধরাতে ধরাতে মুখ তুলে তাকে একবার দেখল, বলল, 'ও, আপনি', তারপর আবার আগুন ধরাতে লাগল। মুখে সিগারেট থাকায় লোকটির কথাগুলি জড়িয়ে গেছিল। নিশানাথ বলল, 'হুঁ', তারপর হাঁটতে লাগল।

অবশ্য নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। লোকটি আমাকে চেনে। হঠাৎ দেখে এইভাবে রেকগ্‌নাইজ্‌ করল।

একলা এবং নিজের মনে কাউকে হাসতে দেখলে বিস্ময় বা বিরক্তি স্বাভাবিক। পাগল ভাবাও বিচিত্র নয়। সে কারণে ভদ্রলোক মুখ তুলে আমাকে চিনতে পেরে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার সিগারেট ধরাতে লাগলেন।

ভদ্রলোক দেখেই বুঝলেন এ জাতীয় অস্বাভাবিক আচরণ এক আমার পক্ষেই সম্ভব। তাই নতুন করে বিচলিত বোধ করলেন না।

এখন, ভদ্রলোক সত্যিই কি ভাবলেন, আমি তা কেমন করে বুঝব। প্রথমত আমি তাঁকে চিনি না। দ্বিতীয় ভদ্রলোক আমাকে আদপে চেনেন কিনা। দ্বিতীয়ত, উঁহু তৃতীয়ত—চিনলেও, কতটুকু—তা জানি না। কোথায়, কি ভাবে, কোন্‌ অবস্থায় দেখে আমার সম্পর্কে কি ধারণা করে রেখেছেন—তাও জানা নেই। অবশ্য মানুষ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি এমনই বিচ্ছিন্ন, কাঁচা। তথাপি এই ধারণা নিয়েই আমরা সভ্য-জীবন অতিবাহিত করে থাকি। ও, মনে পড়েছে। আসলে দাড়ি কামানো হয় নি। হুঁ, ঠিক। পেটে আসছে, মনে আসছে না। হুঁ, ঠিক। আচ্ছা, লোকটা তো আমাকে অন্য কেউ ভেবে পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ও-কথা বলতে পারে!

নিশানাথ স্থির করল দাড়ি কামাবে। আর পলকে তার বেজায় শীত ধরল, ঘন ঘন হাই উঠতে লাগল। তখন সে খুব উদারভাবে নিজেকে বলল, আজ থাক নিশানাথ। মনোভাবে তখন সেই রাজা, যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রাজদ্রোহীকে শেষ মুহূর্তে ক্ষমা করার উদারতা দেখিয়েছিল। আসলে, প্রভু-ভৃত্য আমরা সকলেই এক একটি সম্রাট। যদিচ উভয়ের ক্ষেত্র -

আলাদা। এই যেমন, দাড়ি কামাব কি কামাব না—এখানে আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

অতঃপর নিশানাথ কিছুটা অন্যমনস্ক ও দ্বিধাগ্রস্তভাবে সামনের চায়ের দোকানটায় ঢুকে পড়ল। পাড়ার রেস্টুরেন্ট, সে কারণে নিশানাথ একেবারে অপরিচিত নয়। মোটামুটি ভীড় ছিল। সন্ধেবেলাটা রাস্তার মোড়, বাড়ির রোয়াক, চায়ের দোকান এবং পার্ক বা ময়দান কোলকাতার বৈঠকখানা। রাত হলে গোটা শহরটাই কলকাতার অন্তঃপুর। সকাল আমি জানি না। কলকাতায় বোধহয় সকাল নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর পর কলকাতায় বোধহয় কোনোদিন সকাল হয় নি। আর দুপুর আমার বিষয়ের বাইরে। চড়া রোদ, প্রখর আলো, যাবতীয় স্পষ্টতা নিয়ে দুপুর বড় প্রাগৈতিহাসিক।

নিশানাথ গলা পরিষ্কার করে অনুচ্চ স্বরে ডাকল, গোলাম হোসেন?

সেই ছেলেটি এসে দাঁড়াল।

নিশানাথ বলল, হুঁ, এখনও আছিস? চা-ফা-দে।

ছেলেটা যার নাম ক্ষিতীশ এবং যাকে যে কেউ যা ইচ্ছে নামে ডাকে, বলল, রোজ রোজ বাবুর এক কথা।

নিশানাথ মৃদু হাসল। বালক, তুমিও কি রোজ রোজ নতুন কথা শুনতে চাও? না কি মনোগত প্রৌঢ়তায় আমাকেও ছাড়িয়ে গেছ, যে কারণে কথামাত্রই তোমাকে বিরক্ত করে? বলল, জানিস না তো? তুই এসেছিস সাতদিন। আর তোর ম্যানেজারবাবুকে জিজ্ঞেস কর, গত দু-বছরে লাখখানেক ছোকরা কাজ করেছে চলে গেছে।

নিশানাথ ছোকরা শব্দটা ব্যবহার করায় মনে মনে অপ্রতিভ হলো। কিন্তু ছেলেটির চোখে মুখে তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। হঠাৎ লক্ষ্য করল ছেলেটি আজ উল্টে আঁচড়াবার চেষ্টায় মাথাটাকে সজারু বানিয়েছে। নিশানাথের বমি এলো। এবং সে নিজের এই প্রতিক্রিয়ায় যারপরনাই বিস্মিতও হলো। কারণ এ তো অনিবার্যই ছিল। চোখের সামনে কতগুলি নিষ্পাপ ছেলেকে সে এইভাবে বুড়িয়ে যেতে দেখল। যুদ্ধ পাশ্চাত্য কমিউনিজম দিয়েছে বা ক্যাথলিসিজম্‌কে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছে। হাতে রইল পেন্সিল—এ্যাবসর্ডিটির তত্ত্ব। একজিস্‌টেন্‌সিয়ালিস্ট এ্যাংগ্রি ইয়ংম্যান: বেট জেনারেশন। আমাদের দেশে যুদ্ধ দিল গণোরিয়ার মহৌষধ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও তার ব্যর্থতার কৈফিয়ৎ, আর বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্ব—ঘর-কৈনু বাহির। ফলে কলকাতা শহরটা পাল্টে গেল। দু পা অন্তর চায়ের দোকান,

ওষুধের দোকান। আর দু শ পা অন্তর মদের দোকান, সিনেমার দোকান। আর রাত হলে সমস্ত শহরটা যেহেতু অন্তঃপুরে, সেহেতু পত্নী-উপপত্নী এবং নিছক শয্যাসঙ্গিনীর সন্ধানে এক পাও হাঁটতে হয় না। আধুনিকতায় চোলাইয়ে কলকাতা তার বাবু কালচারকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। মাঝে মাঝে আমরা আরও পেছিয়ে যাই। আমি তো বুঝি না কলকাতাকে গ্রাম বলতে বাধা কোথায় ?

ঠকাশ করে চায়ের কাপ নামিয়ে ছেলেটি বলল, বাবু ?

নিশানাথ চোখ তুলে তাকাল।

বাবু ?

উঁ ?

আমায় একটা ঠিকানা লিখে দেবেন ?

নিশানাথ যথেষ্ট বিস্মিত হয়ে বলল, কেন ? আসলে সে বলতে চেয়েছিল — কিসের ?

ছেলেটি বলল, আমার মায়ের। আমি তো ইংরিজি জানি না। তারপর একটু হেসে, যে হাসি নিশানাথ একমাত্র প্রেমিকার মুখে কল্পনা করতে পারে, বলল, আপনার জন্যে রেখে দিয়েছিলাম।

ওঃ। নিশানাথ উত্তরে চায়ের কাপে মুখ দিল। বোবা কাণ্ড। ছেলেটি আমাকে মহৎ ভেবেছে, অন্তত পরোপকারী, নিদেন ঘনিষ্ঠ। ছেলেটি সারাদিন আমার প্রতীক্ষা করেছিল। ধন্য নিশানাথ। একজন তোমার অপেক্ষায় ছিল, তোমাকে দিয়ে সে কাজটা করিয়ে নেবে, তার মায়ের চিঠি—তার মা, কি লিখবে ছেলেটি, তার মা কি জানবে পোস্টকার্ডের ঠিকানাটা যার লেখা সে একটা আধুনিক মানুষ, ফলত ইতর, থুড়ি নিস্পৃহ। সে তার ছেলেকে দেখে গোলাম হোসেন বলে ডাকে—কারণ এইভাবে তার মনের অচরিতার্থ প্রভুত্ব বাসনা প্রকাশের পথ পায়। অস্ফুটে ডাকে, কারণ সে শিক্ষিত। সে তার ছেলের সঙ্গে রোজ কিছু না কিছু কথা বলে, কিন্তু তার নাম মনে রাখে নি, মুখ মনে রাখে নি, কিছু মনে রাখে নি।

নিশানাথ কাপ থেকে মুখ তুলছে না। কারণ সে এই সুযোগে ছেলেটির মুখের কোনো ছাপ মনে আছে কিনা যাচিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। মোটামুটি একটা আদল যখন তার কাছে স্পষ্ট হলো তখন সে চোখ তুলে দেখল সামনে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এই

ছেলেটিকেই সে একটু আগে চায়ের অর্ডার দিয়েছিল। নিজের কাছে যথারীতি নিশানাথের আর-এক মস্ত চুরি ধরা পড়ে গেল।

নিশানাথ বলল আর কাউকে বললেও তো পারতিস।

ছেলেটি আবার সেইভাবে হাসল। যে-হাসি নিশানাথ কোনো প্রেমিকার মুখে কল্পনা করতে পারে, যদিচ তার চুল আঁচড়াবার ধরনের পাশে যে-হাসিটি অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য এমন কি অশ্লীলতা সৃষ্টি করে, অথচ দুটি চোখের ভাষায় যে-হাসির অকৃত্রিম সাক্ষ্য মেলে। তারপর মুখ নামিয়ে বলল, লজ্জা করে।

নিশানাথের সমস্ত শরীর রি রি করে উঠল। ডেঁপো ছোকরা। বদমাস, লম্পট। অন্য সকলকে লজ্জা করে, আমাকে লজ্জা নেই? কেন, আমি চা খেয়ে পয়সা দিই না? মোটামুটি ভদ্রলোকের মতো জামা কাপড় পরি না? ও-ওহ্, দাড়িটা কামানো হয় নি। তাই, তাই স্কাউন্ড্রেল আমাকে তোমার লজ্জা নেই। তুমি ভেবেছ আমিও তোমারই মতো জনৈক হরিদাস পাল। তাই আমার সঙ্গে তোমার ছেনালি করা সাজে।

বাবু?

কি?

আনব চিঠিটা?

তিন থাপ্পড় মারব ইযারকি করলে।

নিশানাথ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল প্রথমে বিস্ময়, তারপর অবিশ্বাস, তারপর অপমান বা বেদনাগোছের কিছু একটা ব্যাপার কি দ্রুত ছেলেটির মুখের রঙ পাল্টাল।

নিশানাথ চিৎকার করে উঠল, আমি তোমার ইয়ার?

নিশানাথের কণ্ঠস্বরে সকলেই সচকিত। আশেপাশের টেবিলে যাঁরা এতক্ষণ সস্তা রবীন্দ্র রচনাবলী, ঘোড়ার বাজি, চিত্রতারকার ডিভোর্স, নেহরুর বাঙালী-বিদ্বেষ জাতীয় আলোচনায় মগ্ন ছিলেন—তাঁরা অনেকেই হাতের কাছে একটা টাটকা প্রসঙ্গ পেয়ে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

কি দাদা, ব্যাপার কি?

কি হলো, নিশানাথ বাবু?

এই রেস্টুরেন্ট বয়গুলো যা হয়েছে না মশাই। চাব্‌কে সব—

নিশানাথ বিমূঢের মতো সেই ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটির চোখে আতঙ্ক। কোণের ক্যাশ টেবিলে ডিম, কেকের বোয়ম আর পাঁউরুটির

টিনেব আডালে ম্যানেজার বসেছিলেন। তিনি হঠাৎ উঠে এসে ছেলেটাব কান ধরে দু-তিনটে চড মাবলেন।

কে একজন বলল, থাক থাক, এত জোবে মাববেন না।

কে একজন বলল, রাখুন মশাই, চাব্‌বে—

ম্যানেজার নিশানাথকে বললেন, ছেড়ে দিন স্যার। অজাত-কুজাত, মা-বাপ নেই, কি বলতে কি বলে ফেলে। এই ছোঁড়া, যা ভেতবে যা।

ব্যাস। ব্যাপাবটা মিটে গেল। ছেলেটি কি বলছিল, ম্যানেজাব তা শুনতেও চাইলেন না। কারণ নিশানাথ বুঝল, ভদ্রলোক জানেন কথায় কথা বাডে। বস্তুত নির্ঝঞ্চাটে দোকান চালানোই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। সুতবাং নিশানাথ সত্যিই অপমানিত হয়েছে কিনা, হলে এটুকু ক্ষমা-প্রার্থনাই যথেষ্ট কি না—সে ব্যাপাবে ম্যানেজাবের কোনোই মাথা-ব্যথা নেই। আব এই লোকগুলোও মুহূর্তে পূর্ব-প্রসঙ্গে ফিরে গেছে। ছেলেটি বলেছিল, ছেলেটিব পক্ষে কি বলা সম্ভব—এ ব্যাপাবেও কারোব কৌতূহল থাকল না।

নিশানাথ চায়েব দাম মিটিয়ে বাইরে বেরোল। কিন্তু আমি এবকম কবলাম কেন? জানি না। ছেলেটি আমায় কি ভাবল? জানি না। কাল দোকানে এসে পুনবায় গোলাম হোসেন বলে ডাকতে পাবব কি? জানি না। ডাকলে ছেলেটি এইভাবে এসে দাঁড়াবে কি? জানি না। কিন্তু ছেলেটাব ঠিকানা লিখে দেবে কে? জানি না। ছেলেটিব মা—আহ্, মা। মরুক গে, দাডিটাই কামিয়ে নি।

অতঃপর নিশানাথ ব্যাপারটা প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হযে সেলুনেব চেয়াবে বসে আয়নায় নিজেব মুখ, নাপিতের ঝুঁকে পড়া শবীব, পেছনেব দেয়ালে ক্যালেণ্ডার ইত্যাদি দেখতে দেখতে হঠাৎ লক্ষ্য করল ক্যালেণ্ডাবেব অক্ষবগুলি সব উল্টো, পডা যাচ্ছে না। অথচ ক্যালেণ্ডারের ছবিটা ঠিক আছে।

তাহলে আয়নায় যে ছায়া পড়ে, তা উল্টো। আমাব ছায়াও উল্টো। হাত তুলল। উল্টো। অথচ, সোজা। এ বড বিচিত্র হলো। প্রতিবিম্ব মাত্রেই উল্টো। অথচ তাকেই আমরা সোজা দেখি, ঠিক দেখি। আয়নার আবিষ্কাব হয়েছে কত বছর? কোটি কোটি মানুষ এইভাবে নিয়ত নিজের উল্টো ছায়াব অহমিকায় রূপ, প্রণয় ইত্যাকাব সাধু ব্যাপারগুলি নিযে কত না কাণ্ড কবল! আমাদের চোখও তো দর্পণ। তাহলে বস্তুর যে প্রতিভাস আমরা দেখি, তাও তো উল্টে। তাহলে চিরদিন মানুষ যা কিছু দেখেছে,

উল্টো দেখেছে। যা কিছু পড়েছে, উল্টো পড়েছে। তাহলে এই যে মানুষের সৃষ্টি, সভ্যতা, ঐতিহ্য—তার ভিত্তিটাই কোনো কালে সোজা নয়।

নিশানাথ অতীব আনন্দিত বোধ করল। বেড়ে, খুব একচোট নেওয়া গেছে। মূর্খের দল, তোমরা কি জানো—উহুহ্। নিশানাথ অস্ফুট আর্তনাদ করে বলল, কেটে ফেললে তো ব্রণটা ?

ছোকরা খবরের কাগজের টুকরোয় খুরের গায়ে জমা সাবানের ফেনা মুছতে মুছতে হেসে বলল, ডেটল লাগিয়ে দিচ্ছি স্যার।

সাদা ফেনায় কাটা দাড়িগুলো কালো কালো ছিটের মতো জড়িয়ে আছে। সাদা ফেনায় কালো ছিট। এতে একটু ক্রিমসন রেড হলে, এক ফোঁটা। নিশানাথ ভাবল বলে, আমার গালটা কামাতে কামাতে এমনভাবে একটু কেটে দাও—যাতে ব্যথা না পাই। তারপর সেই রক্তটা তোমার সাবানের ফেনায় ঠিক যখন মিশে যাবে। আর ঐ কালো ছিটগুলো—

নিতান্ত প্রেমিকের মতো নাপিত ছোকরা নিশানাথের চিবুকটা আস্তে উঁচু করল। নাপিতের হাতে পৃথিবীর তাবৎ মানুষ এক। এবং নিশানাথ লক্ষ্য করেছে কতকগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষকেই এরা সমভাবে পরিচর্যা করে। খানিকটা অভ্যাসে, কিছুটা বা পেশার তাগিদ ও গরিমায়। নিশানাথ একদিন দেখেছিল একটি হিন্দুস্থানী মজুরের গোঁফ সমান করে ছাঁটার জন্যে একজন সেলুনবয় রীতিমতো পরিশ্রম করছে। চুলছাটা ও দাড়ি কামানোর মধ্যে যে সূক্ষ্ম আর্ট আছে—যা আমাদের চোখে বড় একটা ধরা পড়ে না—সে সম্পর্কে এরা সচেতন। সেখানে এদের ফাঁকি নেই। এরা যেভাবে চিবুকটা তুলে ধরে, যেভাবে ঘাড়টা নামায় তাতে এদের অজ্ঞাতেই এমন একটা ব্যাপার প্রকাশ পায়—যা-ও প্রেমিক-প্রেমিকার ক্ষেত্রেই সম্ভব। আসলে এটিও এদের এফিশিয়েন্সিরই একটা অঙ্গ। নিছক অভ্যাসও বলা চলে। তবু নিশানাথ প্রত্যেকবার বিস্ময়ের সঙ্গে তা উপলব্ধি না করে পারে না। কিংবা বলা যায়, চেয়ারে উপবিষ্ট কোনো শক্তির প্রতিই এদের পারতপক্ষে বিশেষ মনোযোগ না থাকার ফলেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। দাঁতের ডাক্তারের কাছে সমস্ত দাঁতই যেমন সমান, পরামাণিকের কাছেও সমস্ত মাথা আর গাল সে কারণেই অভিন্ন। এদিক দিয়ে বিশ্বের প্রতিটি সেলুনকে প্রকাশ্য, আইনসম্মত ও এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ গণিকালয় বলা যেতে পারে।

তারপর ছোকরা গলায় বাঁধা টাওয়েলটা খুলল। ডেটল দিয়ে মুখটা পুঁছে

দিল। তার ওপর ক্রিম লাগিয়ে আঙুল দিয়ে গালে বিলি কাটতে লাগল। নিশানাথ আয়নায় তার সগুকামানো মুখটার ওপর কটি পরুষ আঙুলের চঞ্চল চলাফেরার দিকে শুদ্ধ তাকিয়ে রইল। আশ্চর্য ছবি। যে মুখটা আমার, অথচ আমার মনে হচ্ছে না—তার ওপর শুধু কটি আঙুল—পরুষ, শিরওঠা আঙুল চঞ্চলভাবে ঘুরছে। ইচ্ছে করলে আমি আমার গলা, কাঁধ, চেয়ারের পিঠ, পেছনের রঙচটা দেওয়াল আর ক্যালেণ্ডারটি বাদ দিতে পারি। কিন্তু দেয়ালে একটা কালো ঝুল শুঁড়ের মতো বেঁকে সমস্ত ব্যাপারটাকে আলাদা চরিত্র দিয়েছে। অতএব দেওয়াল থাক।

সুতরাং, এইভাবে নেওয়া যায়—একটা মামুলি দেওয়াল, একটি মাত্র ঝুল কিভাবে উড়ে এসে হাতির মতো শুঁড় তুলে দেওয়ালের গায়ে লেপ্টে আছে। তার সামনে একটি সগুকামানো মুখ—না কোনো ব্যক্তির, অথচ কারোরই নয়। তার ওপর কটা আঙুল।

নিশানাথ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। কে যেন আবার কানের কাছে বলেছে, বাত্রি।

দুই

বাসের জন্য অন্যমনস্ক দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করল জনৈক ভিখিরি অপেক্ষমান যাত্রীদের কাছে ভিক্ষে চেয়ে বারংবার প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে আর ধাপে ধাপে নিজের চোখ-মুখ-গলায় আপন দৈন্য ও অসহায়ত্বের অভিব্যক্তি বাড়াতে বাড়াতে শেষে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেচে যেখানে লোকটার সঙ্গে আলমগীরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসা সাজাহানের বা ক্রুশবিদ্ধ যিশুর বা পোড়া-আঙুল ভানগথের কোনো তফাৎ থাকে নি।

নিশানাথ মুগ্ধ হলো। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে খুচরো পয়সার ভীড় থেকে তর্জনীর ছোঁয়ায় একটা পাঁচ নয়া পয়সা বের করল। ভিখিরির চোখের সামনে গাদাখানেক খুচরো নেড়েচেড়ে সব থেকে কম দামী মুদ্রাটি লোকে কিভাবে ভিক্ষে দেয় সে বোঝে না। এ ব্যাপারে নিশানাথ সঙ্গতিতে মধ্যবিত্ত কিন্তু রুচিতে পুরোদস্তুর অভিজাত। অভিপ্রেত মুদ্রাটি খুঁজে এমনভাবে বার করে দেয়, যাতে ভিখিরি না ভেবে পারে না হাতে যা এলো ভদ্রলোকটি তাই তাকে দিয়েছে। দানার্থে সে প্রস্তুত হয়েছে এমন সময় একটু দূরে আর একটি বাস এসে দাঁড়াল আর ভিখিরিটা দৌড়ে সেদিকে

গেল, যেন ওখানে যারা নামবে তাদের জন্যই সে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল।

কিন্তু দেখেছ? লোকটা আমার কাছে ভিক্ষে চাইল না। দাড়ি কামাই নি বলে কি—অভ্যাসে নিশানাথ গালে হাত দিয়ে বুঝল একটু আগেই সে সেলুন থেকে বেরিয়েছে। তাহলে কি আমার চোখে মুখে, আমার পোশাকে, আহ্, চাইল না, হুঁ, ছেলেটাও আমাকে ঠিকানা··নিশানাথ অতিশয় ক্রুদ্ধ হলো। নিশানাথ ভীত হলো। তারপর বাসে উঠে কতকটা মরিয়ার মতো একটি লোকের পা মাড়িয়ে দিল। মনে মনে যখন কিছু গালমন্দ শুনবার ও তার উত্তরে (যথা, ট্যাক্সিতে গেলেই পারেন; উঁহু, মেজাজ দেখালেই বুঝি, না, স্ট্রেট বল, বেশ করেছি মশাই, ইত্যাদি) বলার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হচ্ছে তখন সেই লোকটিকে বলতে শুনল, 'সরি'। নিশানাথ বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল ভদ্রলোকের দুটি-চোখই অমাবস্যা-রাতের মেঘার্ত আকাশ।

নিশানাথ যেন নিজের ঘাতককে দেখল, কি এক অনির্দিষ্ট আতঙ্কের তাড়নায় তার চোয়াল শক্ত হলো। বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে সামনের সিটে বসা একটি যুবকের কাঁধে খোঁচা মেরে প্রায় ধমকের সুরে সে বলল, এঁকে একটু বসতে দিন না মশাই। আপনি তো ইয়ংম্যান।

শেষ শব্দটা সেই অবস্থায়ও খচ্-করে কানে লাগল। নিশানাথ ভুল-প্রয়োগের লজ্জায় আমতা আমতা করে বলল, মানে আপনি তো একজন যুবা, অর্থাৎ কিনা যুবক।

যুবকটি নিশানাথের মারমুখী ভঙ্গিতে হঠাৎ থমকে গেছিল। তাকে তোতলাতে দেখে পলকে উত্তেজনা ফিরে পেয়ে বলল, এটা কি লেডিজ সীট মশাই, এ্যাঁ? না উনি মেয়েছেলে যে উঠে দাঁড়াতে হবে?

নিশানাথ পরিষ্কার বুঝল, যুবকটি ঠিক এই কথাগুলি বলতে চায় নি। আসলে সে হয়তো অন্ধ লোকটিকে দেখে নি। হয়তো দেখলেও মনে মনে ভেবেছে, নিজের জায়গায় ওকে বসতে দেওয়া উচিত। তারপর নাগরিকতাবোধ গোছের ভারী ভারী ব্যাপারগুলি নিয়ে চিন্তা করতে করতে লোকটির অস্তিত্ব ভুলে গেছে। কিংবা হয়তো তার মনে সাংসারিক বৃত্তিটা হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কেউ যখন ছাড়ল না, যখন ছাড়ে না, তখন আমারই বা এত মাথাব্যথা কেন ইত্যাকার ভেবে হয়তো নিজেকে সে সান্ত্বনা দিয়েছে। নিশানাথ নিশ্চিত জানে ভালো

ভাবে বললে যুবকটি এককথায় জায়গা ছেড়ে দিত। কিন্তু সে যেভাবে খোঁচা মেরেছে, যে স্বরে আদেশ করেছে, তারপর উত্তেজনা স্বাভাবিক।

কিন্তু দেখেছ, ছেলেটা আমাকে কি রকম ভুল বুঝল। 'ইয়ংম্যান' বলে যে আমি লজ্জা পেয়েছি তা-ও বুঝল না। আমি যদি পরে কোনো দ্বিধা প্রকাশ না করতাম, যদি গলায় আদেশের ভঙ্গিটা বজায় রাখতাম, তাহলে ছোকরা (না না, যুবক) নিশ্চয়ই আসন ছেড়ে না উঠে পারত না। আমাকে কুণ্ঠিত দেখে ভাবল হঠাৎ উত্তেজনা প্রকাশ করে আমি নিজেই ভয় পেয়েছি। হয়তো ওর চওড়া শরীরটাকে ভয় পেয়েছি। তাই রেগে উঠতে পারল। নিশানাথ যুবকটির রুচিহীনতায় মমতা বোধ করল।

কিন্তু ততক্ষণ যুবকটির উত্তর বাসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। একজন ভদ্রলোক নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সেই অন্ধ লোকটিকে সেখানে বসার জন্য অনুরোধ করছে। সে অসহায়ের মতো বলছে, 'না না, ঠিক আছে। মানে আমার কোনো অসুবিধে মানে রোজই তো যেতে হয়।' তার কথার মধ্যেই একজন তাকে বলছে বসুন না দাদু। আপনি অন্ধ মানুষ, চোখে দেখেন না।' আর লোকটি যেন ক্রমশ কুঁকড়ে যাচ্ছে। সে তার দৃষ্টিহীন চোখ দুটি দিয়ে, সে তার সর্বশরীরের ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে, সে তার যাবতীয় অনুভব দিয়ে পলকে বুঝেছে বাসের তাবৎ যাত্রী এখন, এই মুহূর্তে, তাকেই দেখছে, তার অন্ধতাকে দেখছে।

নিশানাথ স্তম্ভিত। এই যে লোকগুলি, মানে এই যে লোকগুলো এঁরা একজন অন্ধকে বলছেন, আপনি অন্ধ, অতএব বসুন, আপনি অন্ধ দাঁড়িয়ে যেতে অসুবিধে, অতএব আমি দাঁড়িয়ে আপনাকে বসার জায়গা দিচ্ছি। অর্থাৎ এখানে মানুষটির অস্তিত্ব তুচ্ছ, প্রায় নেই, সকলেই যা দেখছে, যা স্বীকার করছে—তা হলো লোকটির দৃষ্টিহীনতা। মানুষটার স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য-প্রস্থের শরীরে অতি সামান্য অংশ নিয়ে আছে ভুরুর তলায় দুটি কোটরে মৃত একজোড়া চোখের যে মণি—দেখ, কিভাবে তা পলকে এতবড় একটা অবয়বকে মিথ্যা করে দিল। কিভাবে অনস্তিত্ব অস্তিত্বকে গ্রাস করে। আসলে, মানুষ কি আমার অপরাধবোধের তাড়ায় বা নেহাৎ অন্যমনস্কতার কারণে বা অন্য প্রসঙ্গ অবতারণার ইচ্ছেয় হঠাৎ পরোপকারী বনে যায়? আর মানুষ কি পরোপকার, দয়া, সেবা ইত্যাকার গুরুগম্ভীর ব্যাপারগুলি মারফৎ অন্য মানুষকে লাঞ্ছনা, দীনতা স্বীকারে বাধ্য করে একাধারে নিজের গরিমা, নিজের হীনমন্যতাবোধেরই পরিচয় দেয় না? অন্ধ

ভদ্রলোকটি একটুখানি বসতে পাওয়ার বিনিময়ে সকলেব মনোযোগের কাবণ হওয়াব থেকে দুর্ঘটনায় হাসপাতালে দুখানা পা খোয়ালে কি এখনকাব থেকে বেশি দুঃখিত হতেন ?

কি মশাই ঠিক কিনা ? একজন নিশানাথকে প্রশ্ন কবল। ইতিমধ্যে বাসে যে পারস্পরিক মন্তব্যাদিব নানা স্রোত-উপস্রোত বয়ে গেছে, নিশানাথ তাব অধিকাংশই শোনে নি। সুতরাং প্রশ্নটা ধবতে পাবল না। তাই এমনভাবে মাথা নাড়ল, আর মুখে এমন একটা হাসি ফোটাল যার কোনো অর্থ নেই। তাবপর নিশানাথ বাসেব পরিবেশে ফিবে এসে লক্ষ্য কবল একজন বুড়োমতো ভদ্রলোক সেই যুবকটিকে বলছেন, ছি, ছি, আপনি একজন ইয়ংম্যান, এটুকু স্পিরিট নেই আপনাব, আবাব আইন দেখাচ্ছেন ? একজন বৃদ্ধ বললেন, আজকালকাব ইয়ংম্যান মশাই, এঁবা যখন আইন মানেন না, তখন তার পেছনেও আইন দেখান। আর হবে নাইবা কেন ? গোটা দেশখানা একবার তাকিয়ে দেখুন। বেরুবাড়ি দিতে হবে ? আইন নেই ? কেন আইন পাল্টাবার আইন আছে, পাল্টাও আইন, দাও বেরুবাড়ি। এমন দেশের ছেলেরা মশাই অন্ধ, খোঁড়া, বৃদ্ধ, লেডিজ—এঁদের কখনো সম্মান দিতে পাবে ? এই না হলে স্বাধীনতা ? একজন যুবক বললে, 'যা বলেছেন। দেখুন স্টেটবাস হাতে নিয়ে আমাদেব কি দুর্ভোগ। যদ্দিন পাঞ্জাবীবা ছিল, একটি ছোকরা বৃদ্ধটিকে বলল 'এ আপনাব অন্যায় দাদু। একজনের জন্য গোটা জাত তুলে গালাগালি। এই জন্যই তো বাঙালীর—। কেন, আমাদের ছেলেবাই এই সেদিন নন্দাঘুন্টি ঘুবে এলো না, আমাদেব…' বুড়ো লোকটি বাধা দিয়ে বললেন, 'আয়ে বাখ তোমার নন্দাঘুন্টি। আজকালকাব কাগজগুলোও হয়েছে তেমনি। হুজুক পেলেই কথা নেই। আজ নন্দাঘুন্টি, কাল টেস্টম্যাচ, পরশু চীন, তরশু বাণী। আর মাঝে মাঝে এই নিয়ে হৈ চৈ—নেতাজী কি জীবিত ?' ভদ্রলোক জ আর ছ-এর উচ্চারণে অবজ্ঞা ফুটিয়ে তুললেন। ছোকরাটি উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কেন, হুজুগ হবে কেন ? আপনি বললেই হবে ? ভাবী বোঝেন আপনি ?' ছেলেটিও তার 'ঝ'-এর উচ্চাবণে সমভাবে অবজ্ঞা প্রকাশে পাবদর্শিতা দেখাল।

নিশানাথের বমি এলো। যে কোনো সুযোগে রুচিহীন, দায়িত্বহীন কিছু বাণী উদ্‌গার করার কি অস্বাভাবিক প্রবণতা। তাছাড়া প্রত্যেকে যেন সব সময় একটা প্রতিপক্ষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভাষায়, ভঙ্গিতে অন্যকে

অপমান করার কি অনুপম কৌশল। আহ্, মধ্যবিত্ততা। নিশানাথ ভাবল, একটা বক্তৃতা দেয়। তারপরেই মনে হলো, কি লাভ? তাছাড়া যদি সকলেই হেসে ওঠে। এই তো কাল না পরশু, না, আরও আগে কবে যেন চীনেবাদামঅলাটা কিভাবে হেসে উঠে অপমান করল।

অতঃপর নিশানাথ সেই কবেকার সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া একটা মামুলি চীনেবাদামঅলার জন্যে বক্তে আক্রোশ বোধ করল। একটা অস্থিরতা। সেদিন রাগে হতবাক হয়ে খানিক দূর চলে আসার পর হঠাৎ মনে হয়েছিল আবার ফিরে গিয়ে লোকটাকে বলে 'কি হয়েছে তাতে? মহাভারত কি অশুদ্ধ হয়ে গেছে?' তারপর আরো খানিকদূর গিয়ে ভেবেছিল ফিরে শুধু বলবে 'মহাভারত তো দেখছি শুদ্ধই রয়েছে', তারপর লোকটা হাঁ করে যখন কথার মানে বোঝাবার চেষ্টা করবে তখন দিগ্বিজয়ীর মতো ফিরে আসবে। তারপর আরো খানিকদূর হেঁটে ভেবেছিল 'দেখছি' শব্দটা সমস্ত বাক্যকে এলিয়ে দিচ্ছে। শুধু বলবে 'মহাভারত তো শুদ্ধই রয়েছে'। কিন্তু ফিরে গিয়ে বলা আর হয় নি।

নিশানাথ উঠে দাঁড়াল। এমন একটা চোখা ডায়াল্গ, অথচ প্রয়োগ করা গেল না। কাকে বলব? এই অর্বাচীনদের বলেই বা লাভ কি? শব্দ যে ব্রহ্ম, আদিতে শব্দই যে ছিল ঈশ্বর—কে তা মনে রেখেছে? মানুষ জেনেছিল আপন ভাবনার সত্য আর সুচারু প্রকাশই হল ঈশ্বরত্ব। জেনেছিল প্রকাশেই ঈশ্বর। তাই তাদের প্রতিটি বাক্যে ছিল দেবত্ব।

নিশানাথের গায়ে কাঁটা দিল। সে যেন কানে সমুদ্রের গর্জন শুনল, শঙ্খের ফুৎকার শুনল, গীর্জার ঘণ্টা শুনল, তানপুরার সুর আর নূপুরের নিক্কন শুনল। নিশানাথ শুনল আদি মানুষ উচ্চারণ করছে 'মা'। নিশানাথ শুনল 'ভালোবাসি'। নিশানাথ শুনল 'জন্ম-মৃত্যু-দহন-যন্ত্রণা'। হায় একটি শব্দ একটি কাব্য। আস্তে আস্তে মানুষ শব্দের ব্যঞ্জনা ভুলে গেল। তাই তাকে অন্য ঈশ্বর খুঁজতে হলো।

সেই পুরনো ক্ষোভটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বড় দেরিতে জন্মেছি। এমন কোনো মহৎ শব্দ নেই, যা আমি প্রথম উচ্চারণ করব। ব্যবহারে ব্যবহারে শব্দ আজ কথা, বাক্য আজ কথা। কথা আমার ভালো লাগে না। কথা বড় হালকা, সমুদ্রের ফেনা যেন। শব্দ ছিল সমুদ্র, সমুদ্র কয়েক হাজার বছরে ফেনা ছাড়া কিছু রইল না। কয়েক হাজার বছরে সভ্যতা মানুষের হাতে অপবিত্রেয় গাঁজলা তুলে দিয়েছে।

নিশানাথ ভূতগ্রস্তের মতো নিচে নেমে যাচ্ছিল। হঠাৎ একতলার দরজার কাছ থেকে সিঁড়িতে একটা হাত এগিয়ে কণ্ডাক্টর বললে, 'টিকিট'?

নিশানাথ চমকে বুক পকেটে হাত দিল, পাশ পকেটে দিল, তারপর বুঝল কাটা হয় নি। পয়সা বার করে দিতে দিতে হঠাৎ সে বলে বসল, কাটি নি দেখছি, কিন্তু মহাভারত তো শুদ্ধই রয়েছে।'

কণ্ডাক্টর ব্যস্ত গলায় বলল, 'কি বললেন? কোথ্ থেকে?'

নিশানাথের তাবৎ আনন্দ পলকে অন্তর্হিত হলো। অত্যন্ত অপমানিতের মতো মুখ করে বলল, 'চোদ্দ।'

দোতলায় তখনো তর্ক চলছে। 'আরে রেখে দিন, আপনাদের মশাই চেনা আছে। ফরটি-টুতে।' হা হা করে হাসি, 'মশাই এতে আর চিঁড়ে ভিজবে না। নতুন কিছু বলুন।' আরে বাব', 'সার কথা বুঝে নিয়েছি। এভাবে চলে না। তবে এভাবেই চলবে।'

নিশানাথ হো হো করে হেসে ফেলল। কণ্ঠস্বরে মুখগুলো মনে করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ক্ষণপূর্বে দেখা কোনো মুখই তার স্মরণে এলো না। সে যেন বিনয়বাবু, হরিশ, মনো—এদেরকেই দেখল।

'কি হলো?' কণ্ডাক্টর একা একা হাসতে দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল। আর দরজার পাশে লেডিজ সীটে বসা গুটিকয় মেয়ে সময়োপযোগী দৃষ্টিতে তাকাল। নিশানাথ পলকে শামুক হয়ে বলল, 'ওপরে একটা মাতাল, একটা নয়, কয়েকটা...'

কণ্ডাক্টর হেসে বলল 'রোজ লেগে আছে। সেই থেকে শুনছি।'

নিশানাথ শুকনো মুখে বলল, 'হুঁ।'

আমি বললাম, বিশ্বাস করল। যদি বলতাম ওপরে একটা সৎ ব্যাপার হচ্ছে, তাহলে কি এভাবে মেনে নিত? মানুষ কি স্বভাবত বিশ্বাস-প্রবণ, না এ এক ধরনের কেচ্ছাবিলাস? নাকি কণ্ডাক্টর তার প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ছকে আমার বিবরণ মিলিয়ে নিতে পারল বলেই তার মনে কোনো সংশয় নেই?

নিশানাথ বিরক্ত হয়ে বলল, 'বাঁধুন।'

স্টপে বাস দাঁড়াল। নিশানাথ হ্যাণ্ডেল ধরে নামছে, একটা পা মাটিতে, এমন সময় তার চোখ ছবি দেখল। ফুটবোর্ডের ওপরকার কাঁচের বেড়া দিয়ে একতলার বাঁ দিকটা দেখা যায়। দরজার পাশে আড়াআড়ি ভাবে

টানা লেডিজ সীট। তারপর সারি সারি দুজনের সীট এঞ্জিনের দিকে মুখ করা। সবশেষে আর একটা টানা সীট, দরজার দিকে চোখ। কাঁচটা মলিন, জায়গায় জায়গায় ছোপ ধরেছে। আর ঠিক মধ্যিখানে বোধহয় কোনোদিন ঢিল পড়েছিল, একটা বিন্দুর চারদিকে অজস্র সরু সরু রেখায় খানিকটা ফেটে আছে। ফাটার চিহ্নগুলি ফুলের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বাসের আলো সেই সূক্ষ্ম রেখাগুলির ওপর পড়ে কেঁপে ভেঙে যাওয়ায় কাঁচটা যেন বালুকণার মতো মসৃণ আলোর গুঁড়োয় জ্বলছে। আর সেই আলোর ফুলের মধ্য দিয়ে লেডিজ সীটে বসা একটি মেয়ের মুখ, মুখের আভাস, তার পাশে আরো গুটি দুই রমণীর আদল, জোড়া সীটে পরপর এক জোড়া মাথা; মাথাগুলি ছাড়িয়ে শেষ সারিতে কতগুলো পুরুষের মুখ, তাদের পিঠে বাসের দেওয়াল, দেওয়ালে কি যেন কি লেখা আর তারের জাল, জালের পেছনে এঞ্জিন, ড্রাইভারের পিঠ। আবছা ফাটা কাঁচের ভেতর দিয়ে নিশানাথ এক জগৎ দেখতে পেল—একটা জগৎ, কিছু কিছু আভাস, অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, অথচ আলোর গুঁড়োয় জ্বলছে। আর ভাঙা রেখাগুলির কারণে সমগ্র ছবিটি অজস্র ডায়ামেনসনে সত্যিই এক চরিত্র পেয়েছে।

কি মশাই, কি হলো?

নিশানাথ কণ্ডাক্টরের বিরক্ত ধমকানিতে লজ্জিত হয়ে দ্রুত বাসে উঠে পড়ল। বলল, ইয়ে, নেক্সট···

কণ্ডাক্টর বলল, ঝুলতে ঝুলতে কি ধ্যান হচ্ছিল? আচ্ছা জ্বালা।

নিশানাথ ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে কাঁচের ভেতর দিয়ে পূর্বদৃশ্য দেখার চেষ্টা করছিল। কণ্ডাক্টর বলল, উঠে আসুন মশাই। এই যে এখান থেকেও দেখা যায়। আবার য্যাকসিডেন্ট করলে তো আমাদের প্রাণ নিয়ে—

নিশানাথ বাধ্য চাকরের মতো কণ্ডাক্টরের নির্দেশে সিঁড়ির তলা আর একতলার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আর সেই মেয়েটিকে দেখল। ইস্ কি কুচ্ছিত। তার গা গুলিয়ে উঠল। কোথায় যেন একে দেখেছি? আর কণ্ডাক্টরটা এখানে দাঁড়াতে বলল কেন? কি যেন বলল? এখান থেকেও দেখা যায়। কি দেখা যায়? কি দেখতে চাই আমি? কি দেখছিলাম ও ভেবেছে? নিশানাথের সমস্ত রক্ত ঠাণ্ডা হলো। আমাকে কি ভাবল এই মেয়েটার মুখ দেখে আমি নামতে গিয়েও ফিরে এলাম? আঃ, এখান থেকে সমস্ত বাসের ভেতরটা কি স্পষ্ট, কি রূঢ় দেখায়।

মধ্যিখানে সরু প্যাসেজ। দু-ধারে সারি সারি আসন। কতগুলো পুরুষ আর মেয়েমানুষ কোথা থেকে যেন কোথায় যাচ্ছে। ভীড় নেই, তাই আরো অশ্লীল মনে হচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড খাঁচার মতো, খাঁচায় সমস্ত আয়োজন আছে, পাখি নেই। মেয়েটি মাঝে মাঝে আমায় দেখছে কেন? ওহ্, মনে পড়েছে। একটু আগে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে যখন কণ্ডাক্টরের সঙ্গে···অথচ তখন তো একে দেখে আমার দ্বিতীয়বার তাকাবার, আসলে মেয়েটা কি হঠাৎ নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতন হয়ে উঠল? বিরক্তি না আত্মতৃপ্তি? আমার কারণে? মূর্খে রমণী, তুমি কি জানো না, হায় কোনো রমণী শরীর, কোনো রমণী আমায়, হায়, এ পরবাসে রবে কে, এ পরবাস, কণ্ডাক্টর, তুমি যথার্থই একটি শূকরীর সন্তান, নইলে আমাকে একথা বলবে কেন? কি দেখছিলাম, কি দেখতে চাই কেমন করে বুঝবে? কেউ বোঝে না। সেই চীনেবাদামঅলাটা তাইতো আমাকে, দাড়ি কামালাম—তবু, অথচ মহাভারত তো শুদ্ধই রয়েছে।

নিশানাথ সেই ররেকার সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া একটা মামুলি চিনেবাদাম-অলার জন্য যারপরনাই আক্রোশ বোধ করল। অথচ তাকে আর কোনো দিন দেখবে না। কোনোদিন উত্তর দেওয়া হবে না। কতকাল এই দহন ভোগ করব জানি না। আবার করে কি প্রসঙ্গে এই জ্বালা আপাদমস্তক, আপাদমস্তক এই জ্বালা, নাই রস নাই—দারুণ দহন বেলা।

নিশানাথ অজ্ঞাতে গুনগুন করে গান গেয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝল কণ্ডাক্টরের অপমানটা ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। তাই সেটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে দূরের অন্য এক অপমানবোধ প্রসঙ্গে হঠাৎ সে নিজেকে তপ্ত করেছিল। অথচ বাসের এই মধ্যবিত্ততা এবং ভদ্র শ্রমিক শ্রেণীর জনৈক প্রতিভূ এই কণ্ডাক্টর ও সর্বহারা শ্রেণীর নিদর্শন কোনো এক বুড়ো বাদামঅলার কাছ থেকে প্রায় অকারণে লব্ধ অপমানবোধ যখন তার স্নায়ুকে উত্যক্ত করেছে তখন একেবারে হঠাৎ এই গানটা এলো কিভাবে? ও, বুঝতে পেরেছি। জ্বালার সঙ্গে বেলার একটা ধ্বনিসাদৃশ্য আছে। আর দহন শব্দটি আমাকে সেই মরীচিকা জালে বেঁধে ফেলল। কিন্তু একটু আগে আরও কি একটা গান যেন ভেবেছিলাম? কি যেন, হায়, তারপর... আসলে আমি জানি এও এক ধরনের এস্কেপ। কাঁচের পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ যে ছবি দেখেছিলাম আর এইখানে দাঁড়িয়ে যে কুৎসিৎ মহিলাটি, অবশ্য ঠিক কুৎসিৎ নয়—সুন্দরই বলতে হয়, তথাপি আমার

কাছে যাকে অত্যন্ত মামুলি একটা মেয়েছেলে বলে মনে হলো—আর বাসের এই ভেতরটা—একটা বৃহৎ শূন্য খাঁচা ইত্যাদি যা দেখতে হচ্ছে, তার থেকে পলায়নের কি সুন্দর উপায় এই গান। এই রবীন্দ্রসঙ্গীত। রবীন্দ্র ঠাকুর প্রণীত, রবিবাবু রচিত। আহ, রবীন্দ্রনাথ।

নিশানাথের কাছে ক্ষণপূর্বের যাবতীয় চাঞ্চল্য অত্যন্ত তুচ্ছ হলো। রবীন্দ্রনাথের নামে নয়, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতেও নয়, বস্তুত কোনো কারণেই ছিল না। খানিকটা বিমূঢের মতো সে লক্ষ্য করল এই এখন আর কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না। পরের স্টপে নিশানাথ নেমে পড়ল।

আর সেই মেয়েটিও নামল। জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে বাস চলতে শুরু করল, কণ্ডাক্টরটা হ্যাণ্ডেল ধরে পেছন দিকে ঝুঁকে কিছুক্ষণ তাদের দেখল। নিশানাথ তার মুখে স্পষ্ট হাসি লক্ষ্য করল। মনে হলো একতলা আর দোতলার জানলায়ও কিছু মুখ তাদের দেখছে। নিশানাথ অস্বস্তি বোধ করল। ওরা ভেবেছে মেয়েটি তার সঙ্গী। কিন্তু কণ্ডাক্টরটা? হঠাৎ নিশানাথ যার মুখের দিকে একবারও ভালো করে তাকায় নি, সেই কণ্ডাক্টরটির চেহারা, পোশাক স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেল। ব্যাগের লম্বা পটিটা এমন কোণাকুনিভাবে বুকের ওপর ঝোলানো যে পাশ থেকে দেখলে পুলিশ-সার্জেন্ট বলে হলেও হতে পারে।

নিশানাথের পা ছমছম করতে লাগল। হঠাৎ ছবিটা চোখে পড়ায় এক স্টপ এগিয়ে এলাম কেন? ভদ্রমহিলাই বা এখানে নামলেন কেন? আসলে সমস্তটাই কি আমার অজ্ঞাত, অচেতন ইচ্ছাশক্তির ফল? কিন্তু এখন, কিন্তু আমি কণ্ডাক্টরটা কি সবই বুঝেছিল?

মেয়েটি বাস থেকে নেমে আঁচলটা গুছিয়ে নিল। ঝুঁকে জুতোর বকলস্ ঠিক করল। আঁচলটা খসে রাস্তায় পড়ছিল। তাড়াতাড়ি বাঁ-হাত দিয়ে বুকের কাছটা চেপে ধরল। আর নিশানাথ পুনরায় একটি ছবি দেখল। ট্রাম নেই, বাস নেই, গাড়ি নেই, লোক নেই। সামনের বিশাল বাড়িগুলি তার চোখে ধরা পড়ছে না। সে শুধু একটি প্রণত রমণী-শরীরের পেছনে দাঁড়িয়ে। আর রাস্তা পেরিয়ে, ফুটপাত ডিঙিয়ে যে বিশাল হলুদ বাড়িটা—তার মাথায় নিওন আলোয় কোন এক হাওয়াই জাহাজ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন জ্বলছে। কয়েক পলকের ব্যবধানে লাল, সবুজ, নীল আলো জলধারার মতো কিভাবে চকচকে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ছে। নিশানাথ রঙের সমুদ্রে একটি নারীকে প্রণত দেখল।

তারপর মেয়েটি উঠল। আর একবার আঁচলটা টেনেটুনে ঠিক করল। একবার ঘাড় ফিরিয়ে স্পষ্ট নিশানাথের দিকে তাকাল। মেয়েটি কি বেশ্যা? কিন্তু এমন নিষ্পাপ, ইনোসেণ্ট মুখ তাহলে সম্ভব হত না। মেয়েটার শরীর অতিশয় সুন্দর। কিন্তু ওর চোখ বলছে সে সম্পর্কে মেয়েটি কিছুই জানে না। ক্ষণপূর্বে বক্ষের আঁচলটা কি রকম অবলীলায় চেপে ধরেছিল, যেন একটি প্রেমিক তার রমণীর বক্ষ স্পর্শ করছে। কিন্তু মেয়েটি এখানে নেমে কোথায় যাবে?

প্রায় পাশাপাশি তারা রাস্তা পার হলো। তারপর মেয়েটি আগে আগে যাচ্ছে। একটু পেছনে নিশানাথ। যাদুঘরের গায়ের রাস্তা সোজা পুব দিকে গেছে। এই সন্ধেতেও কেমন অন্ধকার। নিশানাথ জানে কত সতর্কতায় এখানকার কিছু কিছু রাস্তায় অন্ধকার সংরক্ষিত হয়। মোড়ে কতগুলো রিক্সা দাঁড়িয়েছিল। তাঁদের দেখে ঠুনঠুন করে ঘণ্টা বাজাল। মেয়েটি একবারও পেছন ফিরছে না। নিশানাথ খানিক ব্যবধান রেখে হাঁটছে। একদিকে সে গোটা পরিস্থিতিসহ নিজেকে লক্ষ্য করছে, অন্যদিকে কি একটা অলৌকিক শক্তি যেন তাকে টেনে সেই অন্ধকার পথটায় ঢোকাচ্ছে।

তারপর চৌরঙ্গী পেছনে পড়ে রইল। শুধু অতিপ্রাকৃত জানোয়ারের দীর্ঘশ্বাসের মতো ধাবমান গাড়ির আওয়াজ ভেসে এলো। দু পাশে বাড়ি, ছায়া ছায়া বাড়ি। আলোগুলিও ছায়া ছায়া। অচেনা, কাঁপা, বিলম্বিত সুরে কে যেন শিষ দিয়ে উঠল। পাশ দিয়ে বোধহয় একটি যুবক দ্রুত সাইকেল চালিয়ে চলে গেল।

আর জুতোর শব্দ। কলকাতাটা মুছে গেছে। অনেকগুলো শতাব্দী মুছে গেল। নিশানাথ হাঁটছে। সামনে একটি মেয়ে। কোন্ অদৃশ্য আদেশে তাদের পায়ের শব্দ এমন এক হয়ে গেল। কি এক জেদে নিশানাথ থমকে দাঁড়াল। সে নিজের স্বাতন্ত্র্য রেখে পা ফেলবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটির পদশব্দ শুনল। ভেবেছিল মেয়েটিও কি থমকে দাঁড়াবে, একবার তাকাবে ঘাড় ফিরিয়ে? নিশানাথ জানে না। সে আবার হাঁটতে লাগল। তার অনিয়মিত পদক্ষেপ যেন পলকে কুৎসিৎ কোলাহল সৃষ্টি করল।

তখন নিশানাথ তার মধ্যে কামনাকে প্রত্যক্ষ করল। আমি তাহলে মরে যাই নি? অস্ফুটে নিজেকেই প্রশ্ন করল। এ কি বিস্ময়, আমার রক্তপ্রবাহে আসঙ্গলিপ্সা? অস্ফুটে নিজেকেই প্রশ্ন করল। মাঝে মাঝে কেন যে·····

চকিতে স্নয়নীর কথা মনে এলো। নিশানাথ শিউরে উঠল। স্নয়নীর মুখটা কিছুতেই মনে করতে পারছে না। থমকে দাঁড়াল। যেন একটি রেখায় সে মুখটি স্পষ্ট করতে চায়। অথচ সামনে এই রাত। হঠাৎ ছোট কপালে দুটি ভাঁজ তার মনে এলো। আর স্নয়নীকে সে চোখের সামনে দেখতে পেল।

নিশানাথ যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল। মেয়েটি অনেক দূরে। বাঁকের কাছে আলো জ্বলছিল। সে স্পষ্ট তাকে মোড় ফিরতে দেখল। মেয়েটিকে আমি কি ইচ্ছে করে হারিয়ে যেতে দিলাম? হঠাৎ কামনা বোধ করে আমি কি এই জগতটায় ফিরে এলাম, যা আমার কাছে অতীত স্মৃতির মতো ধূসর বা স্বপ্নে দেখা অস্পষ্ট কোনো ছবি—যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে আমি নিজেকে অপরিচিত আর সংশয়ী মনে করি অথচ যেখানে স্নয়নী আজও, আহ্, এই মেয়েটি আমাকে কেন, কেন এখানে নিয়ে এল। কেন আমার রক্তে আজও জীবনের সাড়া ওঠে। কেন এই লজ্জা। একটি বিমূঢ় উত্তেজনায় পা ফেলতে লাগল। সেই মোড়ে বাঁক নিল। আলো, কোলাহল। হারিয়ে গেল। কোথায় এসেছি? আস্তে আস্তে সে চিনতে পারল। রেকর্ডে গান বাজছে। মুসলিম হোটেল। আগে কিছু খেয়ে নেব? সে নিজের অজ্ঞাতে অবশেষে দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল। সামনে খানকয় ট্যাক্সি। অল্প দূরে কয়েকটি রিক্‌শা। উর্দিপরা দরোয়ানটা সেলাম করে দরজা খুলে ধরল। নিশানাথ মদের দোকানে ঢুকে পড়ল।

তিন

ভেতরে ঢুকতেই গন্ধ আর শব্দের একটা মিশ্র কোলাহল সমুদ্র-স্তম্ভের মতো তার চোখের সামনে ভেঙ্গে গেল। তারপর কয়েকটি প্রবাহ তীরের দিকে ছড়িয়ে যেতে যেতে একটি ঢেউ হয়ে নিশানাথের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। নিশানাথ মুগ্ধ শঙ্কায় তাকিয়ে রইল।

ঘরটি আকারে অবিকল স্বাস্থ্য-বইয়ের হৃৎপিণ্ডের ছবি। লোক চলাচলের পথ রেখে চারদিকে শিরা উপশিরার মতো ছড়ানো টেবিল, চেয়ার। নিশানাথ এখানে এলে মানুষ দেখে না, দেখতে পায় না। নিশানাথ স্পষ্ট অনুভব করে ত্বক ও প্রসাধনের নানা বৈপরীত্য সত্ত্বেও বিভিন্ন অবয়বে আসলে কিছু রক্ত দৌড়চ্ছে, নাচছে, নতুবা বুঁদ হয়ে জমে গেছে। নিশানাথ এখানে কিছু ধমনী দেখে, রক্ত দেখে। আর সেই অবিচ্ছিন্ন গুঞ্জন, ছিপি খোলার আওয়াজ, গেলাসের শব্দ, গান, পেছল মাটিতে শক্ত হিলের ছন্দিত

রব এবং সোডা ঢালার কুলকুল ধ্বনি—এই তাবৎ সূক্ষ্ম ও পরুষ শব্দের অবিমিশ্র কোলাহল যেন হৃদপিণ্ডটির নির্ভুল স্পন্দন।

সার?

নিশানাথ তাকাল। বিব্রতের মতো ভাবল, কি অর্ডার দেব?

সার, অর্ডার?

আমি মদ খাব কেন? নিশানাথ অবাক হয়ে ভাবল। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ওয়েটারটা ছাপা ওয়াইন চার্ট সামনে মেলে ধরল। জনৈকা সুন্দরীর আভাষিত নগ্ন শরীরের ওপর লাল-কালো অক্ষরে ছাপা দিশি-বিলিতি অজস্র পানীয়ের নাম। নিশানাথ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কৈফিয়তের সুরে মনে মনে বলল, এ আমাকে নভিশ ভেবেছে। আসলে আমি জানি না কেন মদ খাব, ও ধরে নিল মদ্যাদির নাম অথবা মূল্য জানা নেই বলেই ইতস্তত করছি। নিশানাথ যারপরনাই অপমান বোধ করল। সে মুখ না তুলেও ওয়েটারটার চোখে হাসি দেখতে পেল এবং বিরক্ত হয়ে উদাসীনের মতো বলল, 'থ্রি এক্স, নীট।' ওয়েটার শুনেই চলে গেল। নিশানাথের অর্ডার বা আদেশের ভঙ্গিতে সে যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েছে বা তাকে অভিজ্ঞ বুঝে লজ্জা পেয়েছে এমন বোঝা গেল না। আর নিশানাথের মাথা ধরল।

মদ খেতে আমার, সবি, মদ্য পান করতে মোটে ভালো লাগে না, তবু গিলতে হচ্ছে। নিছক হুকুমের জন্য যে দাঁড়িয়ে, পানশালার চাকর যে, তার কাছেও অপটু মদ্যপ হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে কি অভিমান! খাঁটি মাতালরা রাম খায়, আমিও তাই খাব। রামের গন্ধ মৃত ছারপোকার মতো, গলা দিয়ে আগুন নামে। হুইস্কি তাও চলে। আসলে মদের গন্ধটাই আমার সহ্য হয় না। জীবনে প্রথম কফি খেয়ে যেমন হতাশ হয়েছিলাম, মদ্য পানে ততোধিক। মদের টেস্ট যদি সুন্দর হতো, গ্যালন গ্যালন খেতে কোনো আপত্তি ছিল না। মদ্যপানে আমি কোনো নৈতিক সমর্থন পাই নি। কারণ আমি কিছুতেই মধ্যবিত্ত হতে পারি নে। আনন্দ না বিষাদের আধিক্যে মদ গিলে দেবদাস হওয়ার কথা ভাবা যায় না। শরৎচন্দ্র বৃথাই লিখেছেন পান করে যে মাতাল হয় না, সে মিথ্যেবাদী নতুবা জল খায়। আসলে কমল, তুমি সাক্ষী, একবার পাঁচ পেগ রাম গিলে আমি কাহিল হয়েছিলাম। চোখ মেলে তাকাতে পারছিলাম না। পা দুটোকে পাখির ডানার মতো অবাস্তব মনে হচ্ছিল। আর শরীরের সমস্ত রক্ত এসে দুই

হাতের নখে জমা হয়েছিল আর কানে অবিশ্রাম অলৌকিক শব্দ। দাঁড়াতে গিয়ে টলে পড়ে গেলাম। পৃথিবীটা ঘুরতে লাগল। আর অকথ্য শারীরিক যন্ত্রণা হচ্ছিল। তবু, সেই অবস্থায় ভাবলাম—এই কি নেশা? কিন্তু মাতলামি করতে পারছি কই, বিস্মৃতি কই? আর নাগরদোলার সব থেকে দ্রুত মুহূর্তে যেমন কিছু দেখা যায় না, সমস্ত পৃথিবী ঘুরছে, ভয় করে, অথচ পরিষ্কার জানি দোলনার বাইরে সব স্থির—ঠিক তেমনই আমার মনে হলো। যদিও দোলনা থেকে ছিটকে পড়ে যাবার সেই ভয়টা ছিল না। কোনো ভয়ই না। আমার খুব বমি করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। আর নিজেকে বললাম, এতো হবেই। নিছক বৈজ্ঞানিক কারণ। আমার স্টমাক এতখানি লিকার কনজিউম করতে পারে না, তাই স্নায়ুগুলি আক্রান্ত হয়েছে। বস্তুটা বেরিয়ে গেলেই মোটামুটি ঠিক হবে। কিন্তু কমল, তোমার সামনে সেই অবস্থায়ও বমি করতে লজ্জা পেয়েছিলাম। আর তখনই বুঝেছিলাম মূর্খ ছাড়া কেউ মদ্যপান করে না। আসলে অতীশ, তুমি মিছেই উপদেশ দিচ্ছ। মদ কোন আশ্রয় নয়। হতে পারে না। শরীরের কনসটিটিউশনের ওপর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তার বেশি খেলে জৈবিক কারণে স্নায়ু তোমার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। কিন্তু কোনো মুহূর্তে চৈতন্য লোপ পায় না। হায় আমাদের আত্মসচেতনতা আর সভ্যতার অভিশাপ। মদ খেতে খেতে অজ্ঞান না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তুমি ভুলতে পার না যে তুমি নিশানাথ। নিশানাথবাবু, অতএব তোমার পক্ষে মদ খাওয়া কোনো ব্যাপারই নয়। অবশ্য পর্যাপ্ত খেলে তখুনি ঘুম পায়, অল্প খেলেও রাতে ভালো ঘুম হয়। শরীরটা কেমন শিথিল হয়ে আসে। কিন্তু এর থেকে দু আনা দামের সোনেরিল ট্যাবলেট তো কার্যকর, উপাদেয়। এই কারণে আমেরিকানরা নিত্যি-নতুন ঘুমের ওষুধ বার করছে। ওদের নেশা মদে না, মেয়েমানুষে নয়, ইনসমনিয়ার ওষুধে। 'আসলে বন্ধুগণ বিংশ শতাব্দীর মহত্তম ব্যাধি হলো নিদ্রাহীনতা ও অপরিমেয় চিন্তাশক্তি। ঘুম এর একমাত্র ওষুধ। মাত্র দু আনা। বন্ধুগণ, ভেবে দেখুন আপনারা। একদিকে একটি বা কয়েকটি ট্যাবলেট আর এক গ্লাস জল, বেশ, চাইলে দুধ দিয়েও খেতে পারেন। চা, কফি, মদ যা আপনার ইচ্ছে।

নিশানাথ যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল। যথারীতি সে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করেছে এবং কোনো এক জনসম্মিলনে বক্তৃতা। এমন সময়ে হঠাৎ মনে হলো এ জিনিসটা তো কখনো করা হয় নি।

মদ আর সোনেরিল ট্যাবলেট একসঙ্গে খেলে, আচ্ছা, আমি যখন সুইসাইড করব তখন যদি একসঙ্গে—

ঠকাস করে টেবিলে গেলাস রাখল। বড পেগে রাম ঢেলে পেগটা তারপর গেলাসের ওপর উপুড় করে দিল। ছিপি খুলে সোডার বোতল রাখল।

নিশানাথ তাড়াতাড়ি বলল, 'নীট খাব, সোডা কেন?' বলেই আবার অপ্রতিভ হলো। কারণ নিজেকে অভিজ্ঞ প্রমাণ করার জন্য আবার সে অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। প্রতি পেগের সঙ্গে সোডা এরা দিয়েই যাবে। খাওয়া না খাওয়া ইচ্ছে। আর মরমে মরে গিয়ে নিশানাথ লক্ষ্য করল ওয়েটারটা মৃদু হেসে বলছে, 'ঠিক হায সাব।'

নিশানাথ এক ঝটকায় গেলাসটা তুলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রায় আদ্দেক মদ গিলে ফেলে মুখ বিকৃত করল, যদিও জানত এটা এটিকেটের অঙ্গ নয়। তারপর হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁটটা মুছল।

বিষ খেলাম। খালি পেট, সোডা ছাড়া রাম। লিভার পুড়ে গেল, বুকটা এখনও জ্বলছে। হঠাৎ তার টেবিলে পাতা ওয়াইন চার্টটা চোখে পড়ল। আর লক্ষ্য করল মেয়েটির যোনিদেশের ওপর ছাপা মদের নামটাই থ্রি এক্স রাম। নিশানাথ হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। ওয়েটারটা কি ভাবল এইজন্যই আমি, নিশানাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো আর তার গেলাস ছুঁড়ে ভীষণ একটা মারামারি করার ইচ্ছে জাগল। তারপরই মনে পড়ল বসে আছে মদের দোকানে, লোকে ভাববে মাতাল। সুতরাং অলক্ষ্য ভ্রুকুটির শাসনে নিশানাথ অতঃপর নিজেকে গুটিয়ে নিল।

কি অভিশাপ। এই এতগুলো লোক এখানে বেলেল্লাপনা করছে, আমি মাতাল হতে পারব না কেন? কেন পারব না আমি মাতাল হতে? কেন আমি কিছুই পারি না? নিশানাথ অত্যন্ত আহত আর অসহায় একটা ভঙ্গিতে বাকি মদটা শেষ করল। সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটারটা সামনে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু আমি মদ খাচ্ছি কেন? নিশানাথ শিশুর মতো নিজেকেই প্রশ্ন করল।

সাব?

নিশানাথ ফস্ করে বলে ফেলল, থ্রি এক্স। বলেই ডাকল 'শোনো'। ওয়েটারটা ঘুরে দাঁড়াতে বলল, 'দাঁড়াও'। তারপর ওয়াইন চার্টের ওপর

ঝুঁকে পড়েই আবার সচেতন হয়ে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে বেপরোয়া আদেশ দিল, 'ঠিক হ্যায়, ওহি লাও'।

'ম্যাচিস?'

নিশানাথ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওয়াইন চার্টের সেই মেয়েটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গাঢ় নীল রঙের একটা ফিনফিনে শাড়ি কোনো রকমে কোমরে জড়িয়ে সম্পূর্ণ আঁচলটা ডানার মতো ছড়ানো বাঁ হাত উপচে বাইরে পড়েছে। যেন এইমাত্র কাঁধ থেকে খসে গেল। বুকে একটা ব্রেসিয়ার, তাতে স্থানে স্থানে কাঁচ বসানো। আর চুল, ঠোঁট, চোখ, নখ, প্রভৃতি নিতান্ত সময়োপযোগী।

নিশানাথ দেশলাইটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিল। তারপর চারমিনারের প্যাকেট থেকে শেষ সিগারেটটি বের করে ঠোঁটে গুঁজল। মেয়েটি নিজের মুখাগ্নি সেরে টেবিলের ওপাশ থেকে ঝুঁকে জলন্ত কাঠিটা নিশানাথের মুখের সামনে ধরল। আর টেবিলের ঝকঝকে হালকা-সবুজ কাঁচে একটা চকিত ছায়া পড়ল। আঙুর গুচ্ছের মতো থোলো থোলো চুল ঘাড় ডিঙিয়ে চিবুকের পাশে পড়েছে। উত্থিত দক্ষিণ হস্তের ক্ষুদ্র অগ্নিশলাটি স্থির। মেয়েটি আগ্রহে বঙ্কিম শরীরের ভঙ্গিটি যেন এক দীপাধার। নিশানাথ খুশি হয়ে চোখ তুলে তাকাল। আর সেই মেয়েমানুষটির শরীর দেখা গেল। থুতনির ডৌল, কণ্ঠার হাড়, আলোর সামনে ধরা সাদা কাগজের গায়ের আপাত অদৃশ্য নানাবিধ রেখার মতো সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট দাগের নক্সায় ভরা দুটি স্তন। ঝুঁকে থাকায় পেটের একটা পেশি সাপের মতো বেঁকে ছিল। আর পাঁজরার ঠিক তলায় যাকে কোমরের ঊর্ধ্বদেশ বলা যেতে পারে সেখানটায় কাপড়ের কষি বাঁধা এবং চর্বির কারণে কেমন যেন কালচে, স্থূল। নিশানাথ চোখ নামিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সৌজন্য সহকারে বলল মদ খাবে?

মেয়েটি ত্বরিতে আঁচল, চুল আর শরীরে জলধারাসম তীব্র এক মোচড় দিয়ে সামনে থেকে ঘুরে নিশানাথের পাশের চেয়ারটিতে বসল।

বুঝতে পেরেছি। নিশানাথের উদাসীন দুটি চোখ এই কথা বলল। ইংরেজ, য়্যাংলো, চীনে, জাপানী নানা জাতের মেয়েমানুষ হৃদপিণ্ডের নানাস্থানে চাক বেঁধে আছে। এ মেয়েটি বাঙালী। শাড়ির সংখ্যা এখানে কম। সঙ্গী পায়নি বলেই কি আগুনের আছিলায় এলো। কিন্তু একটা টেবিলে গুটি তিনেক য়্যাংলো মেয়েমানুষ গল্প করতে করতে এই যে অধৈর্যের মতো দরজার দিকে তাকাচ্ছে, ওদের কেউ এলো না কেন? এখানেও কি

জাত্যাভিমান ক্রিয়া করে? অবশ্য আমি ডাকলে, পয়সা দিলে, কিন্তু আমার চামড়ার জন্যে তার চোখে কি স্পষ্ট কৌতুক থাকবে না? এখানে যদি একটা নিগ্রো বেশ্যা থাকত, আমিই কি তার দিকে তাকাতে পারতাম? চারিপাশে অধিকাংশ সাহেব-সুবো। এই মেয়েমানুষটা যেভাবে আমার কাছে এলো, তেমন অনায়াসে একটি ইংরেজ যুবকের কাছে যেতে পারত কি? এই মেয়েমানুষটি কি আমাকে তার সমপর্যায়ভুক্ত মনে করার সাহসেই দেশলাই চাইতে পারল? নিশানাথ স্পষ্টত অপমান বোধ করল। অবশ্য কোন মেয়ে যদি তার টেবিলে না আসত, তাহলে সে নিশ্চিত আর এক জাতীয় হীনমন্যতায় পীড়িত হতো।

মেয়েটি টেবিলের মাঝখানে কনুই ঠেকিয়ে হাতের তেলোর ওপর মাথা রাখল। কলাপাতার মতো তার শরীরটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে রইল। পা নাচাতে নাচাতে মেয়েটি প্রশ্ন করল আপনি চারমিনার খান?

'হুঁ'। কিন্তু একে নিয়ে আমি কি করি?

কেন?

'উঁ'?

চারমিনার খেলে অসুখ হয়। মেয়েটি হাসল।

সর্বনাশ। মেয়েটির দাঁতগুলো কি বাঁধানো? নিশানাথ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'তাই নাকি?'

অতঃপর মেয়েটি স্পষ্টত নতুন প্রসঙ্গ অন্বেষণের ফাঁকে অনাবশ্যকভাবে ডান হাত দিয়ে বাঁ কাঁধের ওপর ব্রেসিয়ারের ফিতেটা একটু টানাটানি করল। পুট করে আওয়াজ হলো, অর্থাৎ একটা বোতাম ছিঁড়ল মেয়েটি। নিশানাথ অন্যমনস্কের মতো মেয়েটির মুখের ওপর একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। মেয়েটি খুকখুক করে কেশে উঠে ডান হাত দিয়ে সামনের ধোঁয়াটা নেড়ে চেড়ে দিয়ে নিজে একমুখ ধোঁয়া নিশানাথের মুখে ছাড়ল। আগের সেই বিলীয়মান অস্পষ্ট ধোঁয়া আর নতুন গাঢ় ধোঁয়া ঢেউয়ের মতো ভাসতে ভাসতে ক্রমশ এক হয়ে দুজনের মাঝখানে হালকা আর জটিল জালের সৃষ্টি করল। সেই জালের একটা আকৃতি ছিল। নিশানাথ এবং মেয়েটি জালের দু-দিক থেকে দুজনের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল।

সাব, অর্ডার?

ওয়েটারটার চোখে স্পষ্ট তাকাল, না, বিরক্তি বা প্রশংসা কিছু নেই। নিশানাথ হতাশ হয়ে বলল, কি খাবে?

মেয়েটি বেয়ারাকে বলল, লেমনস্কোয়াশ। তারপর নিশানাথকে বলল, মদ আমি খাই না।

নিশানাথ হেসে বলল, নতুন বুঝি? বলতে পেরে নিজের ওপর খুশি হলো।

মেয়েটি তাবৎ শরীরে প্রতিবাদের ভঙ্গী ফুটিয়ে বলল, আহ্লাদ? আমরা তিনপুরুষে প্রস্।

তাই নাকি? নিশানাথ অত্যন্ত বিরক্ত হয়েও মুখে চোখে সম্ভ্রম ফোটাল। তারপর বলল, তবে এখানে কেন?

মেয়েটি ভুরু তুলে বলল, সরকার আইন করে যে আমাদের মহল্লাই তুলে দিয়েছে। তাছাড়া ভদ্রবাবুরা তো আজকাল বেশ্যাপাড়ায় যেতে চায় না, বারে ঢোকে। আমরাও তাই—

ও।

মেয়েটি হাই তুলল, তুড়ি বাজাল। আড়চোখে একবার নিশানাথের দিকে তাকিয়ে লাজুক হেসে বলল, ঘুম পাচ্ছে।

নিশানাথ বলল, ঘুমিয়ে পড়ো।

এখানে?

ক্ষতি কি? কথা বলতে বলতে নিশানাথ মেয়েটির ব্রেসিয়ারের ওপর অন্যমনস্কের মতো সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। হঠাৎ যেন তার মনে হয়েছিল এই বন্ধুর শরীরাংশের উপত্যকাকে অনায়াসে অ্যাসট্রের বিকল্প ভাবা যায়। মেয়েটি তার হাতের চঞ্চলতা লক্ষ্য করে বলল, আপনার ঘুম পাচ্ছে না?

না। মাথা ধরেছে।

বাইরে যাবেন?

হুঁ।

ট্যাক্সিতে যাবেন, গঙ্গার ধার?

হুঁ।

পঁচিশ টাকা লাগবে কিন্তু।

কেন? নিশানাথ প্রশ্ন করেই এতক্ষণের সংলাপের তাৎপর্য বুঝতে পারল। অথচ মেয়েটি কিছুতেই তার বাঁ হাতটা নড়াবে না। মেয়েটি জানে না শারীরিক ক্লেশ সত্ত্বেও নিপুণ শিল্পীর মতো টেবিলের ওপর নিজের বাহু আর বক্ষের যে অর্ধ উন্মুক্ত কম্পোজিশান সে এতক্ষণ অটুট রেখেছে, আসলে তা আমার কাছে নিছক একটা ছাইদানির অনুষঙ্গ আনছে। আর

সেই সূক্ষ্ম দাগগুলিকে মনে হচ্ছে পোড়ামাটির মৃৎপাত্রের গায়ে অলঙ্কৃত রেখা।

আবার ঠকাশ করে গেলাস পড়ল। ছিপি খোলার শব্দ। নিশানাথ ওয়েটারের দিকে চেয়ে পলকে তার হারানো অভিমান ফিরে পেল এবং প্রবীণ লম্পটের মতো উদাসীন স্বরে প্রশ্ন করল, পাঁচ টাকায় যাবে ?

মেয়েটি চটে উঠে বলল, মন্তব্য করছেন ?

নিশানাথ অতীব পুলকিত হলো। এতক্ষণে বাঙালী বেশ্যার প্রাচীন শব্দভাণ্ডার দেখা দিচ্ছে। সাহেব পাড়ার পানশালায় বসে মেয়েটার মার্জিত আলাপ শুনতে শুনতে তার মাথা ধরেছিল। নিশানাথ অনায়াসে বলে ফেলল, মাইরি ?

মেয়েটি হেসে বলল, কলেজে পড়েন ?

নিশানাথ হেসে মিথ্যে জবাব দিল 'হুঁ'। চিবুকে হাত বুলিয়ে ভাবল ভাগ্যি দাড়িটা কামিয়েছিলাম। কিন্তু রেস্তোরার সেই ছেলেটা, কি যেন নাম, গোলাম হোসেন, আর না। ধুত্তোরি। বলল 'কেন' ?

মেয়েটা হেসে উত্তর দিল, কলেজের মেয়েরা তো পাঁচসিকের সিনেমা দেখেই খুশি। আমাদের বাজার গেল।

সর্বনাশ। এখানেও প্রতিযোগিতা। বাজার। মনোপলিতে হাত পড়েছে, তাই ক্ষেপে গেছ সুন্দরী ? নিশানাথ হা-হা করে হেসে উঠেই থমকে গেল।

দেখল চার পাশের টেবিল থেকে অনেকেই তার দিকে তাকিয়েছে। একটি প্রৌঢ় নাবিক দূর থেকে তার মাথার টুপি তুলে নিশানাথকে অভিবাদনের ইঙ্গিত করল। সঙ্গিনী ডান হাতের চেটোটা নাচের মুদ্রায় ঘুরিয়ে সেই প্রতীক্ষারত য্যাংলো মেয়েদের একজনকে হাসিমুখে একটা চোখ টিপে ইসারায় বোঝাল, কি জানি কেন, অর্থাৎ মাতাল হয়েছে। আর অল্প দূরের টেবিল থেকে একটা যোয়ান সাহেব তার অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান হাতটা তুলে নিশানাথকে দেখিয়ে তার সঙ্গিনীকে কি যেন বলে হো-হো করে হেসে উঠল।

নিশানাথ কুঁকড়ে গেল। কি বলল সাহেবটা। তাকে কি ভাবছে এরা ? মনে হলো সেই হৃদপিণ্ডের আকার পানশালাটার চারদিক থেকে হাসির বুজকুরি পাক খেতে খেতে পরস্পরকে ধাক্কা দিচ্ছে।

আর কেটল্ ড্রামে কাঠি পড়ল। আর প্রায় ধমকের স্বরে বিউগিল

বেজে উঠল। ওাব চেলোব লম্বা মোটা তাবে একটা ছোকবা-কিরিঙ্গি-হাত গমগমে আওয়াজ তুলল। তাবপর পিয়ানো এ্যাকর্ডিয়ান এবং কাঁসবে ধ্বনিতবঙ্গ উঠল এবং সেক্‌সপীয়রেব ক্লাউনের মতো একটি লোক কোথা থেকে হঠাৎ শূন্যে দুটো হাত তুলে পবিত্রাহি ভঙ্গিতে একজোড়া ঝুমঝুমি বাজাতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ঠেলে জোড়া বাঁধা মেয়েপুরুষ পথচলার সরু জায়গাটায় পরপব দাঁড়িয়ে পড়ল। টেবিলে টেবিলে জোড়ের বদল হলো। আব মদিগ্‌লিয়ানির একটি মডেল মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত নির্বিকার উদাসীন মুখে কোমর দুলিয়ে হাতে তাল দিয়ে তীব্র উত্তেজক গান ধরল। 'ইয়াও', 'ইয়াও' 'ইয়াও' সমস্বরে সকলে আনন্দধ্বনি করল এবং ঠিক সেই সঙ্গে বীয়াবের বোতল খোলার একটা তীব্র শব্দ সেই হল্লার বুকে তীবের মতো বিঁধল। কে যেন শিষ দিল। যাবা নাচতে নামে নি তারা চেয়াবে বসে তালে তালে হাতে তালি দিতে লাগল, পা ঠুকতে লাগল, হাসিভবা জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে বইল নাচের দিকে।

মুহূর্তে পানশালার পটপরিবর্তন হয়েছে। আমার হাসিটা, আমাকে সকলে মাতাল ভাবল, আমি অর্থাৎ—

নাচবেন ?

নিশানাথ অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। এ এখনও যায় নি ? কিন্তু আমি মদ খাচ্ছি কেন ?

চলুন না নাচি ?

নিশানাথের ইচ্ছে হলো বাঁ হাতে একটা থাপ্পড় মারে। কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, জানি না।

ধুব, জানতে হয় নাকি ? শুধু পা ঠুকলেই—আমিও তো —

নিশানাথ লক্ষ্য করল নিজের অজান্তে মেয়েটি অর্কেষ্ট্রাব তালে মেঝেতে পা ঠুকছে আর নীল কাপড়ে মোড়া তাব মাংসল দুটি জানু ঢেউয়েব মতো এক একবার কেঁপে উঠছে। নিশানাথ খুশি হয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে গেল এবং আবার তার কণ্ঠা, বক্ষ এবং পেট দেখতে পেল। নিশানাথের বিরক্তি হলো। সে টেবিলের কাচের ঢাকনায় তাকাল এবং দেখল মেয়েটি সবে বসাব কারণে সেখানে কোনো ছায়া নেই।

আর আলো, প্রখর আলো। নিশানাথ অসহায়েব মতো চারদিকে তাকাল। কোথাও ছায়া নেই, শিল্প নেই। এবং মাইকেব সামনে

গলার রগ ফুলিয়ে হাতে তালি দিয়ে কোমর দুলিয়ে সেই মেয়েটি গাইছে। এখানে সে দেগার মডেল। গানের সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁটের কোল কুঁচকে চকচকে দাঁত বেরিয়ে আসছে, চোখ দুটো সাপ। আর সেই ক্লাউনটা প্রাণপণে দুটো হাত শূন্যে তুলে ম্যারাকাস বাজিয়ে চলেছে। যেন একটা অলীক অস্তিত্ব। আর হাতে তালি। আর পায়ের ছন্দিত ধ্বনি। ক্রমশ গান দ্রুত হচ্ছে, সুর দ্রুত হচ্ছে, নাচ দ্রুত হচ্ছে। ইয়্যাও বলে এবার গানের মধ্যে সেই মেয়েটিই চেঁচিয়ে উঠল। নিশানাথ বিস্ফারিত চোখে দেখল স্বাস্থ্য বইয়ের হৃদপিণ্ডটায় ত্বক আর প্রসাধনের বৈপরীত্য সত্ত্বেও আসলে কতগুলি ধমনী উন্মাদের মতো দাপাচ্ছে। রক্ত দাপাচ্ছে।

নিশানাথ এই উন্মত্ত উৎসব আর কোলাহলের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত অপরিচিত ও নিঃসঙ্গ বোধ করল। কোথায় যেন যেতে হবে? কোথায় যেন যাবার ছিল সন্ধের পর আমি দাড়িটা, ও মনে পড়েছে। কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বলল, বাত্রি।

নিশানাথ রোমাঞ্চিত হয়ে নড়েচড়ে বসতেই মেয়েটি অপ্রতিভের মতো ছিটকে সরে বসল। একটু যেন ভয়ও পেয়েছে। হেসে বলল, বলছিলাম যাবেন?

এই মেয়েটাই কি কানের কাছে কথা বলল? আমি যে শুনলাম, আমি যেন, এই মেয়েটা সেই থেকে, আসলে এ কে, কি চায়?

ভয়ে ভয়ে নিশানাথ প্রশ্ন করল, কোথায়? মেয়েটা মোহময়ী হাসি ফুটিয়ে বলল, বাইরে।

নিশানাথ বলল, যাব।

মেয়েটা ওয়েটারকে ডাকল। নিশানাথ বিলের ফেরৎ পয়সা একটা একটা করে গুনে পকেটে পুরল। সে স্পষ্টত বেয়ারার চোখে বিস্ময় দেখল। কিন্তু তার নিজেকে এতটুকু দীন বা অ-কেতাবান মনে হলো না। ওয়েটারটা মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি হেসে আবদারের সুরে বলল, ওকে কিছু দিন?

নিশানাথ এতক্ষণে বিজয়ীর মতো সেই বেয়ারাটার দিকে তাকিয়ে একটা আস্ত পাঁচ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে বলল, কেন, মহাভারত তো শুদ্ধই রয়েছে।

বেয়ারাটা সেলাম করে বলল, জী সাব।

নিশানাথ প্রফুল্ল মনে উঠে দাঁড়াল। বেয়ারাটা যদি মানুষ হয় তাহলে

এই পাঁচ টাকা ওর কাছে চিরকাল কাঁটা হবে, চিরকাল। খুশি হয়ে সামনের দিকে এগোতে যাবে, মেয়েটি এসে ওর হাত ধরল, তারপর টেবিলে বসা অন্য কটা নিঃসঙ্গ বারমেডের দিকে খুশি হয়ে তাকাল। সে দৃষ্টিতে শুধু অর্থ উপার্জনের পুলকই ছিল না, পুরুষ-বিজয়ের নারী মহিমাও অজ্ঞাতে ফুটে উঠেছিল। প্রতিদিন এই এক জয়-পরাজয়ের লীলায় অবতীর্ণ হয়েও রমণীর গৌরব মেয়েটি হারাতে পারে নি। মেয়েটি তারপর প্রেমিকার মতো মুখ তুলে নিশানাথের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, চলো।

নিশানাথ বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে বলল, কোথায় ?

মেয়েটি ততোধিক তিক্তকণ্ঠে বলল, মানে ? তারপরেই গলায় অনুনয়ের সুর ফুটিয়ে বলল, বারে, গঙ্গায়—

নিশানাথ এতক্ষণে মেয়েটির সম্পূর্ণ চেহারার ওপর একবার চোখ বোলাল। পায়ে জরির কাজ করা স্যাণ্ডেল, স্ট্র্যাপের ফাঁকে রঙ করা নখ। আর মোটামুটি একটি শরীর। বাহুল্যের মতো নীল শাড়িটা কোমরে পেঁচিয়ে আঁচলটি ডানার মতো ছড়ানো বাঁ হাত উপচে বাইরে পড়েছে। নিশানাথের দৃষ্টি দেখে মেয়েটি তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে বুক ঢাকল। আর পলকে নিশানাথের আপাদমস্তক রি রি করে উঠল। সে মেয়েটার লজ্জায় অপমান বোধ করল। তারপর এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, তিন পুরুষে প্রেস্, আবার ট্যাক্সি চাপার সখ।

তারপর দ্রুত, প্রায় দৌড়তে দৌড়তে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

চার

নিশানাথ দূর থেকে দেখল তার সিংহাসনে একটি যুগল বসে আছে। সচরাচর এমন হয় না। পুকুরের পাশে, গাছের ছায়ার নির্জনতা বা অন্ধকার-বিলাসী মেয়ে পুরুষ সে প্রায়ই দেখে। কিন্তু ঠিক তার এই নির্দিষ্ট জায়গাটুকু কোনোদিনই অধিকৃত হয় নি।

নিশানাথের ভয় করতে লাগল। সমস্তটা পথ সে পেছনে এক নিঃশব্দ পদসঞ্চার শুনেছে আর অলৌকিক কোলাহল। সমস্তটা পথ তার মনে হয়েছে কে যেন তর্জনী উঁচিয়ে তাকে চিনিয়ে দিচ্ছে। অত্যন্ত অসহায়ের মতো নিশানাথ নিজের আশ্রয়ে দৌড়ে এসেছিল। যেখানে রাত্রি তার ঐশ্বর্য নিয়ে অপেক্ষা করে। যেখানে কোনো হীনমন্যতা নেই। যেখানে সে অধীশ্বর। অথচ আজই কেন, কেন এরা এখানে এসে বসল।

পুরু কাঠের সাদা বেড়াটার গায়ে হাত রেখে সে প্রায় নিজের অজ্ঞাতে যুগলটির পেছনে এসে দাঁড়াল। বেড়ার ওপাশে পুকুরের দিকে মুখ করে তারা বসেছিল, নিশানাথের আগমন সম্পর্কে বিলক্ষণ সচেতন অথচ ভঙ্গিতে আপাত ঔদাসীন্যের ভানটা বজায় রেখেছে। নিশানাথ জানে ওরা বিরক্ত হয়েছে, ভয় পেয়েছে। তাকে লম্পট বা পুলিশ ভাবছে।

মেয়েটি কি বলছিল, হঠাৎ চুপ করে গেল। ছেলেটি হঠাৎ ঘাড় বেঁকিয়ে নিশানাথের মুখে তাকাল। অর্থাৎ এরা যে ভদ্রলোক এবং খারাপ মতলবে এখানে আসে নি···পুলিশ হলে এই ভাবে তা নিশানাথকে বোঝাতে চায়। আর নিশানাথ যদি লম্পট বা গুণ্ডা হয় তাহলেও যে ছেলেটি ভীত নয় তার চাউনিতে এমনও একটা অর্থ ছিল।

অত্যন্ত অপ্রস্তুতের মতো নিশানাথ হঠাৎ বলে ফেলল, দেশলাই আছে? তার গলায় যে স্বাভাবিক কুণ্ঠা এবং উচ্চারণে যে সহজাত দ্বিধা—এক্ষেত্রে তা নিশানাথের কানেই মধুর শোনাল। এরা তার কথার ছাঁদে বুঝতে পারবে নিশানাথ অভিজাত। সে বাধ্য হয়েই এখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

ছেলেটি মেয়েটির দিকে তাকাল, মেয়েটি অত্যন্ত লজ্জিত ও বিব্রতের মতো এক মুহূর্ত ইতস্তত করে অতঃপর তার বটুয়া থেকে একটি দেশলাই বের করে নিশানাথের দিকে হাত বাড়িয়ে আবার হাত গুটিয়ে নিল এবং ছেলেটিকে সেই দেশলাইটা দিল। ছেলেটি দেশলাইসুদ্ধ হাত এগিয়ে বলল, এই নিন।

নিশানাথ ডান হাতে দেশলাইটা ধরে বাঁ হাত পকেটে ঢোকাল। পলকে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। সিগারেট তো নেই, এমনকি খালি প্যাকেটটাও। কিন্তু এখন কি করি? কি করি এখন? আমাকে এরা, আমাকে, কিন্তু প্রেম কি সত্যিই সম্ভব? ছেলেটিকে বেশি সিগারেট খেতে দেবে না বলেই কি মেয়েটি জোর করে দেশলাইটা, আমার সিগারেট নেই তবু দেশলাই চাওয়ার জন্য এখানে এসে দাঁড়ানোর কি অর্থ করবে এই প্রেমিক-প্রেমিকা।

নিশানাথ ফস্ করে একটা কাঠি জেলে বেড়ার এপাশ থেকে ঝুঁকে জলন্ত কাঠিটা ওদের বিস্মিত ও ভীত মুখের সামনে ধরে থমথমে গলায় প্রশ্ন করল, এখানে কি হচ্ছে এত রাতে! নিজের কণ্ঠস্বরে নিশানাথ তার মধ্যে যেন নিয়তিকে প্রত্যক্ষ করল।

ছেলেটি জেদী গলায় বললে, সে খবরে তোমার প্রয়োজন! মাতলামি করার জায়গা পাওনি? এখুনি পুলিশ ডাকব।

নিশানাথ স্নিগ্ধ হেসে বলল, তা একটু মদ্যপান করেছি বটে। কিন্তু পুলিশ তো আমিও ডাকতে পারি। কিংবা আমি নিজেই যদি সাদা পোষাকের পুলিশ হই আপত্তি আছে, একটু থেমে বলল, আপনাদের ?

ততক্ষণে দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি ঈষৎ কাঁপছে। ছেলেটি বিশ্বাস করতে পারছে না, অবিশ্বাস করতে পারছে না। অনেক আগে, মানে পৌরাণিক যুগে যখন আমি ভালোবাসাবাসি করতুম, সঙ্গে সুনয়নী ছিল—গঙ্গার ধারে আমরা মগ্ন হয়ে বসেছিলাম—একটা লোক এসে ঠিক এইভাবে আমাদের অপমান—কথার ছাঁদে বুঝিয়েছিল সুনয়নী বেশ্যা, আমি লম্পট, নইলে গঙ্গার ধারে এতরাতে—কলকাতায় ভালোবাসার নির্জন অবকাশ না পেয়ে আর অপমানে, অপমানে, অপমানে সুনয়নী—আর আমি—পৌরাণিক যুগে, যখন আমি প্রেমিক ছিলাম।

ছেলেটি ভীরু গলায় বলল, দেখি আপনার আইডেনটিটি কার্ড।

নিশানাথ বলল, সে সব থানায় গিয়ে দেখাব। তারপর গলায় অন্তরঙ্গতা এনে প্রশ্ন করল, কলেজে পড়েন বুঝি ?

মেয়েটি ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ। যেন এই উত্তরেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

এই প্রেমিকাটিও তাহলে সেই বারাঙ্গনার একজন প্রতিযোগিনী। অহো! প্রেম ভার্সেস প্রয়োজন। প্রণয় বনাম—শরীরের এমন কোনো প্রতিশব্দ তার মনে এলো না, যা এখানে পান করে ব্যবহার করা যায়। নিশানাথ নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে বলল, বুঝেছি।

মেয়েটি ঘাড় নামাল। নিশানাথ অতীব পুলকিত হলো। আজকাল ধরিত্রী দ্বিধা হয় না, এ বস্তুত সৌভাগ্য বলতে হবে।

ছেলেটি বললে, কি বলতে চান আপনি ? আমরা কি দোষ করেছি ? নিশানাথ ছোকরার (সরি যুবকের) ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হয়ে বলল, বলতে চাই এখানে এভাবে বসা ঠিক হয় নি, এই আর কি।

কেন ? এই জায়গাটা কি প্রহিবিটেড এরিয়া ?

আমার অতীত দেখতে পাচ্ছি—যা এমনি নিষ্কলঙ্ক আর নির্ভয় আর নির্বোধ ছিল। কিন্তু থাকবে না। দিনে দিনে পরিবেশ এদের সমস্ত অহমিকা কেড়ে নেবে। এদের মধ্যে পাপ ঢোকাবে। এরা তখন নির্জনতা খুঁজে নেবার জন্যে চড়া দাম দেবে। তারপর সেই অপরাধবোধ। সেই অপরাধবোধ

আর অনির্দিষ্ট উৎকণ্ঠা। এদের আজকের অভিমান কালই চাতুর্যে পরিণত হবে।

নিশানাথ বলল, তর্ক করবেন না। বাড়ি যান নয় ঐ ওদিকে গিয়ে বসুন। এখানে চুরি, ছিনতাই (বহুপূর্বে শ্রুত এই শব্দটি ও সাবধানবাণী তার মনে গেঁথে আছে দেখে সে আনন্দিত হলো), রাহাজানি হরদম হচ্ছে। বোঝেন না, কলকাতার ময়দান।

মেয়েটি অস্ফুটে বলল, চলুন যাই।

ছেলেটি অতঃপর বেড়া ডিঙিয়ে এপারে এল, মেয়েটি নিচু হয়ে গলে এপাশে এসে দাঁড়াল। তারপর দুজনে মধ্যে ব্যবধান রেখে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল। পানশালা থেকে বেরিয়ে সমস্তটা পথ আমি কি এই ভাবেই হেঁটেছি? আমি কি এইভাবে—

হঠাৎ নিশানাথ পেছন থেকে দৌড়ে যুগলটিকে ধরল। নিশানাথ স্পষ্ট শুনল মেয়েটি ভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করেছে। তার আপাদমস্তক ঘৃণা হলো, সে অপমানিত বোধ করল। ছেলেটিকে বলল, এই যে আপনার দেশলাইটা।

ছেলেটি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, থ্যাঙ্কস।

নিশানাথ অবহেলায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের জায়গাটিতে এসে বসল। আহ্, এতক্ষণে। পুকুরটার দিকে তাকাল। সামনে গাছের জটিল ছায়া। পাতাগুলির ফাঁকে আকাশ এবং একটি দুটি তারা, মৃদু বাতাসে জল মাঝে মাঝে কাঁপে। ছায়া কাঁপে। আর আকাশ ও নক্ষত্র খচিত জটিল সেই ছায়ার আকৃতি পান্টায়। দিঘির বাঁ কোণে জলজ ঘাসের গায়ে খানিকটা লাল। তারপর উত্তর দক্ষিণে টানা সাদা বেড়ার ছায়া। বেড়াগুলির ফাঁকে পিচের রাস্তা। আর লাল, নীল, হলুদ বর্ণিকা। দক্ষিণ কোণে কতগুলি গভীর জলরেখা। কতগুলি রঙের জটিল কম্পোজিশন।

নিশানাথ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। চৌরঙ্গীর ওপারে যে বিশাল হলুদ বাড়িটা, তার ছায়া নেমেছে পুকুরে। যেন জলের তলায় এক নিদ্রিত প্রাসাদ। খিলান অলিন্দ ও সেই আশ্চর্য সিঁড়িটা জলের অতলে কি এক মহারহস্যের আয়োজন করে রেখেছে। নিশানাথ গুনে গুনে দেখল বন্ধ জানলাগুলির সংখ্যা ঠিক আছে। নিশানাথ কোনোদিন রাত্রে এ বাড়ির জানলা খোলা দেখে নি। আর আশেপাশের নিয়নবাতিগুলি জ্বলছে, নিভছে। তির্যক রেখায় সেই নিদ্রিত প্রাসাদের গায়ে আলো জ্বলছে, নিভছে।

পুকুরের স্থির জলে স্বচ্ছ ছায়া-বাড়ির খিলান, অলিন্দ এবং সিঁড়ির একোণ ওকোণে রঙ জ্বলছে, নিভছে। জানলাগুলি বন্ধ। খোলে না। সমস্ত ছায়া কি এক রহস্যে থরথর কাঁপছে। দিঘির হৃদ্‌পিণ্ড একটা অলৌকিক জগতের স্পন্দনে কাঁপছে।

আর যেহেতু ট্রাম লাইনের গায়ে সেই বাতিটা জ্বলছিল সেহেতু তরল ও রুগ্ন একটা রঙের প্রবাহ তীক্ষ্ণ মুখ থেকে ক্রমশ বিস্তৃত হতে হতে পুকুরের মধ্যিখানে অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে আছে। দিঘির শরীরে কখন কি আবেগ হয় নিশানাথ জানে না, শুধু মাঝে মাঝে সে দেখেছে পুকুরের এক একটা অংশে জল শান্ত হয়ে কাঁপে। সেই রঙের প্রবাহটি জোনাকির মতো ফুটছিল। যেন দিঘির হৃৎপিণ্ডে, পাতালে আগুন লেগেছে।

নিশানাথ স্তব্ধ চোখে দেখল বাতাস উঠেছে আর পলকে সমস্ত পুকুরটায় কাঁপন ধরল। আর অজস্র কুঞ্চিত কেশে যেন দিঘির জল ফেঁপে ছেয়ে গেল। আর গাছের ছায়া, বেড়ার ছায়া, বাড়ির ছায়া হাল্কা হয়ে দুলতে লাগল এবং সেই তরল আগুনটা মুহূর্তে সেই আশ্চর্য প্রাসাদের দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল। সেই রুদ্ধ গবাক্ষ, অলিন্দ, খিলানে আগুন লাগল এবং সিঁড়ির কোণে কোণে লাল, হলুদ, নীল আলো জ্যামিতিক আকারে অন্ধকার, আলো ও বিবিধবর্ণের জটিল উদ্ভাসে বিচিত্র হয়ে উঠল।

নিশানাথ ফিস ফিস করে বলল, বিদায়।

তখন সমুদ্রে ট্রয়ের রাজকুমার আবার নৌকো ভাসিয়েছে।

পৃথিবীতে তার কোথাও আশ্রয় ছিল না। ইউলিসিস, আগামেমনন এবং পৌরাণিক বীর বৃদ্ধ প্রায়ামের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শেষ বংশধরটির পেছনে নিয়তির মতো ধাওয়া করেছে। ট্রয়ের বিধ্বংসী আগুনের স্মৃতি নিয়তির মতো তাড়া করেছে। হেক্টরের মৃত্যু, প্রায়ামের হত্যা, কাসান্ড্রার ধর্ষণ, রাজবংশ ও প্রজাদের অমোঘ লাঞ্ছনা, ধ্বংস অভিশপ্ত আর্তনাদ হয়ে নিয়তির মতো অনুসরণ করেছে। আর উত্তাল সমুদ্রে তরণীর ওপর একাকী দণ্ডায়মান ইনিয়াস। তরণীর গর্ভে গুটিকয় সঙ্গী সাথী। পৌরাণিক বীরেরা যে ট্রয়কে ধ্বংস করেছে, হেলেনের রূপের আগুনে যে ট্রয় ছারখার হয়ে গেছে, তার বংশধরকে কেউ আশ্রয় দেয় না। পারলে বন্দী করে। তরণীর তীর জোটে না। আর পিতা গেল, শিশুপুত্র গেল। পেছনে অতীত দুঃস্বপ্ন, সম্মুখে অলৌকিক ও অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ। সমুদ্রের বুকে তরণীর ওপর ইনিয়াস একাকী।

অবশেষে কার্থেজ। সেই আশ্চর্য দেশের বিধবা রাণী দিদো—রূপসী, যৌবনবতী। আর তার অলৌকিক প্রমীলা বাহিনী। একটা স্তন কর্তিত, বীরাঙ্গনা সেই আমাজনদের দল। ইনিয়াস আশ্রয় পেল। দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের পর মৃত্তিকা ও রমণীর মুখ দেখল ট্রয়ের সেই অবশিষ্ট হতভাগ্যের দল। আর দিন যায়। ইনিয়াস দিদোর কালো পাথরে গড়া প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের বুকে চোখ রাখে, আকাশের নক্ষত্র দেখে। আর দিন যায়, দিদো, সুন্দরী, যৌবনবতী, আমাজনদের অধিরাণী ইনিয়াসের চোখে দেবতার নির্দেশ পাঠ করে, ক্রমে ক্রমে তাকে ভালোবাসে। আর দিন যায়, খবর আসে পৌরাণিক বীরের দল কার্থেজ ঘিরে ফেলবে। ইনিয়াস কালো পাথরের প্রাসাদ শিখরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের বুকে চোখ রাখে, নক্ষত্রের স্পন্দন দেখে। প্রণয় বা স্থিতি তো তার নয়। সমুদ্র ইনিয়াসকে ডাকে। ট্রয়ের আগুন তাকে ডাকে। তাই আবার প্রায়ামের বংশধর একদিন গোপনে সমুদ্রে নৌকা ভাসায়।

শেষ মুহূর্তে সংবাদ পেয়ে দিদো সমুদ্রতীরে দৌড়ে এসেছিল। দিদো ফিরে যেতে ডেকেছিল। কিন্তু ইনিয়াস দূর থেকে বলেছিল, বিদায়। আর তরঙ্গ তাকে ঠেলে দিচ্ছিল দূরে। তারপর সমুদ্রের বুকে তরণীর ওপর একাকী দণ্ডায়মান ইনিয়াস দেখল কার্থেজ ও আমাজন-বাহিনীর অধিরাণী দিদোর কালো পাথরের বিশাল প্রাসাদে আগুন জ্বলছে। কৃষ্ণ হর্ম আগুনের আভায় দিদোর মতোই শুভ্র, রক্তিম, উজ্জ্বল। আর প্রাসাদ শীর্ষে একটি রমণী আকাশের দিকে দুই বাহু তুলে অকম্পিত দণ্ডায়মান। ইনিয়াস অস্ফুটে বলল, বিদায়। আর ট্রয়ের শেষ বংশধর ইতিহাস গড়তে সমুদ্রে গেল।

নিশানাথ জলের গভীরে কার্থেজের সেই জ্বলন্ত প্রাসাদের দিকে স্তম্ভিত, মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। সেই অবাস্তব ছায়ার অলৌকিক শিল্প সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইল। জটিল রেখা ও বিচিত্র বর্ণের আশ্চর্য কম্পোজিশন। পৃথিবীর কোনো আর্টিস্ট যা আঁকতে পারে নি, পৃথিবীর কোনো দর্শক যা দেখে দেখে দেখে পুরনো করে দেয় নি।

নিশানাথ রোমাঞ্চিত হলো। বড় দেরিতে জন্মেছি, শত শত শতাব্দীর পর। যে ভাষায় আমি কথা বলি তা ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত। আদি বাক্য উচ্চারণের অনুভবকে সুষ্ঠু ভাষায়, ছন্দিত শব্দে রূপান্তরিত করার প্রথম সুযোগ বা অধিকার আমি পাই নি। ফলে কতগুলো গ্রাম্য, অর্ধশিক্ষিত শব্দের যে মানে এবং ভাষার যে ব্যাকরণ বেঁধে দিয়ে গেছে আমাকে তা মানতে

হয়। তাই, বন্ধুগণ, আমি শব্দের চর্চায় উৎসাহী নই। ভাষাশিল্পে আমার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। এমনকি পারস্পরিক কথাবার্তায় আমার অনীহা। যেমন ধরুন ভালোবাসা ব্যাপারটা। মধ্যযুগে পীরিত শব্দটার চল ছিল, এখন তার অন্য মানে। বর্তমানে প্রেম, প্রণয়, অনুরাগ, ভালোবাসা ইত্যাদির প্রচলন আছে। একটি যুবক একটি যুবতীকে কোন্ ভাষায় প্রেম নিবেদন করবে? আমি তোমায় ভালবাসি? অশ্লীল। আমি তোমার প্রেমে পড়েছি? অশ্লীল। আমি তোমার প্রণয়াসক্ত? অশ্লীল। এই যে আমরা বলি অমুকের সঙ্গে তমুকে প্রেম করছে, আমরা জানি না একটা সুন্দর ব্যাপারকে (অন্তত থিয়োরিটিক্যালি) আমরা কিভাবে ভাল্গারাইজ করি। সুতরাং ভালোবাসার যা সেন্স বাংলায় তা বোঝাবার মতো কোনো শব্দ নেই। অথচ ভাষার অনুশাসন আমি এড়াব কি করে?

ঠিক এই কারণেই আমার বিশ্বাস ভাষা দিয়ে আদপেই কোনো মহৎ শিল্প হয় না।

তাছাড়া আমি লক্ষ্য করেছি কোনো আর্টফর্মই চিরন্তন নয়। আদি মানুষ প্রথমে ভাষাহীন সুরে গান গেয়েছিল। তারপর কয়েক সহস্র বৎসরে পাশ্চাত্য আজ রক-এন-রোল এবং প্রাচ্য তার দিশি সংস্করণের পর্বে পৌঁছেছে। সুতরাং ভাষাহীন সুর থেকে ভাষা প্রযুক্ত সুর এবং কণ্ঠ ও যন্ত্র নিঃসারিত স্বর—একক বা সমবেত—আদিম-ধ্রুপদী-লৌকিক এবং আধুনিক ভঙ্গিমা যে ছাঁদেরই হোক—সুর তার আর্টফর্ম ক্রমাগত বদলেছে এবং তাতে ক্রমে ক্রমে অন্য শিল্পধারার প্রভাব এসে পড়েছে।

চিত্রকলায়ও ঠিক তাই। গুহাগাত্রে প্রথম একটি অলৌকিক জীবের রেখাচিত্র এঁকেছে আদিম কোনো মানুষ। তারপর ম্যাজিক বিশ্বাস থেকে উদ্ভব হলো চিত্রকলার। তারপর কয়েক সহস্র বৎসরে বদলাতে বদলাতে চিত্রকলা আজ বিশেষ দেশের বিশেষ অবস্থায় আধুনিক।

সুতরাং কোনো আর্টফর্মই আদি অর্থে অকৃত্রিম বা অপরিবর্তনীয় নয়। বদলাতে বদলাতে আজ ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও সাহিত্য পরস্পরের গায়ে এসে পড়েছে এবং যতদিন যাবে ততই এরা নিজেদের বহু বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বহু বিশিষ্টতা অর্জন করে পরস্পরের আরো নিকটবর্তী হবে। এইভাবে জন্মাবে নতুন আর্টফর্ম, যেমন ফিল্ম এবং ইত্যাদি।

কিন্তু বন্ধুগণ, কে না জানে কোনো স্মৃতিই চিরন্তন নয়। সময় সব মুছে দেয়। আমরা হরপ্পার বৃষ নিয়ে গদগদ। কিন্তু কে জানছে তারও আগে কি ছিল?

আমরা চর্যাপদ নিয়ে বিমুগ্ধ। কিন্তু কে জানছে বাংলাদেশে শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ার আগে কি মহৎ কাব্য রচিত ও বিনষ্ট হয়েছে। মিশর, গ্রীস, রোম, চীন, ভারতবর্ষ তার মহান সৃষ্টির কতটুকু সংরক্ষণ করতে পেরেছে? তার অত্যাশ্চর্য বিকাশের কতটুকু সাক্ষ্য আজও আছে? এক, সময় সব হরণ করে। দুই, সময় আজ দেয় কাল কেড়ে নেয়। অশেষ সম্মানিত শিল্পী জীব-দশায় বা মৃত্যুর পর কি অমোঘ বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেছে। কতশত শতাব্দীতে কতকোটি সম্মানিত ভদ্রজনের এই দুরবস্থা (অহো অহো) বন্ধুগণ, নিশ্চয়ই তা ভোলেন নি। (ইয়্যাও) কালজয়ী বলে কিছু নেই। (ইয়্যাও) যা পাঁচশো বছর টিকেছে, পাঁচহাজার বছর পরে তা থাকছে না। যাদুঘরে ঠাঁই পাবে বড়জোর। (সাধু সাধু) যাদুঘর এক বিচিত্র মর্গ। দাহ বা কবরস্থ হওয়ার পূর্ব অবস্থা। সুতরাং যে মৃতদেহ মর্গে ঠাঁই পেয়েছে, সে কালজয়ী নয়।

অতএব বন্ধুগণ, আমি যেহেতু লক্ষ্য করেছি পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোনো আর্টফর্মই চূড়ান্ত নয় এবং কোনো সৃষ্টিই কালজয়ী হতে পারে না এবং আমি যেহেতু এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এক যুবক যার কাঁধের ওপর কয়েক হাজার বছরের মানবীয় ভাব ভাষা আচরণ ও ঐতিহ্যের বিশাল বোঝা—সেহেতু আমার পক্ষে কোনো নতুন সৃষ্টি সম্ভব নয়, কারণ আমার আগে পৃথিবীর যাবতীয় মহৎ ব্যাপারগুলি আবিষ্কৃত ও ব্যাখ্যাত হয়ে গেছে। সে কারণে আমি মানবসভ্যতার একজন দীন চাকর মাত্র।

অথচ আমি চেয়েছিলাম সম্রাট হতে। আর যাবতীয় অনুভব ও আবেগ প্রকাশের পথ বা মাধ্যম খুঁজে না পেয়ে যখন ক্লীব হয়ে যাচ্ছে তখন একদিন আমি ছায়া দেখলাম।

বন্ধুগণ, আজ আমি সভ্যতার শেষ বাণী নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত। হ্যাঁ, কয়েক হাজার বছর পৃথিবীকে মানুষ সভ্যতা দিয়েছে। আর বিংশ শতাব্দী মানুষকে দিল ছায়া।

ছায়া আমার স্বভূমি, আমার নিজের আবিষ্কার। বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, ভেবে দেখুন শিলালিপি মুছে যায়, পিরামিড বালি চাপা পড়ে, ব্যাবিলনের প্রাসাদ ইতিকথা হয়, দেয়ালচিত্র বিবর্ণ, বিবর্ণ, বিবর্ণতা পায়। কিন্তু পৃথিবীর এই আদি ও অকৃত্রিম আর্টফর্ম কালস্পর্শ করতে পারে নি পারে না। এর কোনো পরিবর্তন নেই।

পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ যখন শক্ত হয় নি আর অলৌকিক জন্তরা যখন অবাস্তব শরীর নিয়ে ইতস্তত ঘোরে, যখন মানুষ জন্মায় নি, তখন প্রথম, প্রথম

একদিন সূর্যের কিরণে একটি ছায়া পড়েছিল ধরিত্রীর বুকে। সেই প্রথম অজ্ঞাতে আর বিনা আয়াসে শিল্প সৃষ্টি হলো। কেউ দেখল না। তারপর সেই একই প্রক্রিয়ায় অযুত-নিযুত বৎসরে পৃথিবীর সর্বত্র যে-কোনো ছায়া কোনো না কোনো শিল্পরূপ রচনা করল। কিন্তু কেউ দেখল না। আদি মানব-মানবী গুহাপৃষ্ঠে আগুনের শিখার ছায়া দেখে নৃত্যের ভঙ্গি শিখল, ধাবন্ত হরিণের ছায়া দেখে রেখাচিত্র শিখল, নদীবক্ষে বৃক্ষপত্রের ছায়া দেখে বৃক্ষ মর্মরের ভাষা শিখল। তারপর সভ্যতা হলো। সভ্যতা গেল। তারপর যুগ, যুগ, যুগ। ইতিহাসের পর্ব-বিভাগ। কিন্তু মিশর, গ্রীস, ভারতবর্ষ চীন—তার আদিপর্ব থেকে আজ পর্যন্ত কত না সৃষ্টির অর্ঘ কালের গর্ভে ঢেলে হারিয়ে গেল আর ছায়া অনন্তকাল মানবচক্ষুর অজ্ঞাতে, মানব সমাজের অবহেলা সত্ত্বেও শিল্পরচনা করে গেল।

মহৎ শিল্পের লক্ষণই তাই। তা হয়, মানে হয়ে যায়। সমাদর অথবা বিরূপতার তোয়াক্কা করে না। তারপর হয়তো শত-সহস্র বৎসর পর একদিন কোনো চোখ তা আবিষ্কার করে। বন্ধুগণ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিল্পকে আবিষ্কৃত হতে তাই খৃষ্টজন্মেরও পরে দু হাজার বছর অপেক্ষা করতে হলো। ধন্য বিংশ শতাব্দী। যখন চারদিকে আর্তনাদ উঠেছে বিজ্ঞান ও যন্ত্রের দানবিক প্রগতিতে শিল্প সৃষ্টি পৃথিবী থেকে মুছে যাবার দিন এসেছে—তখন তুমি পৃথিবীর আদিতম, শুদ্ধতম অথচ নবীনতম শিল্পকে আবিষ্কার করলে।

এই ছায়ার শিল্পে বস্তুত শুদ্ধতার চরম উৎকর্ষ আপনারা লক্ষ্য করবেন। জন্মমুহূর্তেই এ ছিল আধুনিকতম। এ্যাবস্ট্রাক্ট একটা আকৃতি বা কিছু অনুষঙ্গ চোখের সামনে ফেলে দেয়—তুমি তোমার স্মৃতি, বোধ, অনুষঙ্গ দিয়ে তা বুঝে নাও, অনুভব করো। সৌন্দর্য, বাস্তবতা ও নন্দনতত্ত্বের নির্যাসটুকু নিয়ে ছায়া যে শিল্প গড়ল, মনে পড়ে থাকে, তা কত স্বতঃস্ফূর্ত, অনায়াস, আনপ্রিটেনশাস অথচ তাতে কি গভীর জটিলতা ও কি আদিম সারল্য। তোমরা মিউজিককে বলো হায়েস্ট ফর্ম অব আর্ট কারণ তা সব থেকে বেশি বিমূর্ত এবং তার আবেদন নাকি সর্বজনীন। অথচ এই যে ছায়া, আহ্, ছায়া, এর থেকে বেশি ইউনিভার্সাল ও এ্যাবস্ট্রাক্ট কোনো শিল্প আছে কি? কারণ সুরের তরঙ্গও যে এই ছায়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। আমার তো তাই মনে হয়।

বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, আমার এই তত্ত্বকথাগুলি আমি ঠিক মতো বুঝিয়ে বলতে

পারলাম কি? তবে এ আমি সার বুঝেছি। ব্যাখ্যার অক্ষমতায়, আচ্ছা, ঘণ্টা পড়ল, আজকের মতো এইখানেই শেষ করছি।

তারপর নিশানাথ বুঝল আসলে দমকলের ঘণ্টা বাজছে। একটা চকিত কোলাহল। সে যারপরনাই বিরক্ত হলো এবং এতক্ষণে লক্ষ্য করল পায়ের কাছে একটা রোমাল পড়ে আছে। হাত বাড়িয়ে তুলল। রোমালের গায়ে সুঁচ দিয়ে লেখা—আমি তোমায় ভালোবাসি।

অবাক হয়ে সে রোমালটার দিকে তাকিয়ে রইল। যেন কোনো অজ্ঞাত-লিপি পাঠ করছে। ভালোবাসা? আমি? তোমায়? ওর মনে পড়েছে। একটি প্রেমিকা নির্জনতা খুঁজে তার ভালোবাসার মানুষটিকে, অতঃপর আমি, বোঝো কাণ্ড। নিশানাথ—পুরাণ, মহাকাব্য এবং ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে শিল্পের রাজ্যে এই যে তুমি অধীশ্বর হয়ে বসে আছ—এখানে রোমান্স আর ভালোবাসা কিভাবে ছিটকে এলো। আহ্ অশ্লীলতা।

নিশানাথ অত্যন্ত করুণাপরবশ হয়ে রোমালটি ছুঁড়ে বেড়ার বাইরে ফেলে দিল।

তারপর আবার সেই পুকুরটা। এবার তাতে একটা ধাবন্ত ডবলডেকারের ছায়া পড়ল। স্পষ্ট ছায়া। একতলার আধখানা দেখা যায় দ্বিতল সম্পূর্ণ। সারি সারি মাথা, জানলায় মুখ, হাতের কনুই। দ্রুত অথচ দূরাগত কোনো সুরধ্বনির মতো ভাসতে ভাসতে চলে গেল। আর আবার সেই অলৌকিক প্রাসাদ, রুদ্ধ গবাক্ষ, জটিল সিঁড়ি এবং কুঞ্চিত কেশদামে ছাওয়া জলও লাল, হলুদ, নীল বর্ণ জ্বলছে, নিভছে।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের পৌরাণিক কণ্ঠ শুনতে পেল। এলসিনোয়ের প্রাকারে একাকী দণ্ডায়মান ডেনমার্কের যুবরাজের বিষণ্ণ অথচ উদ্ধত কণ্ঠ শুনতে পেল। গাছের অতিকায় ছায়া, পাতার গায়ে গায়ে আকাশ আর নক্ষত্র—দিঘির একধারে বিষণ্ণ, ক্লান্ত অথচ হিংস্র কয়েকটা গুহাচিত্রের মতো দিঘির একধারে পড়ে আছে। জল সেখানে স্থির। জীবন সেখানে স্থির। সময় সেখানে স্থির। নিশানাথ দেখল পুকুরের একদিকে ধাবমান ইতিহাস, অন্যদিকে স্তব্ধ সময়। পৃথিবীর দর্পণের সামনে বসে আছি আমি ইতিহাসের বিধাতা।

নিশানাথ সেই প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হা-হা করে হাসতে লাগল। আনন্দে নয়, বিষাদেও নয়, বস্তুত স্পষ্ট কোনো লৌকিক অনুভব তখন তার ছিল না। তারপর হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। এবং

কাঠের বেড়া টপকে শিথিল পায়ে মাঠের প্রায়ান্ধকার পথটুকু অতিক্রম করে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

আব সে অনুভব করল ক্লান্তি, ক্লান্তি। আলোয উদ্ভাসিত চৌরঙ্গীর পথে এসে দাঁড়াতেই আবাব কেমন যেন একটা ভয়ে তাব গা ছমছম করছে। ঐ লোকটা বাস থেকে আমার দিকেই তাকাল কেন? অথচ, আহ্, অথচ এতক্ষণ কি নির্ভয় নিশ্চিন্ততায় সময় কেটেছে। নিশানাথ থুথু ফেলল।

অতঃপব?

বাড়ি।

অতঃপব্?

জানি না।

কেন?

জানি না।

কেন?

জানি না।

কেন?

জানি না।

বাড়িতেই যাবে?

হ্যাঁ।

কেন?

জানি, কিন্তু বলব না।

নিজেব ভাঁড়ামিতে নিজেই অতীব পুলকিত হয়ে নিশানাথ তারপব লাফিয়ে উঠল।

পাঁচ

ভিড় ছিল। নিশানাথ কোনোবকমে সিঁড়িতে উঠে দাঁড়াল। দোতলার মুখটাতেও জিলিপির মতো এক জটলা। খুব অন্তরঙ্গ স্বরে লোকগুলো একটা হিন্দি ফিল্মের আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক বিদেশী বাষ্ট্রনায়কেব সাম্প্রতিক ভাবতভ্রমণ ও কি-এক নটীর সঙ্গে তাঁর রোমাঞ্চকর প্রণয় কাহিনী বিষয়ে নানা বসসিক্ত মন্তব্য করছিল। বম্বে শহবটা যে উচ্ছন্নে গেছে এবং বড় বড় হোটেল যে যাবতীয় আন্তর্জাতিক নোংরামির একটা ঘাঁটি—এ সম্পর্কে কারোর সংশয়

ছিল না। তাদের প্রত্যেকের বাচনভঙ্গীতে প্রত্যক্ষদর্শীর অমোঘ নিশ্চিতি ও ত্রিকালজ্ঞের নিশ্চয়তা সর্বদাই জাগরূক ছিল।

এমন সময় তাদের মধ্যে একজন ছিটকে সামনে এগিয়ে গেল। নিশানাথ গলা বাড়িয়ে লক্ষ্য করল এক ভদ্রলোক সীট ছেড়ে উঠেছেন আর লোকটা তাঁর ত্যক্ত জায়গা দখল করার জন্য—প্রায় তাঁকে মাড়িয়ে দিয়েই সেখানে বসে পড়েছে।

দিলেন তো মাড়িয়ে? ভদ্রলোক ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, সেই তো আগে-পরে নামতেই হবে—বসার জন্য—

লোকটা উত্তর দিল, আমিও নামবার সময় লোককে এই সব বলেই নামব।

সকলে হেসে উঠল। ভদ্রলোক গজগজ করতে করতে নিচে নামছেন, নিশানাথের ইচ্ছে হল তাঁকে একটা চড় মারে। ভদ্রলোক একটা ঝগড়া করতে পারতেন, ঘুষা দিতে—মানে, কাওয়ার্ড। লোকটা অন্যায় করেও, আর তুমি মুখ বুজে—বাঙালী কোথাকার।

নিশানাথ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, দিলেন তো মাড়িয়ে?

ভদ্রলোক নামতে নামতে দাঁড়িয়ে বললেন, কই, আমি তো—

নিশানাথ বলল, সেই তো বাড়িতেই যাবেন, তবে এত তাড়াহুড়ো করে লোককে মাড়িয়ে—

ওপর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, আহ্, ঘরে বউ আছে না?

আবার সকলে হেসে উঠল। একতলার দরজার মুখে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারাও হেসে উঠে সেই নিরীহ ভদ্রলোকটির মুখের দিকে তাকাল।

অকারণে, সম্পূর্ণ অকারণে ভদ্রলোকটি সকলের কৌতুকের পাত্র হয়ে অস্ফুটে বললেন, আপনার পায়ে তো—

অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় যারা হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলছিল তাদের মধ্যে কেউ বলে উঠল, দাদু বুঝি এ লাইনে নতুন? মানে বিয়ের লাইনে?

মোটেই না. আমরা তিন পুরুষে প্রস্। বারে, গঙ্গার ধারে—। মোটেই না। বারে। মোটেই না। গঙ্গার ধারে! মোটেই না। আবার ট্যাক্সিতে চাপার সখ!

উঃ। নিশানাথ অস্ফুটে আর্তনাদ করল। ওপর থেকে জনা তিন-চার লোক একসঙ্গে নামছে। একজন তার পা সত্যি সত্যি মাড়িয়ে দিয়েছে।

নিশানাথ কিছু বলার আগেই লোকটা বিরক্ত কণ্ঠে বলল, ধ্যাৎ মশাই, দাঁড়াবার আর জায়গা পেলেন না? যতোসব।

সেই বিপজ্জনক জায়গা থেকে ঝুলতে ঝুলতে কেউ একজন বলল, দাদু বুঝি এ লাইনে পুরনো, মানে বাসের লাইনে? সিঁড়ি যে কিছুতেই ছাড়তে চান না?

নিশানাথ চোরের মতো ওপরে উঠে গেল। এরা এখুনি আমায় নিয়ে পড়তে পারে, এমনিভাবে হেসে উঠে হেসে উঠে হেসে উঠে, এবং, এমনিভাবে, অবশ্য প্রতিবাদ করা উচিত ছিল, আমিও ঐ লোকটাকে শুধু শুধু, আসলে আমি তো জানি কি অকারণে আর উপলক্ষ তৈরি করে মানুষ অন্যকে অপমান করে, তার প্রতি মুহূর্তে লাঞ্ছিত-অপমানিত অস্তিত্বকে সে এইভাবে খানিক হাল্কা করার সুযোগ খোঁজে। অপমানিত হওয়া আর অপমান করা—এই তো আধুনিক জীবন।

মরুকগে। একটু মদ খেলে হতো। কতকাল যে—ভাবনার মধ্যেই নিশানাথ বিস্মিত, আনন্দিত ও চিন্তিত হয়ে পড়ল। কারণ একটু আগেই সে বেশ্যাটার (সরি, বারবণিতার, উঁহু, বারবধূটির) কথা ভেবেছে যার সঙ্গে আজই সন্ধেবেলা (আহ্, বামের কি কুৎসিৎ গন্ধ) একটা পাঠশালায়—অথচ খ্যাখো, কোনো স্মৃতি নেই। যেন স্বপ্নে দেখা কিংবা বইয়ে পড়া কোনো একটি মেয়ের কথা সে ভাবছে। যেন কত, কতদিন আগে শেষ মদ্যপান করেছে। এবং এই বিস্ময়েই তার আনন্দ। বিস্মৃতিতে তার আনন্দ। একদা চেষ্টা করে ভুলতে হতো, ভান করে ভুলতে হতো। আজকাল যখন সত্যিই ভুলে যায়, তখন নিশানাথ পুলক বোধ না করে পারে না। আমি তো বিস্মৃতিই চাই। স্বতঃস্ফূর্ত অনায়াস ও আন্তরিক বিস্মৃতি। এই বর্তমানটাকে ভুলে যাওয়া। কিন্তু হঠাৎ মদের তৃষ্ণা কেন? অজ্ঞাতে আমার মধ্যে কি মদ ব্যাপারটা চাবিয়ে যাচ্ছে? আসক্তি মাত্রেই নিশানাথের ভয়। সাবধান নিশানাথ, বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, আমি হয়তো ঠিকমতো, কিন্তু, আসলে, অপমানিত হতে হবে, সমস্ত অপমান মাথা পেতে নেব, আর এইভাবে সভ্যতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। অপমানে আমার ভয়। তাই প্রতি মুহূর্তে অপমানিত হয়ে আমি এইভাবে নিজের ভয় ভাঙ্গাব। কারণ আমার মতো এক অলীক অস্তিত্বের কোনো ভয়ই সাজে না।

অবশ্য এই ভয়কে আপনারা মহৎ ভীতিও বলতে পারতেন। আসলে

এ হলো নিজের জন্য ভয়, নিজেকে ভয়। মানুষের সভ্যতার জন্মলগ্নে ছিল এই ভয়—নিজের জন্য, নিজেকে। প্রতি মুহূর্তের বিচারে নিজেকে যাচাই করা, প্রতিটি আচরণে আর ভাবনায় আর প্রতিক্রিয়ায় নিজেকে যাচাই করা। এবং পরিপার্শ্বের হাতে চড় খেতে খেতে—

নিশানাথ ভয়ে কুঁকড়ে উঠল। হঠাৎ থাপ্পড় মারতে উদ্যত হাতের বাতাস লাগালে শরীরের তাবৎ স্নায়ু যেভাবে কুঁকড়ে যায়। তারপর বুঝল, কণ্ডাক্টর পিঠে হাত রেখে টিকিট চেয়েছে।

নিশানাথের এই এক আশ্চর্য অবসেশান আছে। মাঝে মাঝে সে এই ভাবে চমকে ওঠে আর তার মনে হয় সকলের সামনে পরিচিত-অপরিচিত যে কোনো পরিবেশে কে যেন তাকে হঠাৎ একটা চড় মারবে। আর নিশানাথ যখন তারপরও মাথা হেঁট করে থাকবে তখন চারপাশের সবকটা চোখ একসঙ্গে হেসে উঠবে।

টিকিট ?

নিশানাথ পকেট থেকে পয়সা বের করে দিল।

আমি যেন কি ভাবছিলাম ? কি যেন—সভ্যতা, মরুকগে। বিরক্তভাবে নিশানাথ পকেট থেকে রোমাল বের করে চশমার কাঁচ মুছল।

যদি এই জানলাটার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকি, তবে অবশ্য হাওয়া পাব আর হাতটা আরামে এলিয়ে রাখতে পারব। বস্তুত, দাঁড়িয়ে যাওয়ার পক্ষে এই জায়গাটাই সব থেকে প্রশস্ত। কিন্তু এরপর যদি একটা দুটো সীট খালি হয় তাহলে এপাশে যারা দাঁড়িয়েছে, তারাই বসবে। তাদের জায়গায় সিঁড়ির লোকগুলো উঠে এসে দাঁড়াবে এবং নতুন সীট খালি হলে সেখানে তারা বসবে। সুতরাং আমি যদি সরে ওখানে দাঁড়াই আর কিছুক্ষণ কষ্ট করি—তাহলে পরে বাকি পথটা বসে যেতে পারব। অবশ্য সবটাই চান্স। যদি ইতিমধ্যে কেউ না নামে ?

নিশানাথ চোখ তুলে যাত্রীদের মুখের দিকে বই পড়ার মতো করে তাকাল। আর হঠাৎ আবার সেই দৃশ্য দেখল। একটি লোক বসেছিল, কণ্ডাক্টর তার কাছে টিকিট চাইল, লোকটা চোখ তুলে ঠোঁটটা একটু নাড়ল। কণ্ডাক্টর পাশের লোকটির সামনে হাত পাতল।

বন্ধুগণ, বাসে দু-ধরনের লোক টিকিট না করার অধিকারী। এক, যারা স্টেট ট্রান্সপোর্টে চাকরী করে। তাদের পোষাক দেখলে আপনি চিনবেন। সাদা পোষাকে থাকলেও তারা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করে, স্টাফ।

অনেক সময় তাতেও বিশ্বাস না করে কণ্ডাক্টররা কার্ড দেখতে চায়। আর, দুই—যারা পুলিশের লোক। এরা টিকিট চাইলে এমনিভাবে ঠোঁট নাড়ে, যেন গোপনে কিছু বলছে। অথচ কিছুই উচ্চারণ করে না। এদের ভঙ্গিতেই কণ্ডাক্টররা বুঝে ফেলে।

আপনি জানেন না কলকাতা শহরে পুলিশ তার জাল কিভাবে ছড়িয়েছে, ছড়াচ্ছে। আপনি জানেন না সমস্ত পৃথিবীতে কিভাবে এই সূক্ষ্ম আর অদৃশ্য আর নিয়তির মতো নিষ্ঠুর জাল ছড়ানো আছে। আপনি জানেন না, প্রতি মুহূর্তে কেউ না কেউ আপনাকে লক্ষ্য করছে আর খাতায় তা লেখা হয়ে যাচ্ছে। তারপর একদিন আপনার ডাক পড়ল আর সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা মানুষের মুখে আপনি নিজের তাবৎ জীবন প্রত্যক্ষ করে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বন্ধুগণ, যে দেশ যত সভ্য—তার এই জাল তত সূক্ষ্ম আর বিস্তৃত আর জটিল। মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদানই হল বিচার ব্যবস্থা—যার ভিত্তি অসংখ্য আইন এবং অবলম্বন হল অসামান্য প্রহরা।

আর ত্যাখো, ট্রামে-বাসে আমি এমন দিন দেখি না, যেদিন অন্তত একবার এই ধরনের পুলিশের লোক চোখে না পড়েছে। আমি ভীষণভাবে চেহারা-গুলো মনে রাখতে চাই। কিন্তু এদের চেহারার বৈশিষ্ট্যই হলো বিশিষ্টতা-বিহীন হওয়া। ফলত কাউকে মনে থাকে না। হয়তো তারই সঙ্গে রেস্তোঁরায়—নিশানাথের উরু দুটো জ্বালা করে উঠল এবং বস্তুত বুকটা থরথর কাঁপতে লাগল।

অবশ্য এখন তো আমি একা। অবশ্য আমি তো আমার অতীতকে অস্বীকার করি। অবশ্য আমি তো এখন বর্তমান ভুলে যাই। অবশ্য আমি তো কতকাল, আহ্, কতকাল সেই নিশানাথ নই—তার ছায়া—

ছায়া সম্পর্কে আমার—। কিন্তু না, ভালো লাগছে না। টু কনটিনিউ, সুতরাং, আমার ভয়ের কি কারণ আছে। সারা দুপুর ঘুমিয়েছি। তারপর সন্ধেবেলা বেরিয়ে প্রথমে দাড়ি কামালাম। তারপর চা খেলাম। না না, সারা দুপুর ঘুমিয়ে, তারপর সন্ধেবেলাকে প্রভাত বলে ভুল করলাম, তারপর চা খেলাম। তারপর দাড়ি কামালাম, তারপর বাসে করে মদ খেতে গেলাম (মানে সেই মেয়েটা আমায় টেনে নিয়ে গেল), তারপর পুকুরের ধারে বসে—ও হ্যাঁ, একটি প্রেমিক-প্রেমিকাকে অপমান করলাম (কারণ একদা আমিও ঠিক এইভাবে অপমানিত হয়েছিলাম, সেই পৌরাণিক যুগে, যখন সুনয়নী, মানে একদিন যখন প্রেমিক ছিলাম), অবশ্য সেই বালক-বালিকা জানল না

আমি পরোক্ষভাবে তাদের কি উপকার করেছি, নইলে ঐখানে বসে গল্প করার দরুন তাদের কপালে আরও কি দুর্ভোগ জুটতে পারত। বস্তুত স্বীকার করতে লজ্জা নেই—আমি ইচ্ছে করেই ওদের ওখান থেকে তুলে-ছিলাম, অবশ্য তুমি বলতে পারো ঈর্ষায় বা হতাশায় বা ব্যর্থতার গ্লানিতে। (কিন্তু তুমি তো জানো সুনয়নী, তুমি জানো না আমি, হ্যাঁ, আচ্ছা, ও না না,—বিশ্বাস করো, হায়, এ্যাঁ, হুঁ, এ্যাঁ, হুঁ, এ্যাঁ, আচ্ছা।) কিন্তু পুকুরের ধারে ছায়া দেখতে দেখতে—সর্বনাশ, ইনিয়াস প্রায়ামের ছেলে নয় ভাইপো, আমি তখন কি ভাবছিলাম? কিন্তু এমনও তো হতে পারে আই-বিব লোকটা সারাদিন কাজ করে এখন বাড়ি ফিরছে। এখন ও কাউকে ওয়াচ করছে না। কি ভাবে লোকটা? (সরি ভদ্রলোকটি?) কি এঁরা ভাবতে পারেন? কেমন হয় এঁদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন?

এমন সময় কাছের একটা সীট থেকে জনৈক ভদ্রলোক উঠবার উপক্রম করতেই নিশানাথ যাবতীয় ভাবনা ঝেড়ে ফেলে অত্যন্ত সতর্ক ও হিসেবী বাঙালীবাবুটির মতো সামনে দাঁড়ানো জনাদুই লোককে পাশ কাটিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সেই ভদ্রলোকটি আসলে নামবেন না, তিনি একটু উঁচু হয়ে পাশ পকেট থেকে একটা নস্যির ডিবে বার করে সশব্দে এক টিপ নস্যি নাকে গুঁজলেন। বারবার অত্যন্ত পরিষ্কার একটা রোমাল দিয়ে নাক আর আঙুলের ডগা মুছে আবার সীটের পিঠে এলিয়ে পড়লেন।

নিশানাথ প্রথমে অপ্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণে ভদ্রলোকের রোমালখানা দেখে অত্যন্ত ঘাবড়ে গেল। নস্যিখোরদের রোমাল সর্বদাই নোংরা হয়। ফ্রান্সের অভিজাত মহিলারা কি ভাবে নস্যি নিতেন, নিশানাথ তা কিছুতেই ঠাওর করে উঠতে পারে নি। বস্তুত ব্যাপারটা একসময় তার কাছে প্রব্লেম ছিল। মোগল রমণীর ফর্শি টানার মধ্যে যে অসামান্য আভিজাত্য আর মহিমা আছে, তার সঙ্গে শব্দ করে নস্যি টানা আর নাক মোছার তুলনা কোথায়? কিন্তু এই ছাপোষা বাঙালীবাবু যদি নিয়মিত নস্যি নিয়েও এমন পরিচ্ছন্ন রোমাল ব্যবহার করতে পারেন, আচ্ছা, তাহলে নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের রোমাল লাগে প্রচুর, সি. আর. দাসের রোমাল প্যারিস থেকে কেচে আসত, আমি জীবনে রোমাল ব্যবহারে অভ্যস্ত হলুম না—কোথায় যে হারিয়ে যায়, 'আমি তোমায় ভালোবাসি'—অহো, অহো, প্রণয়জ্ঞাপনের কি গ্রাম্য পন্থা, মেয়েটি যখন বিয়ে করবে আর গর্ভিনী হবে

তখন চটের ওপর পাড়ের সুতো আর ছুঁচ নিয়ে লিখবে 'পতি পরম গুরু' এবং ভাববে (আবছা ছবির মতো, প্রায় বিস্মৃত স্বপ্ন যেন) একদা প্রেমিককে যে রোমালটি লিখে দিয়েছিল তার কথা, সেই রাতের কথা, যখন একজন লম্পট হঠাৎ এসে—, কিন্তু ভ্যাখো, বন্ধুগণ, ও—আপনি বলতে চান আধুনিক মেয়েরা সূচীশিল্প জানে না বা এ জাতীয় আপ্তবাক্য ঘরের দেওয়ালে টাঙাতে তাদের, বেশ তো, আমি তাতে আপত্তি করতে যাব কেন? মাপ করবেন স্যার, সাম্প্রতিক রমণীদের সম্পর্কে নিন্দা বা প্রশংসায় মুখর হতে আমি অনীহা (ওহ্, শব্দটা একবার ব্যবহার করেছি—বেশ, তাহলে বলি), মুখর হতে আমি বিবমিষা বোধ করি। বিবমিষার সঙ্গে নিশার একটা ধ্বনিসাদৃশ্য আছে লক্ষ্য করেছেন? আসলে রাত্রি মানেই তো বমন জাগরণে বা নিদ্রায় বমি করতে করতে করতে করতে—আরে, এই ভদ্রলোক উঠেছেন।

অতঃপর নিশানাথ সেইখানে বসল। ভদ্রলোক জানলার ধার থেকে উঠেছেন, নিশানাথ কাৎ হয়ে সেইখানে ঢুকতে যাবে এমন সময় সীটের দ্বিতীয় ব্যক্তিটি গম্ভীরভাবে সরে সেই জায়গাটা দখল করলেন এবং নিশানাথ হতবাক হয়ে লক্ষ্য করল একটু আগে পুলিশের এই লোকটিকেই সে দেখছিল।

তখন তার গা ছমছম করতে লাগল। লোকটা সরে বসে এমন ভুরু কুঁচকে কেন দেখছে আমাকে? লোকটা কি চেনে? নাকি আমি জানলার ধারটা বেদখল করতে চাওয়ার কারণে বিরক্ত হয়েছে? নিশানাথ স্পষ্টত তার দিকে তাকাতে পারছে না। আসলে সে ভয় পেয়েছিল। কিন্তু ভদ্রতার প্রশ্নও একটা ছিল।

সে পাশের লোকটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। আর দেখল কাঁচে ডান দিকের গোটা বাসে ছায়া পড়েছে। মনে হচ্ছে ওপারেও একটা এমনই দোতলা। জানলাটা আসলে পার্টিশান মাত্র।

আর সেই ছায়ায় দেখা গেল কতগুলো সীটের পিঠ ও মানুষের মাথা। বাসের ছাদের ভাঁজে লাগানো বাতি কটা নিষ্প্রভ। কেন জানি তার মনে হলো সে এক বিচার কক্ষ দেখছে। বিচারকের উঁচু পাটাতনটি নেই, কাঠ-গরাদ নেই, জুরিদের টেবিল নেই। বিচার কথাটি চলছে। তাদেরই সঙ্গে চলছে।

যাত্রীদের নানা ধাঁচের আলাপ, পথে বিভিন্ন ধরনের গাড়ীর হর্ণের বা দ্রুত চলে যাওয়ার বা হঠাৎ ব্রেক কষার শব্দ, জানলা দিয়ে বাঁ দিকের পথের আলো

বাড়ি সাইনবোর্ড, দেওয়ালে পোস্টার মানুষ আর আমি আর আপনি পাশা-পাশি বসে যাচ্ছি। আপনি জানেন না আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি, নিষ্ঠুরের মতো আপনাকে লক্ষ্য করছি। আপনি চোখ তুলে কখনোই জানলার কাঁচে তাকাবেন না। আপনি জানবেন না আপনার বাঁ দিকে একটি জলপূর্ণ বিচার কক্ষ, ডান দিকে নিয়তি। আপনি কি এখন গৃহে প্রত্যাগমন করছেন ? সারাদিন কজনকে ফাঁসালেন স্যার ? এখন ক্লান্ত ও নিশ্চিন্ত মনে, ভালো কথা আপনার স্ত্রী খোঁপা বাঁধতে ভুল করলে তাঁর নামেও রিপোর্ট পাঠান কি ? প্রিয়গোপাল আত্মহত্যা করার পর যখন আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল তখন যে খাতাটিতে আমার বিষয়ে যাবতীয় খবর লিপিবদ্ধ ছিল—তার কতটুকু আপনার সংগ্রহ বলবেন ? হা হা হা, নিশানাথ জানলার কাঁচের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। কখন তার হাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠেছে। সাধারণ্যে নিয়ত যে-হীনমন্যতা বোধ করে কখন তা কাটিয়ে উঠে হারানো প্রত্যয় ফিরে পেয়েছে। নিশানাথ অতীব, অতীব পুলকিত বোধ করছে। হা হা হা, আপনি ধরা পড়ে গেছেন। এক অনড় বিচারকক্ষে প্রতিদিন শত শত লোককে অভিযুক্ত করছেন আর এই দেখুন সচল বিচারা-লয়টি আপনারই পাশে পাশে ছুটছে। হঠাৎ ঘণ্টা পড়বে, হঠাৎ শুনবেন আপনার দণ্ড ঘোষিত হয়ে গেছে। হঠাৎ লক্ষ্য করবেন—আপনি হাঁটু গেড়ে বসেছেন। আচ্ছা, বিদায় আমি এখন চলি। আমার গন্তব্য এসে গেছে।

তারপর নিশানাথ হুড়মুড় করে নিচে নামতে নামতে বাস স্টপেজ ছেড়ে দিল। এক জোড়া স্বামী-স্ত্রী উঠে এক তলায় ঢুকছেন। কণ্ডাক্টর জোরে জোরে বেল বাজিয়ে বাসের দেয়ালে দ্রুত কটা চাঁটি মেরে ড্রাইভারকে বোঝাচ্ছে, জোরে চল। নিশানাথ রানিং বাস থেকেই লাফিয়ে নেমে পড়ল।

মাটিতে পা দিয়েই তার বাড়ির কথা মনে পড়ল। আশ্চর্য এই যে, বাসে সে উঠেছিল বাড়ি ফিরবে বলে। কিন্তু তখন বা সমস্তটা পথ ক্ষণতরে নিশানাথ তাদের বাড়িটা বা মা-বা কারোর কথা ভাবে নি। অথচ পানের দোকান আর গলির মুখখানা চোখে পড়তেই তাবৎ খুঁটিনাটিসহ বাড়ির ব্যাপারটা তার চোখের সামনে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল।

আর মনে পড়ল সে মদ খেয়েছে। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অন্য-মনস্কতার ভান করে ডান দিকে তেরছাভাবে মুখ ঘুরিয়ে পান চাইল।

দোকানীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চাইল না, কারণ জানত কথার সঙ্গে মদের গন্ধ পলকে লোকটার শিক্ষিত নাসাকে সচেতন করবে।

অতঃপর পানের খিলিটা মুখে পুরে হাত পাতল, দোকানী কিছু জর্দা আর কুচো সুপুরি তার প্রসারিত করতলে রাখল এবং মুখে বলল, কিছুটা বা লজ্জিত হয়ে বলল, 'দু টাকা হল বাবু'। 'ও'। নিশানাথ উদাসভাবে উত্তর দিয়ে সিগারেটের জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে চমকে হাত বার করে নিল।

পানঅলা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি বাবু? মাকড় ঢুকেছে?' নিশানাথ কোনোক্রমে বলল, 'চারমিনার দাও তো এক প্যাকেট। একটা ম্যাচিসও'—তারপর থতমত খেয়ে থেমে গেল। নিশানাথ জীবনে এই প্রথম দেশলাইয়ের বদলে ম্যাচিস শব্দটি উচ্চারণ করল আর হঠাৎ চোখের সামনে দেখতে পেল মাথার ওপর উত্থিত অলীক দুটো হাতে প্রাণপণে ঝুমঝুমি বাজানো হচ্ছে। নিশানাথ দেশলাইটা সন্তর্পণে নিয়ে তাড়া খাওয়া আর শেকলে বাঁধা একটা জন্তুর মতো গলিতে ঢুকল।

আর সেই অলৌকিক ভয় ও উত্তেজনাটা ক্রমশই তাকে পেয়ে বসছে। পথের দিকে তাকাল—না, খইয়ের ছিটে নেই। এ পথে তাহলে কোনো মৃতদেহ যায় নি। মিষ্টির দোকানটায় যথারীতি পরের দিনের জন্য নানা জাতীয় খাবার তৈরি হচ্ছে। সেই ভুঁড়িয়ালা লোকটা নিশানাথকে দেখেই রোজকার মতো একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। নিশানাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে বুঝে নিতে চাইল—বাড়িতে কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকলে নিশ্চয়ই রোজকার চোখে আমাকে দেখতে পারত না। নিশ্চয়ই এর চোখে অন্য ভাষা ফুটত। সেই রোয়াকে এ-বাড়ি সে-বাড়ির চাকরগুলো গল্প জুড়েছে। এরাও একবার নিশানাথের দিকে তাকিয়ে নিজেদের গল্পে জমে গেল। যত বাড়ির কাছে যাচ্ছে…ততই নিশানাথের উত্তেজনা প্রবল হচ্ছে। সেই আলো-অন্ধকারে মাখানো অর্ধ জাগরিত পথটা বলছে…না, না। আর সেই অমোঘ সম্ভাবনার কথা ভেবে তার তাবৎ স্নায়ু ও অনুভব পর্বত চূড়ার মতো তীক্ষ্ণ, একাগ্র হয়ে উঠেছে। ফলে তার জানু দুটো জ্বালা করছে, নিঃশ্বাস অনিয়মিত, রক্ত চলাচল দ্রুত ও হাত মুষ্টিবদ্ধ। তার দুটি কান উৎকর্ণ, ক্ষীণ ক্রন্দন ধ্বনি দূর থেকে কি শোনা যায়?

এই ভাবে প্রায় সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থের মতো (যদিও বাইরে তার চলনে বা চাহনিতে তার আভাষমাত্র ছিল না) নিশানাথ বাড়ির সামনে এসে

দাঁড়াল এবং দরজা ঠেলার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ শুনে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেই বুঝল যাকে সে কান্না ভেবেছিল আসলে তা এক দমক হাসি।

নিশানাথ বাড়ির অন্ধকার দেউড়ির সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমত বুঝল— কোনো ঘটনা ঘটে নি। দ্বিতীয়ত, দাদা ইত্যাদি জেগে এবং তৃতীয়ত, কিছু একটা আমোদের ব্যাপার হয়েছে।

বস্তুত নিশানাথ অনেকদিন হঠাৎ হাসি, হঠাৎ চেয়ার ঠেলার কর্কশ শব্দ, হঠাৎ কুকুরের ডাক শুনে প্রথম পলকে কান্না ভেবে প্রচণ্ড স্নায়ুবিক আঘাত পাবার পর তার স্বরূপ বুঝেছে। আর, সারাটা দিন-মান যখন বাড়িতে থাকে বা বাইরে—একবারও বাড়ির কথা মনে পড়ে কি পড়ে না। কিন্তু রাত্রিবেলা গলির মোড়ে এসে দাঁড়ালেই তার তাবৎ স্নায়ু ও অনুভূতি তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কুকুর যেমন বাতাসে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আসে তেমনই নিশানাথ তার চোখ কান ইন্দ্রিয় দিয়ে একটা অমোঘ মৃত্যুর গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বাড়ি ঢোকে।

কারণ সে জানে যে-মানুষ শত বৎসর পরমায়ু পেয়েছে, তার মৃত্যুক্ষণটিও একটি মুহূর্ত মাত্র। মানুষ মরবেই এবং যে কোনো সময়ে তার বিনাশ ঘটতে পারে স্নতরাং কতগুলো অনিবার্য মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এই আমাদের দুঃখ সুখ, গ্লানি বোমাক ইত্যাদি। এমনও হতে পারে এই যে আমি এখানে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে হাসির তরঙ্গে এখনকার মতো নিশ্চিন্ত হলাম—এও এক মিথ্যা। হয়তো ঠিক এই মুহূর্তে, ঠিক এই এখন, বাবা তার ঘরে কিংবা মন্টু তার বিছানায়—এই যাঃ, আজও ভুলে গেছি।

নিশানাথ দ্রুত তার ঘরের দিকে পা চালাল। এই যে ছোট্ট পথটুকু হেঁটে আসতে আসতে আমি সহস্র মৃত্যুর অভিজ্ঞতা পার হয়ে এলুম, এই যে বাকি রাতটুকু নানান ধরনের শব্দ শুনে আমি চমকে চমকে উঠব এবং তার স্বরূপ আবিষ্কার না করা পর্যন্ত কয়েকটি সেকেণ্ড সেই শব্দের ধাক্কা আমাকে আরো কয়েকটা মৃত্যুর স্মৃতি বা ভবিষ্যৎ বিনাশের অনিবার্য সম্ভাবনার পাঁকে চুবিয়ে দেবে—এ কেন? আমি কি মরতে ভয় পাই? না বোধহয়। আমি কি জীবন ভালোবাসি? উহুঁ, বাসি না। আমি কি পৃথিবীর ভবিষ্যতে বিশ্বাসী? কদাচ নই।

তাহলে এ আমার কাপুরুষতা। যে জানে জন্ম মুহূর্তে জীবন-মৃত্যুর ক্রীড়নক হলো, যে জানে জীবন কতগুলি দুর্ঘটনার সমাহার মাত্র, যে জানে

সভ্যতা ভূমিষ্ঠ হয়েছে মানুষের অপরিমেয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার পাপে আর তার প্রায়শ্চিত্ত হবে অনিবার্য আত্মহননে, ইতিহাস যার কাছে উচ্চাঙ্গের পরিহাস, মানবিক মূল্যবোধ যার চোখে অপরিচিত ভাষার স্বরলিপি, সভ্যতা যার আত্মাকে গ্লানি গ্লানি গ্লানিতে চুবিয়ে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করছে। যার প্রেম নেই, শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাস নেই, বিশ্বাসহীনতার স্পর্ধা নেই; এই বর্তমানটা যার কাছে অজ্ঞাত স্বপ্ন এবং যে বেঁচে আছে এক অলৌকিক ছায়ার জগতে একা, একেবারে একা—সে প্রতিদিন বাড়িতে ঢোকার সময় রুদ্ধনিশ্বাসে পিতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ শোনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে, যে পিতায় তার ঘৃণা, যে ভাইপোটাকে সে নিয়ত প্রতারণা করছে, হায়। জীবনে যার স্বাদ নেই, মৃত্যুকে তার কত ভয়।

নিশানাথ নিজেকে অবজ্ঞা করল, অপমান করল, আজই সন্ধেবেলা সে রক্তে আসঙ্গলিপ্সা বোধ করে যারপরনাই বিস্মিত ও দুঃখিত হয়েছিল। এখন নিজের এই মৃত্যুভীতিকে তার থেকেও বেশি অশ্লীল মনে হলো। এই যে অনির্দিষ্ট উৎকণ্ঠা, হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড বিপর্যয় ঘটে যাবে—তার জন্য জাগরণে নিদ্রায় সর্বদা উত্তেজিত থাকা—এতদিন সে একে সভ্যতারই এক ব্যাধি বলে ঠাউরেছে। কিন্তু আজ প্রথম মনে হলো—বাড়ির এত লোকের মধ্যে বাবা এবং মন্টুর মৃত্যুর আশঙ্কাই সে করে কেন? বাবার প্রতি তার যাবতীয় ঘৃণা কি করুণায় রূপান্তরিত হয়েছে, যেদিন থেকে মা—ও, হ্যাঁ, তার মা আছে বটে। আর মন্টু শিশু, মন্টু প্রায় প্রকৃতির মতোই নিষ্পাপ এবং অসহায়—মন্টুর বাঁচা উচিত বলেই মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নেবে—এ কারণেই কি মন্টু সম্পর্কে তার উৎকণ্ঠা নয়? এর পেছনে মন্টুর জন্য একটা সূক্ষ্ম প্রীতি বা আকর্ষণ ক্রিয়া করে নি? কি আশ্চর্য, আমি কি মন্টুকে—আর দেখেছো, সেই ছেলেটা—যে বলেছিল ঠিকানা লিখে দিচ্ছে—তাকে যে আমার পছন্দ হতো, তার পেছনেও কি অবচেতনায় মন্টুর প্রভাব ক্রিয়া করে নি? যে স্নেহ আমি মন্টুকে জানাতে লজ্জা পাই—তা-ই কি কিছুটা স্থূলভাবে আমি এতদিন চায়ের দোকানের ছেলেটাকে বিতরণ করে অজ্ঞাতে নিজের কাছে হাল্কা হই নি? ধন্য নিশানাথ, তুমি শিশুদের ভালোবাসো? অহো, অহো, এ একটা সন্দেশ বটে।

খুট করে আলো জ্বালল। প্রায় একই সঙ্গে রান্নাঘরে আবার একটা হাসির শব্দ উঠে মাঝপথে থেমে গেল। বারান্দায় নিশানাথের ঘরের আলো পড়ায় এরা বুঝেছে সে ফিরেছে। আমাকে সকলে ভয় করে, সমীহ করে,

ঘৃণা করে। নিশানাথ হঠাৎ হাসি থেমে যাওয়াটা অত্যন্ত উপভোগ করল। দাদা, বৌদি, মা ইত্যাদির গলা পাওয়া যাচ্ছে। খেতে খেতে গল্প হচ্ছে। সিনেমার গল্প হচ্ছে। সিনেমার গল্প। বৌদিই বেশি প্রগল্‌ভা। মাও কি গিয়েছিল? মন্টু? মার প্রেমিকপ্রবরটি?

তার ইচ্ছে হলো ওদের সঙ্গে খেতে বসে যায়। দাদার আত্মতৃপ্ত মুখটা, বৌদির চিবুকের ভৌল ও ভুরুর পাশের আঁচিল সে স্পষ্ট দেখতে পেল। মার মুখটা কিছুতেই মনে এলো না। কিন্তু কি নিয়ে গল্প করব? কিভাবে আমি এ-রকম হেসে উঠব? আমার উপস্থিতি ওদের সহজ হালকা পরিবেশটুকু মাটি করে দেবে। আমি কতকাল হাসি না। আমি কি হাসতে ভুলে গেলাম? পরীক্ষা করে দেখব? কিন্তু একা একা এভাবে, কিন্তু একা একা একা একা একা একা, ও মনে পড়েছে—সেই যে বাসে শুনলাম কোথাকার রাষ্ট্রনেতা এদেশে সফরে এসে আমাদের এক ফিল্মস্টারের, কেন, আমি তো আজই মদের দোকানে হো হো করে, ইয়্যাও ইয়্যাও ইয়্যাও—কতগুলি ধমনী আর রক্ত নাচছে আর হৃদ্‌পিণ্ডের ছবির মতো সেই ঘরটার মধ্যিখানে দুটো অলীক হাত শূন্যে উঁচিয়ে ঝুমঝুমি বাজানো হচ্ছে, মেঝেতে পা ঠোকার শব্দ হাততালির শব্দ উল্লাসের শব্দ, আমি মদ খাচ্ছি কেন, একটি রমণীর বুক ছাইদানী, সমুদ্রবক্ষে ইনিয়াস—পেছনে কলকাতা জ্বলছে, শত শত মানুষ অলি-গলিতে ছিটকে গেল, ধোঁয়া, চাপ চাপ সাদা ধোঁয়ায় আকণ্ঠ ভরে গেল আর সকলে কাশতে লাগল, তারপর বিদ্যুৎ চমকের মতো এক ঝাঁক ঘোড়া এলোমেলো দৌড়ে গেল আর আর্তনাদ আর কোলাহল আর হত্যা।

নিশানাথ ক্লান্তভাবে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বন্ধুগণ, এইবার আমার মনে পড়বে সুনয়নীকে, আমি, আমরা—না, আমি, আমিই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। তারপর সেই বিলম্বিত, প্রাচীন, প্রবীণ ক্লান্তি ও অবসাদ আমাকে অবসন্ন করবে—একদা যা উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত, উদ্‌ভ্রান্ত করত। এই পাপবোধ, এই হীনমন্যতা এখন আমি চারিয়ে চারিয়ে উপভোগ করব। নিজেকে এখন ভাবব সভ্যতার ক্রুশবিদ্ধ যীশু। মানব ইতিহাসের যাবতীয় পাপ কাঁধে বহন করে এইবার আমি ঘুমোব। আর ভাত ঢাকা থাকবে, মা ভদ্রমহিলা দরজার বাইরে অকারণে একবার কি দুবার ঘুরঘুর করে আস্তে ফিরে যাবে, বৌদি হয়তো সাহসে ভর করে মৃদু অনুযোগের সুরে একবার খেতে ডেকে বিবেকের কাছে মুক্ত থাকবে এবং আমি আলো নিভিয়ে

দেয়ালে জানলার গরাদের যে ছায়া পড়ে, যা অবিকল একটি কাঠগরাদ, তার দিকে তাকিয়ে হয়তো সারারাত নিজেকে আর পৃথিবীকে অভিযুক্ত করব। তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে হয়ে হয়তো ঘুমিয়ে পড়ব এবং অতিকায় সব দুঃস্বপ্ন দেখব। বন্ধুগণ, এইবার আমার নিজের কাছে নগ্ন হওয়ার পালা।

নিশানাথ উঠে সিগারেট ধরাল। জামা খুলে ছুঁড়ে দিল চেয়ারের ওপর। আলো নেভাতে যাবে, হঠাৎ চোখে পড়ল টেবিলে একটা এনভেলাপ। অন্যমনস্ক কৌতূহলে, কিছুটা বা বিরক্ত হয়ে এনভেলাপটা তুলল এবং পরিচিত হস্তাক্ষরের ঠিকানা দেখে খুলেও ফেলল। তারপর ছোট্ট দু-লাইনের চিঠি পড়ল—আজ তোমার জন্মদিন, নিশ্চয়ই তা খেয়াল নেই। আন্তরিক শুভ কামনা নিও। স্বনয়।

আজ আমার জন্মদিন। আজ। নিশানাথ বিমূঢ়ের মতো চিঠিটির দিকে তাকিয়ে রইল। আজ কি বার? আজ তারিখ কত? আমার কত বয়স হল? স্বনয় কি এইভাবে আমাকে শাসন করল, অপমান করল? কিন্তু চিঠিতে তো কোন অভিযোগ নেই, অভিমান নেই। এই কি প্রেম? প্রত্যাশাহীন, শুভ কামনা, অনির্বাণ, অপরিসীম। স্বনয় কি আজ সমস্ত সন্ধ্যা আমার অপেক্ষায় ছিল? সে কি সত্যিই জানত জন্মদিনেও আমি যেতে ভুলে যাব? তাই কি আগেই চিঠি লিখে ডাকে দিতে ভরসা পেল?

নিশানাথ সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিভ্রান্তের মতো সেই চিঠিটির দিকে তাকিয়ে রইল। অক্ষর, ভাষা কতটুকু প্রকাশ করে? মেয়েলী ছাঁদের এই হস্তাক্ষর, সুডৌল আর রেখান্বিত এই দুটি পংক্তি—শিউরে উঠে নিশানাথ চিঠির কাগজটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে রাখল।

আর আলো নেভাতে এই প্রথম ভয় করল। অন্ধকারকে ভয় করল। কারণ সে জানত তাহলেই দেয়ালের বুকে জানলার শিকের ছায়া ফুটবে—কাঠগরাদের ছায়া। আজ তার জন্মদিন।

নিশানাথ বিছানায় বালিশের ওপর মুখ চেপে শুলো। আর তারপর সেই যুবকটি, সেই ইতিহাসের বিধাতা অস্ফুটে আর্তনাদের স্বরে কাকে যেন বলল, আহ্ কেন, কেন আমি জন্মালাম। কেন আমার জন্ম হল!

ছয়

ধর্মাবতার ও জুরীমহোদয়গণ, আমি শুনেছি এই কাঠগরাদের সামনে দাঁড়ালেই মানুষের স্বাভাবিক কণ্ঠ ও স্বতঃস্ফূর্ত বাক্ রুদ্ধ হয়। আমি শুনেছি ঈশ্বরের নামে সত্যভাষণের শপথ নেওয়ার অর্থ এক বিশেষ স্বরে বিশেষ ভাষায় বিশেষ ভঙ্গিতে কথা বলা। আমি শুনেছি কিছু কিছু বাক্যপ্রয়োগ এখানে অবাঞ্ছনীয় এবং কোনো কোনো শব্দ ব্যবহারের ফল আদালত অবমাননা। ধর্মাবতার, ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে বা মানুষের বিচার ব্যবস্থার মহান আদর্শকে লাঞ্ছিত করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু অনভিজ্ঞতা অসতর্ক আবেগ ও সত্যবাচনের স্পর্ধিত তাড়নায় যদি রীতিবিরুদ্ধ কিছু বলে বসি, তাহলে মার্জনা করবেন।

আমি নিজের পক্ষে কোনো উকিল নিয়োগ করি নি। জুরীমহোদয়গণ, আপনারা ভালোই জানেন এই বিচার ব্যবস্থা কি জটিল আর ব্যাপক আর সূক্ষ্ম। আবার অন্যদিকে কি সরল, একমুখী ও প্রত্যক্ষ। জুরীমহোদয়গণ, আপনারা জানেন জীববিজ্ঞানের কোন অমোঘ নিয়মে একদা প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল আর অস্তিত্বের কি অনিবার্য তাড়নায় ধাপে ধাপে মানুষ তার বর্তমান আকার ও প্রকৃতি লাভ করল। এই অযুত-নিযুত বৎসর ধরে মানুষ নানা ভাবে তার এক এবং একমাত্র প্রবৃত্তির অকুণ্ঠ পরিচয় দিয়েছে। জুরীমহোদয়গণ, পৃথিবীতে ব্যক্তি বলে কোনোদিন কিছু ছিল না, আজও নেই। ব্যক্তি—সমষ্টির যে কোনো ইউনিট মাত্র নয়, একক, একা, অথচ সার্বভৌম। মানুষের কল্পনায়ও তাই স্বর্গভ্রষ্ট হতে হয় দু-জনকে। এমনকি তার কল্পনাশক্তিও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সহ্য করতে পারে নি! ঋষি বাক্য অনুসারে এক শুধু ঈশ্বর। কিন্তু আপনারা উত্তমরূপে জানেন কোনো ধর্মেই ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত একা নন। ধর্মাবতার ও জুরীমহোদয়গণ—কী জীবনে, কি কল্পনায় এইভাবেই মানুষ সর্বদা বহু থাকতে চেয়েছে। আর একেই বলেছি তার সহজাত প্রবৃত্তি, তার জন্মগত প্রকৃতি। এবং এরই তাড়নায় একে একে পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব, যাকে বলা যায় সভ্যতা আর সভ্যতার অর্থই হলো সংগঠন। এই সংগঠনের চরিত্র ও প্রকৃতি কি বিশাল, কি ব্যাপক, কি সর্বগ্রাসী মানে মূলসঞ্চারী—তাও আপনারা জানেন। মানব সভ্যতার এমন কোনো স্তর ছিল না—যখন সংগঠন ছিল না। মানব জীবন ও কল্পনার এমন কোনো ব্যাপার নেই—যার পেছনে সংগঠন নেই। স্বর্গ-মর্ত্য-নরক জুড়ে অযুত নিযুত বর্ষে ইতিহাস

যে বহু বিচিত্র সংগঠন গড়েছে, তার নিজের জীবন ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে মানুষই তার বনিয়াদ দৃঢ়, দৃঢ়, দৃঢ়ভাবে গেঁথেছে। একেই বলি সভ্যতা।

ধর্মাবতার ও জুরীমহোদয়গণ, নিঃসন্দেহে মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান হলো বিচার ব্যবস্থা—যা এই তাবৎ সংগঠনের উর্ধ্বে অবস্থিত এক সার্বভৌম সংগঠন, জটিল, সূক্ষ্ম অথচ সর্বদর্শী। যার চোখ প্রায় নিয়তি। আমি অভিযুক্ত হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু আপনারা জানেন, নিজের পক্ষে কোনো উকিল নিয়োগ করি নি। কারণ সভ্যতার সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধে আমি বিচার ক্রয়বিক্রয়কারী কোনো সংগঠন বা তার এজেন্টের সহায়তা চাই না। এক্ষেত্রে আমি আদি ঈশ্বর—একা; স্বয়ং আত্মপক্ষ সমর্থন করব।

আপনার নাম?

নিশানাথ।

বয়স?

ঠিক জানি না।

পিতার নাম?

অবাস্তব প্রশ্ন, কারণ আপনারা তা জানেন।

ইয়োর অনার, আসামীকে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে নির্দেশ দেওয়া হোক। নইলে এই আদালত কক্ষের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হবে। আপনার পক্ষেও এই জটিল ও জঘন্যতম পাপের রহস্য উন্মোচন কঠিন হবে মনে করি।

ধর্মাবতার, কৌঁসুলী মহোদয়ের ফাইলে আমার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্যই লিপিবদ্ধ আছে। তার মধ্যে যেগুলি আমার ক্ষেত্রে তিনি নিতান্তই সঠিক বলে জানেন, সেগুলি সম্পর্কেও প্রশ্ন করে করে আপনার অমূল্য সময় হরণ করা বা আমার স্নায়ু বিবশ করা—আদালতী এই কৌশল সম্পর্কে আমি প্রথমেই আমার আপত্তি উত্থাপন করছি। কারণ জানি ভবিষ্যতে বারবার একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি হবে।

নিশানাথবাবু, আমি শুনেছি সময় সম্পর্কে আপনি এক মস্ত বিশেষজ্ঞ। আপনি বিশ্বাস করেন সময় হলো স্থির, তা কোনোদিন এবং কখনোই প্রবাহিত হয় না। তথাপি আজ সময় হরণের এই মামুলী অভিযোগ কেন?

বাস্তবিক, সময় কেউ হরণ করতে পারে না। সময় এক স্থির অকম্প্র ব্যাপার। পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই বা মানুষের এমন কোনো কল্পনা—যার সঙ্গে সময়ের তুলনা চলে। আপনারা সুন্দরী, রূপসী, চির

যৌবনবতী উর্বশীর কথা শুনেছেন, সুরসভাতল যে আপন নুপুর নিক্বণে অনন্তকাল ঝঙ্কৃত রেখেছে। আপনাদের ইমাজিনেশন ও ইসথেকিসের চূড়ান্ত প্রসব হলো এই সর্বমানবসম্পর্ক উত্তীর্ণ, কালাতীত, অবরা রমণী কল্পনা। ধর্মাবতার ও জুরীমহোদয়গণ, আমার বিবেচনায় এই বিস্ময়বোধ, এই এ্যাডমিরেশন মারফৎ অত্যন্ত মামুলী এক ইমাজিনেশনকে আরো বেশি এঁটো করে দেওয়া হয়েছে। একবার সময়ের কথা ভাবুন—সে কি জড়, না তার প্রাণ আছে? সে কি পুরুষ না রমণী? সে কি সুন্দর না কুৎসিৎ? স্বর্গ মর্ত্য নরক কোথায় তার প্রকৃত অধিষ্ঠান? কায়া নেই, রূপ নেই, গুণ নেই, মানুষের কোনো সম্পর্কবোধ বা অভিজ্ঞতার আওতায় পড়ে না। অথচ সে আছে। আর জানি না কবে তার শুরু, কি ভাবে তার শুরু। অথচ সে আছে। আর জানি না কি বা কেন, অথচ সে আছে। আদিতেই যে সমাপ্ত ও পূর্ণ, চিরকাল যে অতীত আর বর্তমান আর ভবিষ্যতের সমাহার, স্থির অনড় অপরিবর্তনীয় সেই সময়কে আমরা তুলনা করেছি তুচ্ছ প্রবাহের সঙ্গে—প্রকৃতির কারণে যার অস্তিত্ব। সেই সময়কে আমরা ঘণ্টায় মিনিটে সেকেণ্ডে বেঁধেছি—আর দেশে দেশে তার ভিন্ন রূপ। ধর্মাবতার ও জুরীমহোদয়গণ—এই এখন, ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীতে একটাই সময়—অথচ ক্যালেণ্ডার আর ঘড়িতে দেশে দেশে কতই না ভিন্নতা। এই এখন সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে—অথচ কি ভুলভাবে তার পরিমাপ করি। আর পদ্য লিখি শিশুর উচ্ছ্বাসে। বাস্তবিক, কৌসুলী মহোদয় ঠিকই বলেছেন—সময়কে কেউ হরণ করতে পারে না, সময়ই সব কিছু হরণ করে। না, তাও না। সময় সব কিছু হরণ করে। না, তাও না। সময় সব কিছুকে জড়িয়েও তাবৎ ব্যাপার থেকে আলগা—অর্থাৎ সময়েরই যথার্থ ল্যাজ খসেছে, তাই সে শুধু দেখে, কিছুই করে না। হ্যাঁ, সময়ই যথার্থ ব্যক্তি।

আসামী, তোমার কথার মধ্যে এই ল্যাজ খসার প্রসঙ্গ ঠিক বুঝতে পারলুম না। একটু ফুটনোট দাও।

ধর্মাবতার, আপনি যথার্থই রসিক। সুতরাং এ গল্প আপনাকে বলায় সুখ আছে। একবার রামকৃষ্ণ গেলেন কেশব সেনকে দেখতে—খবর না দিয়েই গেছেন। কেশবচন্দ্র তখন সশিষ্য পুকুরে চান করছিলেন। রামকৃষ্ণ দূর থেকে তাঁকে দেখে নিজের সঙ্গীদের বললেন—'এই যে, এরই লেজ খসেছে'। কথাটা কেশবচন্দ্রের শিষ্যদের কানে গেল আর তারা উঠলেন ক্ষেপে। কেশব সেন তাঁদের শান্ত করে রামকৃষ্ণকে বললেন 'মহাশয়, আপনি

এমত বললেন কেন জানতে বড়ই কৌতূহল বোধ করি।' রামকৃষ্ণ একগাল হেসে বললেন, 'তাও বুঝলে না? বলি ব্যাঙাচি দেখেছ?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' 'ব্যাঙাচির ধর্ম কি জানো? সে জলে থাকলে জলেই থাকে, আর ডাঙ্গা হলে ডাঙ্গায়। যখন তার ল্যাজ খসে, সে ব্যাং হয়, ইচ্ছে করলে জল-ডাঙ্গায় যেখানে খুশি থাকতে পারে। তুমি বাপু সেই রকম। সংসার বা সন্ন্যাস দুইয়েই তুমি বিচরণ কর' ইত্যাদি। ধর্মাবতার, রামকৃষ্ণ এই আশ্চর্য উপমাটি বড়ই অপাত্রে অর্পণ করেছিলেন। বাস্তবিক এক সময় ছাড়া কারোর ল্যাজ খসেছে বলে জানি না। যদিও ডারউইনের থিয়োরী অন্যরকম।

ইয়োর অনার, অন্য কোনো আসামী অর্থাৎ কোনো সাধারণ অপরাধী হলে, কন্‌টেম্‌প্‌ট অব কোর্টের পক্ষে এ-ই মাত্রাতিরিক্ত রকম যথেষ্ট হতো। কিন্তু প্রার্থনা করি বিচক্ষণ আসামীর প্রগলভ ভূমিকাটুকু স্মরণ করে আপনি তাঁকে আপাতত এই অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেবেন। অপরাধীর পূর্ব অপরাধ এত গুরুত্বপূর্ণ, এত মৌলিক যে আমিও তাঁকে এই বিচারব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত সর্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্যই মূল প্রসঙ্গে ফিরতে চাই।

কনটিনিউ।

নিশানাথবাবু, আপনার জীবিকা কি?

অত্যন্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন, উত্তর দিতে বাধ্য নই।

আপনার মামলার সঙ্গে জড়িত সব প্রশ্নের উত্তরই আদালত দাবি করে।

ধর্মাবতার, আমার বিরুদ্ধে যথার্থ অভিযোগ কি তা জানি না। সুতরাং এই মামলার সঙ্গে কোন্ প্রশ্নের সম্পর্ক আছে তা নির্ণয় করা কঠিন। তবু সাধারণ বুদ্ধিতে যে প্রশ্নগুলি অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় সেগুলির উত্তর আমি দিতে বাধ্য নই।

সাধারণ বুদ্ধি? নিশানাথবাবু, আপনি আমাকে বিস্মিত বিচলিত বিমূঢ় করলেন। ভেবে দেখুন—সাধারণ এবং বুদ্ধি এর দ্বারা মনের কোন্ ভাব প্রকাশ করতে চাইছেন?

বাস্তবিক, কৌঁসুলী মহোদয়—আপনি ঠিকই বলেছেন। শব্দ মাত্রেই আপেক্ষিক। সাধারণ এবং বুদ্ধি—এই দুটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, নিহিতার্থ ও প্রয়োগার্থ সর্বক্ষেত্রে এক না-ও হতে পারে। কিন্তু আমরা যেহেতু আইনের দাস সেহেতু—

ও, ভাষা সম্পর্কে আপনি নিজের সেই থিয়োরী ব্যক্ত করতে চাইছেন? আচ্ছা এ সম্পর্কে ধর্মাবতারকে ও জুরীমহোদয়গণকে আমি এই চিঠিটি প্রদর্শনের জন্য দিচ্ছি। ইয়োর অনার—একসৃহিবিটি নাম্বার ওয়ান। লেখক, আসামী নিশানাথ রায়, প্রাপক—সুনয়নী বসু। চিঠির তারিখ ২৭শে জুন ১৯৫৯, একটি পোস্টাফিসের সীল—১লা জুলাই ১৯৫৯, দ্বিতীয় পোস্টাফিসের ছাপ ২রা জুলাই ১৯৫৯। দ্বিতীয় পোস্টাফিসের নাম দেখছি টালিগঞ্জ—সুনয়নী দেবী টালিগঞ্জে থাকেন, তাই না নিশানাথবাবু?

অবান্তর ও ব্যক্তিগত প্রশ্ন। উত্তর দিতে বাধ্য নই।

কিন্তু আমি তো আপনাদের সম্পর্ক কি, আলাপ কি ভাবে বা সে যাক—ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি নি। আমি শুধু জানতে চাইছি—

চিঠিটি যখন পেয়েছেন, তখন ঠিকানাও তাতেই লেখা আছে দেখে থাকবেন।

নিশানাথবাবু আইনের কাছে সবই প্রমাণ সাপেক্ষ। জবানবন্দী বলুন, সওয়াল জেরা বলুন, সাক্ষ্য বলুন—সবই এ কারণে।

ধর্মাবতার—কৌসুলী মহোদয় আর একটি বিচক্ষণ উক্তি করলেন। একবার এক বাড়িওলা তাঁর ভাড়াটাকে মিথ্যে মামলায় উচ্ছেদ করতে চাইলেন। ভাড়াটে আমার বন্ধু, আমি সেখানে নিয়মিত যেতাম—সমস্ত ঘটনাটাই আমার জানা ছিল। বিচারে বাড়িওলা হেরে গেলেন—সত্যেরই জয় হল। অত্যন্ত সাধারণ কেস। আমি সাক্ষী ছিলুম। সত্যের পক্ষে সত্য জেনেও আমাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হলো। নইলে নাকি নিরপরাধ আমার বন্ধু হেরে যেতেন, তাঁকে বাড়ি ছেড়ে দিতে হতো। আদালতের অভিজ্ঞতা সেই প্রথম। কিন্তু বুঝেছি বিচার ব্যবস্থা কি অসহায় আর জটিল—নইলে…

কিন্তু নিশানাথবাবু, আদালতের অভিজ্ঞতা সেই প্রথম কেন বললেন? পরেও কি এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল?

হ্যাঁ, কাঠগরাদে তারপরেও দু-বার আমাকে দাঁড়াতে হয়েছে। একবার আসামীরূপে, একবার সাক্ষী হয়ে।

আসামীরূপে? আপনার অপরাধ?

অপরাধের প্রশ্ন ছেড়ে দিন। অভিযোগ ছিল—বে-আইনী অবরোধ, গুণ্ডামি, পুলিশের কর্তব্যে বাধাসৃষ্টি, নরহত্যার চেষ্টা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর?

সাত-আট মাস আটকে রাখল—কেস ফর্ম করার জন্য। শেষে রাস্তায় গুণ্ডামির চার্জে বিচার হলো। সে কেস টি ঁকল না। তখন নতুন করে মামলা সাজানো হলো—বৈধ সরকারের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র।

ও, আপনি বামপন্থী রাজনৈতিক ?

অবান্তর প্রশ্ন।

আর হ্যাঁ, সাক্ষী দিয়েছিলেন কিসে ?

বলব না।

ইয়োর অনার, এই প্রশ্নের উত্তর বর্তমান মামলার পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে মনে করি।

আলায়।

আমার এক বন্ধু সুইসাইড করেন। সেই মামলায় সরকার পক্ষ আমাকে সাক্ষী মেনেছিল।

আপনার বন্ধুর নাম ?

প্রিয়গোপাল দে।

কতদিনের বন্ধুত্ব ?

চার বছরের।

কি সূত্রে আলাপ ?

কাজকর্মের।

জীবিকা-বিষয়ক ?

না।

তবে ?

কি তবে ?

কি ধরনের কাজকর্ম ?

আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারছি না।

আচ্ছা, ঠিক আছে। কবে তাঁর সঙ্গে আলাপ ?

মনে নেই।

সত্যি বলছেন তো ?

মানুষ ভয়ে অথবা লোভে অথবা ভদ্রতায় মিথ্যে বলে। আমি ভীতু লোভী ভদ্র কিছুই নই।

তার মানে আপনি সাহসী নির্লোভ এবং অভদ্র—এই কি বলতে চাইছেন ?

কৌশুলী মহোদয়—আপনাদের বিচারশালার অভিধানে শুধু দুটি শব্দ আছে—হ্যাঁ অথবা না, ইতিবাচক অথবা নেতিমূলক। আর আমার অভিধান থেকে আমি ওই পৃষ্ঠাগুলি একেবারেই ছিঁড়ে ফেলেছি। ইতিবাচকও নয়, নেতিমূলকও নয়— অথচ অস্তি—এ জিনিষটা বোঝেন ?

বুঝি প্রিয়গোপালের আত্মহত্যার ব্যাপারে। ভালো কথা—সে হঠাৎ এমন একটা সিদ্ধান্ত নিল কেন ?

ধর্মাবতার, ভুল শব্দপ্রয়োগ আমি একেবারে সইতে পারি নে। একজন ভদ্রলোক সম্পর্কে—

অত্যন্ত দুঃখিত, পরলোকগত প্রিয়গোপালবাবু—

পরলোকে প্রিয়গোপাল বিশ্বাসী ছিলেন না।

ঠিক আছে। মৃত প্রিয়গোপালবাবু আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন ?

জীবন তাকে শূন্য করেছিল।

কেন ?

সে অনেক কথা।

ধন্যবাদ, প্রিয়গোপালের এই ডায়েরিখানা যদি আপনি সনাক্ত করেন—তাতেই সমস্ত কারণ লিপিবদ্ধ আছে—তাহলে আদালতের প্রচুর সময় বেঁচে যায়।

এ ডায়েরী আপনি কোথায় পেলেন ?

মৃত প্রিয়গোপালবাবুর বিধবা—

আহ্‌, এ ডায়েরী আপনি কোথায় পেলেন ?

মৃত প্রিয়গোপালবাবুর বিধবা শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবীর ট্রাঙ্ক থেকে।

ধর্মাবতার ও জুরীমহোদয়গণ, আমি সনাক্ত করছি। কিন্তু ডায়েরির সমস্ত বক্তব্য সঠিক নয়। ধর্মাবতার, এ সত্য নয় যে আমারই জন্য প্রিয়গোপাল—ধর্মাবতার জীবন তাকে শূন্য করেছিল। আকাঙ্ক্ষা এবং অভিজ্ঞতাকে সে মেলাতে পারে নি—তাই—

নিশানাথবাবু, আপনার বাবার নাম কি ?

দীননাথ রায়।

আপনার বাবা কি করেন ?

ওকালতি।

আপনারা ক ভাই ?

চার ভাই।

ক বোন ?

তিন বোন।

ভাইয়েদের কি বিয়ে হয়েছে ?

হয়েছে—বড় আর ছোট ভাইটির।

সে কি ?

কেন ?

না, ঠিক আছে। আপনি কোন্ ভাই ?

মেজ।

আপনার দাদা কি করেন ?

ডাক্তারি।

আপনি কি কবেন।

ব্যক্তিগত প্রশ্ন।

আপনার পরেব ভাই—যিনি বিবাহ কবেন নি—তাঁব কি পেশা ?

গুণ্ডামী করা।

ছোট ভাইয়ের ?

রাজনীতি।

বোনেদের বিয়ে হয়েছে ?

বড় বোনের বিয়ে হয়েছিল, সেপাবেশন হয়েছে।

পরের দুটি বোনেব ?

না।

কেন ?

তাঁরা কবেন নি বলে।

মাপ করবেন, প্রশ্নটা করে ফেলেই ভেবেছিলাম আপনি বলবেন—ব্যক্তিগত প্রশ্ন। আপনার বোনেবা কি চাকরি বা পড়াশুনো—

হ্যাঁ, দুইই করেন।

দুজনেই ?

সম্ভবত।

মানে ?

অর্থাৎ আমি সব খবর রাখি না।

ও, আপনারা বুঝি আলাদা থাকেন ?

হ্যাঁ। না, মানে, একই বাড়িতে থাকি—তথাকথিত জয়েন্ট ফ্যামিলি

সিস্টেম আমাদের। তবে আলাদাই বলতে পারেন। অর্থাৎ বোনেরা কবে কি পাশ করেছে, কি চাকরি নিচ্ছে বা ছাড়ছে—সব অত মনে রাখতে পারি না। আমাকে বলেও না আজকাল।

ও, আপনি তো আবার একা থাকতে ভালোবাসেন।

হ্যাঁ।

আপনার ভায়েদের ছেলেপুলে কটি?

দাদার একটি।

তার নাম মনে আছে?

হোয়াট ডু ইউ মীন?

রাগলে আপনিও ইংরিজী বলেন দেখছি। কোনো খবর রাখেন না বলেছেন—তাই—

বাঃ, আমি যে তাকে ভালোবাসি?

মেম্বারস অব দি জুরী, 'ভালোবাসি' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করুন।

সে কি নিশানাথবাবু, আপনি তো স্নেহ-ভালোবাসা ইত্যাকার মানবিক বৃত্তিগুলিকে বিশ্বাসই করেন না।

ঠিকই বলেছেন। ওকে আমার ভালো লাগে। আমি ভালোলাগায় অবিশ্বাসী নই।

ইয়োর অনার আসামীর নিজের স্বীকৃতি আপনি ও জুরীমহোদয়গণ নিশ্চয়ই উপেক্ষা করবেন না। নিশানাথবাবু, ভালো না বেসেও ভালো-লাগায় বিশ্বাস—এ আপনার সাম্প্রতিক ধারণা। একদিন যখন আপনি প্রেম ইত্যাদি মহৎ মূল্যে বিশ্বাসী ছিলেন—

একদিন শৈশব পেরিয়ে মানুষ ব্যক্তি হয়।

নিশানাথবাবু, সভ্যতার মহৎ মূল্যগুলিকে অবিশ্বাস করাই কি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব?

না। সভ্যতা যে সত্যিই মহৎ হতে পারে নি, সম্পর্কের মূল্যবোধগুলি যে নিতান্ত ফাঁকা কথা, ব্যক্তিত্ব তা বুঝিয়ে দেয়। ব্যক্তিত্ব মানুষকে বিবেক দেয়। আর বিবেকবানের মুক্তি নেই। সে জানে কোনো কিছুই আকস্মিক বা কার্যকারণ-সম্পর্ক বিহীন নয়। তাই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ পাপের বোঝা কাঁধে নিয়ে সে এইভাবে কাঠ-গরাদে একে দাঁড়ায়।

সাধু সাধু নিশানাথবাবু। আপনার বক্তৃতার হাত বড় চমৎকার।

আবার ভুল শব্দের প্রয়োগ? বক্তৃতার হাত নয়, এ ক্ষেত্রে হবে বাচনক্ষমতা।

নিশানাথবাবু, আপনার মা সম্পর্কে ধারণা কি?

মানে?

মাকে আপনার কি রকম লাগে?

অবাস্তব প্রশ্ন।

মার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি রকম?

মোটামুটি।

মার সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

ব্যক্তিগত প্রশ্ন।

ইযোর অনার এই প্রশ্নের উত্তর বর্তমান মামলার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী।

আন্সার।

বলুন?

মা একটা ভিখীরি।

কেন?

মা চিরজীবন দীন ভাবে জীবনের কাছে হাত পেতে গেল আর শেষকালে যখন সত্যিই দান এলো, তখন তা নিতে পারল না। খবরের কাগজে সেই সব সাধু ভিখারী বা দরিদ্রের সংবাদ কখনো কখনো বেরোয় যারা হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ধন কুড়িয়ে মালিকের কাছে বা থানায় জমা দেয়—আমার মা তেমনই এক সাধু ভিখারী। অবশ্য এ খবর কাগজের নয়। শুধু আমিই জানি আর মা জানে আর—

আর কে?

বলব না।

আচ্ছা, আপনার মা-ই সে কথা বলবেন। তিনিই আমার এক নম্বর উইটনেস্। ধর্মাবতার সাক্ষী মৃণালিনী দেবীকে ডাকা হোক।

নিশানাথ তাকিয়ে দেখল ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। আর দেয়ালে জানলার গবাদে ছায়াটা মিলিয়ে গেল। সেখানে মা এসে দাঁড়ালেন।

সাত

যাবি না?

না।

খেয়ে এসছিস ?

হুঁ।

নিশানাথ অকারণে মিথ্যে বলল। অবশ্য এক মুহূর্ত আগেও জানত না যে রাতে ভাত খাবে না। মা যদি বলতেন, 'খেতে চল'—তাহলে হয়তো আমি, মা নেতিবাচক উত্তরের সুযোগ দিয়ে প্রশ্ন করলেন বলেই কি আমাকে বাধ্য হয়ে, আসলে, আশ্চর্য দেখেছ ; বোধহয় কত, কতদিন বাদে আজ মার সঙ্গে কথা বলছি। মার সঙ্গে শেষ কথা কবে কি প্রসঙ্গে হয়েছিল মনেই পড়ছে না।

কোথায় খেলি ?

মা হাসলেন। মা অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করছেন। একদা মা এইসব প্রশ্ন করতেন, আমি বুঝতাম কৈফিয়ৎ চাইছেন। মার সন্দেহে আমার বিরক্তি, এমন কি ঘৃণা হতো। আজ কতকাল প্রশ্ন করেন না। করতে সাহস পান না। যেদিন থেকে সত্যিই কৈফিয়ৎ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল, সুযোগ ছিল—সে দিন থেকেই মা নীরব। আসলে মা কি সব বোঝেন ? যাকে ভাবি ভয়, যাকে মনে করি ঔদাসীন্য—বাস্তবিক সেগুলি কি মার সৌজন্য, দুঃখ, হতাশা ? নিশানাথ অজ্ঞাতে মুচকে হাসল।

মা বললেন, কিরে ?

মা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। প্রশ্নের উত্তর দিলাম না বলে কি ? মা কি অপমানিত বোধ করলেন ? মা, তুমি কি, তুমি কি ম', বাস্তবিক বলতো মা, তোমারও কি অপমানবোধ, তাহলে আমাদের মতো এহেন একটি রত্ন প্রসব করে, মা বলতো, এতবড় একটা মিথ্যে-ফাঁকা-ব্যর্থ জীবন কাটিয়ে, আজও যে পঞ্চাশ বছর বয়েসে কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, সুন্দর স্বাস্থ্য নিয়ে একটু আগে খেতে বসে পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে গল্প করছিলে, এখন এসেছ তোমার প্রবাসী পুত্রটিকে কিছু একটা বলতে—মা, বলতো তুমি কি—

ছোটকু আর বৌমা কাল আসছে।

ও।

কাল তোর কাজ আছে নাকি ?

নিশানাথ হেসে ফেলল। মা দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাঁর ছেলেটিকে হাসতে দেখছেন। মা, তুমি যে কি পৌরাণিক ভাষায় কথা বলো—আমি বুঝতে

পারি না। নিশানাথ অনেক ভেবেও কিছুই মনে করতে পারল না কি-কাজ তার থাকতে পারে। তবু বলল, হ্যাঁ।

কাল যে বাড়িতে, মানে, তোর কি খুব জরুরি—

হ্যাঁ।

কখন বেরোবি ?

দেখি।

মা আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কিন্তু তুমি বৃথাই কষ্ট পাচ্ছ। উপযুক্ত মনোযোগ দিয়ে তোমার প্রশ্ন শোনো ও যোগ্য মর্যাদায় তার যথাবিহিত প্রত্যুত্তর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ভান করছি না। মা, তুমি যদি বলতে কাল বাড়িতে এই ব্যাপার, তোকে থাকতে হবে—তাহলেও আমি বলতাম, দেখি। মা, তুমি বোঝো না কেন—আমি তোমার অপরিচিত, তোমাকে আমার লজ্জা করে। তুমি এই এসেছ—তোমার চোখ দুটো দেখে আমার লজ্জা। মা, তুমি আদেশ করতে পারো না—কিন্তু তোমার ভীরু বিষন্ন কণ্ঠ, তোমার ভীরু বিষন্ন চোখ, তোমার ভীরু বিষন্ন অস্বস্তি আমায় ক্রমাগত অভিযোগ করে। মা, তুমি যাও—যদি বুঝতে তোমার সম্পর্কেও আমার অভিযোগ কত তীব্র, যদি বুঝতে মা, যদি—

শোন।

কি ?

কাল বড় বৌমার সাধ।

কি সাধ।

মা হেসে ফেললেন।

আর মার হাসিতে নিশানাথ যেন এক শিলালিপির পাঠ আবিষ্কার করল। খুবই বিস্মিত হলো বিরক্ত হলো। বলল, ও।

সেইজন্যেই তো বাড়িতে কাল, ছোটকুরাও—

ও।

তুই কি ভাবিস এত ?

নিশানাথ চোখ তুলে তাকাল।

মা যেন জেদ করে বললেন, সব সময় অন্যমনস্ক—কোনো কথা ভালো করে শুনিস না, উত্তরও দিস না। কি ভাবিস রে ?

মা আমি জানি, তোমার প্রশ্নেই সব সময় উত্তর থাকে। এই মাঝরাতে,

আহ, তুমিও এলে আমাকে অভিযোগ করতে। নিশানাথ বিরক্ত আর অসহায় দৃষ্টিতে তার জননীর দিকে তাকিয়ে রইল।

ঠাকুরপো, খাবে না?

নিশানাথ শুয়েছিল, চকিতে উঠে বসল।

চৌকাঠের ওপাশে দাঁড়িয়ে স্বর্ণ এক হাতে মাথার ঘোমটা তুলে অন্য হাতে দরজার পাল্লায় কনুই ঠেকিয়ে বলল, শোনো তোমার দাদা বলছিলেন কালকের বাজারটা তুমি করো। মানে কেষ্ট তো রোজই, আর কাল আবার—এদিকে কাল ভোর রাতে ওকে বেরোতে হবে। সেজবাবুকেও তো—

নিশানাথ দুর্বোধ্য বিস্ময়ে স্বর্ণর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বোঝো কাণ্ড। কালকের বাজার চাকরে করলে মনে থাকে না। আর, এ বাড়ির সেজ ছেলের ওপর কারোর বিশ্বাস নেই। তোমার বৌঠান নিশানাথ, তোমার এককালীন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। সে বলছে কাল বাজার করতে হবে। কারণ উনি ভোর রাতে বেরোবেন। কারণ কাল আমার সাধ। তোমার দাদা, মানে উনি, বুঝলে ঠাকুরপো—আমাকে আর একটি সন্তান দিচ্ছেন। অতএব, বুঝলে ঠাকুরপো, কাল বাড়িতে উৎসব হবে। তাই, তুমি বাজারে যেয়ো।

নিশানাথের অতীব, অতীব রাগ হলো। আর, একটা অশ্লীল ঝগড়া করার ইচ্ছায় তার মাথা ধরল। বৌঠান পান চিবুচ্ছে। চিবুকে টোল। বৌঠান আজ সিনেমায় গেছিল। খেতে বসে স্বামী আর শাশুড়ীর সঙ্গে সেই গল্প হচ্ছিল। অহো! জীবন! নিশানাথ, তুমি ভাবনায় ভাবনায় ভাবনায় কোন্ স্বর্গে—কোন্ নরকে পৌঁছতে চাও' এই দেখ- সম্মুখে একটি রমণী। শিক্ষিতা, সুরূপা, গৃহকর্মে নিপুণা, সদ্বংশজাতা,—তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কত সুখী, কত নিশ্চিন্ত। আর নিশানাথ—তুমি যুবক তাবৎ সভ্যতার বোঝা ঘাড়ে করে, নিশানাথ—হায় হায় হায়, নিশানাথ—

কি অমনি মুখ গম্ভীর হয়ে গেল? একদিন না হয় একটু কাজ করলেই বাবা।

সাবধান নিশানাথ, এও একজন সাক্ষী। এও তোমার বিরুদ্ধে তর্জনী উঁচিয়ে অভিযোগ করছে। তুমি কিছু করো না। তুমি উদ্বৃত্ত। নিশানাথ, এই পরিবারের প্রতি কোনো কর্তব্যই তুমি পালন করো নি। তোমার বাবা, তোমার মা, তোমার দাদা-বৌদি, তোমার ভাই বোনেরা—ওহ্, কাল ছোটকু আর সাধনা আসছে। নিশানাথ, তোমার ছোটো ভাই তোমাকে ঘৃণা করে—

তুমি বোঝো না? তোমাব ভাইয়ের বৌ তোমাকে করুণা করে—তুমি বোঝো না? আর অন্য ভাই বোনেদের সঙ্গে তোমার তো বাস্তবিক কোনো সম্পর্কই নেই। দেখ নিশানাথ, পবিবাবেব দাবি ছিল—বৌঠান সেই কথাই মনে করিয়ে দিলেন। সমাজের দাবি ছিল—ছোটকু সেই কথাই কাল বলবে। নিশানাথ, তুমি উদ্বৃত্ত, আর তোমাকে ঘিরে চতুর্দিকে শুধু অভিযোগ।

ওই! স্বর্ণ বিচিত্র হেসে বলল্।

নিশানাথ যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে বলল, এঁ্যা?

সেজবাবু।

ও।

বারান্দায় আবাব রান্নাঘরের আলো পড়েছে। নিশানাথ আর দিবানাথের ভাত ঢাকা থাকে। বাড়িতে এই দুজনেব ফেরার ঠিক নেই। নিশানাথ অনেকদিন না খেয়েই শুয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে দুজনে একসঙ্গেও খেতে বসে। ঢাকনা তুলে থালাব চারপাশে বাটি সাজিয়ে খায়। নীরবে খায়। কতদিন নিশানাথ স্তব্ধ বাড়িতে নিঃশব্দে খেতে খেতে হঠাৎ দুজনেব ভাত চিবোনোর শব্দে চমকে উঠেছে। আর মনে পড়েছে—সে একা নয়। পাশে বসে খাচ্ছে তাবই সহোদর ভাই। আব এই সত্য আবিষ্কাব করে যারপরনাই বিস্ময়ও বোধ করেছে।

শোনো!

নিশানাথ অবাক হয়ে তাকাল। কি চান এই ভদ্রমহিলা, তাব বৌঠান। এতরাতে তাব ঘরে এসে কি সব সুখ-দুঃখের কথা বলছেন, কত সহজ সুরে, কি নিবিড় ঘনিষ্ঠতায়। যেন প্রত্যহ বাড়ি ফিরে নিশানাথ খাওয়ার আগে বা পরে এমনি ভাবেই তার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে খানিক গল্প করে। কিংবা, যেন প্রবাস থেকে ফিরেছে।

মন্টু আজ খুব কাঁদছিল।

কেন? নিশানাথ ভীত চোখে তাকাল।

তুমি নাকি কি দেবে বলেছিলে, তাই জেগে বসে থাকবে। আমি জোর করে ঘুম পাড়িয়েছি। কাল কিন্তু সকালেই—

বৌঠান। তুমি হাসছ! তোমার চোখ হাসছে। তুমি জানো আমি আনি নি। তুমি জানতে আমি আনব না। তাই মন্টুকে জোর করে ঘুম পাড়াতে তোমার বাধে নি। সুনয়নী, সুনয়, জানত আমি যাব না। তাই, যাতে আজ বাড়ি ফিরে চিঠি পাই তার জন্য হিসেব করে আগেই চিঠি পোষ্ট

করেছে। কিন্তু তোমার কণ্ঠে কোনো অভিযোগ নেই। এমন কি কৌতুকও না। কি সরলভাবে বৌঠান, তুমি, ঘটনাটা বিবৃত করলে। সত্যি বৌঠান, ছোট বড় সমস্ত ব্যাপারে তোমার এই তুচ্ছ ধূর্তামী দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত। তুমি একটা মামুলি মেয়েমানুষ। বৌঠান, তুমি যদি এখন যাও, আমি বাস্তবিক বলছি, অত্যন্ত খুশী হব। আর এই যে তুমি ভদ্রমহিলা, আমার গর্ভধারিনী মাতঃ, শাস্ত্রে-নীতিকথায়-শিল্পে-সাহিত্যে তোমারই জয়জয়কার, এবং সেই তুমি, মা, কেমন অবলীলায় এখানে বসে আর পাশের ঘরে তোমার পুত্র একাকী—ঢাকনা তুলে ভাত খাচ্ছে। তুমি জানো তোমার এই পুত্রটি খেতে ভালোবাসে, তার স্বাস্থ্যচর্চার ব্যাপার আছে—খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণে ভুল হলে, রান্নায় গণ্ডগোল হলে, প্রোটিন আর ভিটামিন ডি কম পড়লে সে যারপরনাই বিচলিত হয়। তবু তুমি তার ভাত সাজিয়ে দিয়েই সন্তুষ্ট। কারণ, ও রোজ দেরি করে ফেরে, ও রোজ দেরি করে ফেরে, ও গুণ্ডা, ও বংশের মুখে কালি দিয়েছে—ওর সম্পর্কে তোমাদের আবেগ কম। কিন্তু আমি জানি যদি নিয়মিত টাকা এনে দিত, সমস্ত বেদনা ও অপমানবোধ সহ্য করেও তুমি এবং তোমার সাবিত্রী সমান বধূমাতা যত রাতই হোক—ওর খাওয়ার পাশটিতে গিয়ে বসতে। হায় মা, তুমি জানো না, তোমরা জানো না—তোমাদের অভ্যাস, তোমাদের অনুভব—ঠিক নীতিশাস্ত্র মেনে চলে না। ঠিক নীতিশাস্ত্র মেনে গড়ে ওঠে নি। বাস্তবিক, এ বড়ই পুরনো কথা যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যাবতীয় সম্পর্কবোধের ভিত্তিই হলো উৎপাদন ব্যবস্থা।

বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, আপনারা বিলক্ষণ অবগত আছেন, মানব সভ্যতার ইতিহাসে রেনেসাঁস একটি ঘটনা। মধ্যযুগের ভূমিব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থা আমূল নাড়া খেল। আর পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র—তাবৎ সংগঠনের চেহারা গেল বদলে। চার্চ এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের অমানুষিক বন্ধনদশা থেকে মুক্তি পেল ব্যক্তিত্বের বোধ। আর শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কারুবিদ্যা, দর্শন, নন্দন-তত্ত্ব, ইতিহাস চর্চা ও অর্থনীতিশাস্ত্র—যা কিছু বলুন, মানব সভ্যতা ও কল্পনার যাবতীয় শ্রেষ্ঠ উপচার সেই থেকে নতুন করে শুরু হলো। মানুষ তার মহান অতীত ভুলে গেছিল। হেলেনীয় সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কারের মাধ্যমে পৃথিবী একদিকে তার অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক আবিষ্কার করল অন্যদিকে অজ্ঞাত-অজেয় ভবিষ্যতের দিকে তার নৌকো ভাসাল। এই যুগটাই আবিষ্কার আর অভিযানের যুগ। সৃষ্টি আর গঠনের যুগ। বস্তুত,

রেনেসাঁস সেই ধাত্রী যে প্রাচীন পৃথিবীর গর্ভ থেকে নবীন জগৎকে ভূমিষ্ঠ করাল।

কিন্তু কোন্ সে জগৎ। এ বড়ই জানা কথা আর পূর্বেও বলেছি—সে জগতে হলো ব্যক্তিত্ববোধের উন্মেষ। গ্রীকদেরও নাকি স্বাতন্ত্র্যপরায়ণতা ছিল অসামান্য। কিন্তু তাকে আমি ঠিক ব্যক্তিত্ববোধ বলব না। মানুষ যে দেব আর নিয়তির ক্রীড়নক নয়, প্রকৃতি চার্চ আর রাষ্ট্রের ক্রীতদাস নয়, কোনো ব্যবস্থা বা অবস্থাই যে মানবজীবনে অপরিবর্তনীয় নয়—মানুষ তা বুঝল। আর সেই থেকে শুরু হলো তার অপরিসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আমি জয় করব, স্বর্গ-মর্ত্য-নরকের আমি অধীশ্বর হবে—সে ভাবল।

আর বন্ধুগণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রতিযোগিতা—রেনেসাঁস পৃথিবীকে দিয়ে গেল এই দুই অমোঘ উপহার। আমি মনে করি এরাই হলো সেই আদম ও ঈভ—রেনেসাঁসের ফল খেয়ে যারা মধ্যযুগের আদিম অথচ শান্ত আর স্তিমিত স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হযে নিজেদের নগ্নতায় শিউরে উঠেছিল। আর আগুন জ্বলল।

বন্ধুগণ, আমি কবে কোথায় যেন বলেছি পৃথিবীতে কোনোদিন ব্যক্তি ছিল না, ব্যক্তি নেই। অথচ এখন বলছি রেনেসাঁসের অবদানই হলো জগতে ব্যক্তিত্ববোধের আবির্ভাব। একি পরস্পরবিরোধী কথা? না, মোটেই না!

প্রথমাবধি এই ব্যক্তিত্ববোধ ছিল বিকৃত, খণ্ডিত। সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে, তথা পৃথিবীর সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক কোনোদিনই ইতিহাসসম্মত, উদার ও যথার্থ হয় নি। তার কারণই এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রতিযোগিতা। ফলত এই অসম বিকাশ থেকেই একদিকে হলো স্বাতন্ত্র্যের জন্ম, অন্যদিকে স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ। আর এই ভাবে নতুন এক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল। মানবেতিহাসের কি ট্র্যাজেডি! রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শেক্সপীয়ারের মহৎ শিল্পকর্ম কি তাই ট্র্যাজেডি? এই বিকাশ আর বিনাশের ট্র্যাজেডি? তাই কি মেকিয়াভেলির প্রিন্স একাধারে অতিমানুষ আর অমানুষ! তাই কি ফরাসীবিপ্লবের প্রোডাক্ট নেপোলিয়ন!

বন্ধুগণ, এই ভদ্রবালক, এই দেবশিশুটি সম্পর্কে আমার প্রচুর বক্তব্য আছে। কিন্তু সে পরের কথা। ফরাসী বিপ্লবকে সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক আলোকস্তম্ভ হিসেবে ধরতে আপত্তি করার কোনো কারণ দেখি না। এই বিপ্লবের প্রধান ভূমিকাই ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর মুক্তি সাধন, তার এই গৌরবময় ভূমিকাকে মার্কস্ সাহেবও অকুণ্ঠিত অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কিন্তু তারপর ? স্বাধীনতা, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্বের সেই পতাকাদণ্ডের তলায় সেদিন দেখেছি ক্রোড নেপোলিয়ন—যার কিছু মানবিক ভূমিকা ছিল আর অধিকাংশই ধাপ্পা। আজ দেখি দ্য গলের বিশাল নাক। আর রেনেসাঁস পশ্চিম ইয়োরোপে মানুষকে দিল মুক্তি—এশিয়া এবং আফ্রিকায় গড়ল উপনিবেশ। বাস্তবিক—আমি যদি রেনেসাঁসের ডিমাণ্ড এ্যাণ্ড সাপ্লাইয়ের একটি কার্ভ করি তাহলে দেখা যাবে একদিকে রইল শুদ্ধতা, অন্যদিকে মেকিয়াভেলির প্রিন্স, নেপোলিয়ন, হিটলার। ওহোঃ বন্ধুগণ, আমরা বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে গেছি। এই এক আশ্চর্য শতাব্দী ! পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আশ্চর্য সময় আর আসে নি।

এখন, এই এখন, ঠিক এই মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত গোলার্ধে মানুষ প্রহরারত। বন্ধুগণ, পৃথিবীর সমস্ত আকাশে সন্ধানী চোখ পাহারা দিচ্ছে—শত্রুপক্ষের রকেট কখন, কোথা থেকে এসে আঘাত করবে, কেউ জানে না। আর এখন, এই এখনই কাঁচের গবাক্ষে বন্দী আইখম্যান দণ্ডায়মান। আমেরিকা পাগল হয়ে গেছে, গোটা জাতের ইন্‌সমনিয়া, হাইপার টেনসন্। ইয়োরোপ সন্ত্রস্ত—বারট্রাণ্ড রাসেল আলমারি বোঝাই সস্তা গোয়েন্দা কাহিনী দেখিয়ে বলেছেন আমি যখন পৃথিবীর আশু ভবিষ্যতের কথা ভাবি তখন আতঙ্কে, উৎকণ্ঠায় দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য এই সব হালকা বই পড়ি। জ্ঞানচর্চা স্থগিত রেখেছি, কি লাভ ? পশ্চিম জার্মানীতে হলুদ সার্ট পরে ছোকরা ফ্যাসিস্টরা পুনরায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর পুনরপি জর্মান রক্তের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করছে। আর জাপান আগামী কয়েক পুরুষ তার বীর্যে হিরোসিমার স্মৃতি বহন করবে।

বন্ধুগণ, মানুষকে এই নিরবচ্ছিন্ন উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চয়তার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে রেনেসাঁস। তাই ও দেশের সাহিত্যিক অনেকেই আজ মনে করেছেন যে—আচ্ছা, তার আগে আমাদের দেশের কথাটা সেরে নি। সর্বোপরি, পৃথিবীর একটা বড় ভূখণ্ড—যাকে বলা হয় বিকাশমান শিবির—সে প্রসঙ্গ তো রইলই।

এমন সময় তার মনে হল কে যেন দূরে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে। নিশানাথ চমকে উঠে দাঁড়াল আর পরক্ষণেই বুঝল সেই ভিখারিণীটা রোজকার মতোই 'মাগো, দুটি ভাত হবে' বলে ডাকতে ডাকতে আসছে। নিশানাথ এ গলা চেনে। এ ডাকের ধ্বনিতরঙ্গ কোথায় বিলম্বিত হয়, কোথায় হ্রস্ব এবং কিভাবে দূর থেকে কাছে এসে আবার দূরে চলে যায়—নিশানাথ তা

জানে। অনেকদিনই এত রাতে ভিখিরি ভদ্রমহিলার এই অকারণ ডাকের অর্থহীনতার কথা ভেবে মনে মনে সে বিস্মিত হয়েছে। তার গলায় তার ধ্বনিতরঙ্গে প্রতিদিন সে প্রত্যাশা বিহীন আবেদন শুনেছে, যেন উদাসীন অথচ অভ্যস্ত ডাক। আজ হঠাৎ নিশানাথ এই ছোট্ট কথাটার মানে বুঝে, তাৎপর্য বুঝে, পাথর হয়ে গেল। ভদ্রমহিলার খিদে পেয়েছে, খুব খিদে পেয়েছে, কিন্তু খাদ্য নেই।

কি যেন ভাবছিলাম? রেনেসাঁস, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রতিযোগিতা, মানুষের মৌলিক পাপ, পৃথিবীর বিনাশ—আহ্, আহ্। এই কলকাতা শহরে পঁচিশ হাজার লোক ফুটপাতে শোয়, এই দেশে প্রতি মিনিটে যক্ষ্মায় একজন মরে যায় (বন্ধুগণ, মরে যায়), এই দেশে শিশুমৃত্যুর হার যেন কত? আর আমাদের গড়পড়তা আয়ু? সেনসাসের রিপোর্ট অনুযায়ী আমি বোধহয় মৃত।

নিশানাথ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

কি রে, হাত মুখ ধুবি না?

নিশানাথ তাকিয়ে দেখল, মা। অত্যন্ত বিস্মিত হলো। মা, তুমি—ও, মনে পড়েছে, কিন্তু বৌঠান—ও, চলে গেছে। ও, কাল তোমার সাধ বৌঠান, অতএব আমাকে বাজারে যেতে হবে। আর এই ভদ্রমহিলা রাস্তায় প্রত্যহ প্রত্যাশাহীন, উদাসীন অথচ অভ্যস্ত কণ্ঠে, আর আমি মদ খাচ্ছি কেন, আর আমরা তিনপুরুষে প্রস্, অথচ মহাভারত তো শুদ্ধই রয়েছে।

শোন্।

মা অত্যন্ত লজ্জিত, অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললেন, আমি একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।

এ্যাঁ?

হ্যাঁ রে। দেখলাম তোর ওপর মায়ের দয়া হয়েছে। তোর সারা শরীরে-চোখে—মা বলতে বলতে শিউরে উঠলেন। আর ব্যাকুলভাবে নিশানাথের হাতটা জড়িয়ে ধরে বললেন, কাল সকালে তোকে আমার সঙ্গে মন্দিরে যেতে হবে, না করতে পারবি না কিন্তু।

আর নিশানাথ তার সম্মুখে যেন এক প্রাচীন অপরিচিত শিলামূর্তি দেখল। সেইজন্য, আহ্ সেই জন্য তুমি—মা, দুঃস্বপ্নে তোমার ভয়, ভগবানে তোমার ভয়, পুত্রকে তোমার ভয়—মা, ভিখিরির মতো এই যে তুমি বললে তোে

আমার সঙ্গে মন্দিরে যেতে হবে—তোমার কণ্ঠে, উচ্চারণে কি অনিশ্চয়তা আর সংশয়—তোমার আশঙ্কা আমি যাব না, তাই সেই কখন থেকে বসে আছ, কথাটা বলার জন্য পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছ—হায় মা, আমি যে জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখি, মা আমি যে দেখলুম সমস্ত পৃথিবীটার গায়ে ক্ষত, চোখে, দাঁতে, নখে, মাথার চুলে—মা, আমি কোন্ মন্দিরে যাব—কাকে নিয়ে যাব! মা হায় মা—

কাল সকালে আমি তোকে ডেকে দেব।

নিশানাথ অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, দেখি।

মা আবার তার হাত দুটো ধরে বললেন, না, একটু কথা শোন্।

নিশানাথ অতীব, অতীব বিরক্ত হলো। তার হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটা অশ্লীল মনে হলো। অথচ মার জন্য সে অপরিসীম করুণা বোধ করল। আর বিরক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, কিন্তু কাল সকালে যে আমায় বাজারে যেতে হবে।

মার চোখে-মুখে নিশানাথ খুশি দেখল। সে স্পষ্ট বুঝল, মা এমন উত্তর প্রত্যাশা করেন নি। বললেন, যাস্, তার আগেই আমরা মন্দির থেকে ঘুরে আসব।

দেখি। নিশানাথ ক্লান্তভাবে শুয়ে পড়ল আর মৃণালিনী ঘরের আলো নিভিয়ে নতমুখে বেরিয়ে গেলেন।

ইয়োর অনার, দ্যাটস্ অল্।

নিশানাথ সেই অলৌকিক কাঠগরাদের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আট

ঘাড়ে হাত রেখে ইশারায় বলল, চলো।

নিশানাথ আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। টানা বারান্দায় জ্যামিতিক ছায়া পড়েছিল। নিশানাথ যেন দাবার ছকের ওপর পা ফেলে স্বপ্নোত্থিতের মতো রাস্তায় নামল।

আর ডাকতে ডাকতে দূর থেকে কতগুলো কুকুর দৌড়ে এল। নিশানাথের পায়ের কাছে বারকয় মাটি শুঁকে আবার চিৎকার করে দৌড়ে চলে গেল। নিস্তব্ধ রাস্তায় ঘুমন্ত দেয়ালগুলিতে সেই ভয়াবহ চিৎকার

এক ঝাঁক তীরের মতো প্রতিহত হয়ে নিশানাথের চারদিকে ছিটকে পড়ল।

তারপর বড় রাস্তা। কতগুলো লোক গাঁইতি দিয়ে ট্রাম লাইনের খানিকটা খুঁড়ে ফেলেছে। দাঁতে দাঁত চেপে একজন একটা নলের মুখ লাইনের ওপর ধরেছে আর নীল হলুদ লাল বিচিত্র বর্ণের আগুন জায়গাটাকে ভৌতিক আলোয় উদ্ভাসিত করে ইস্পাতের ট্রাম লাইনকে পুড়িয়ে গালিয়ে দিচ্ছে। হাতুড়ি আর ছেনির সংঘাতে মাঝে মাঝে একটা অলৌকিক শব্দ, যেন ঘণ্টা বাজছে। লোকগুলোর একজন নিশানাথকে দেখিয়ে কি বলল, বাকি কজন হা হা করে হেসে উঠল।

ফুটপাত ধরে এগোতে লাগল। গাড়ি বারান্দার তলায়, এমন কি খোলা আকাশের নিচে চাক বেঁধে বেঁধে মানুষ শুয়ে আছে। গায়ে মাথায় যা পেরেছে জড়িয়ে শুয়ে আছে। কে একজন নিশানাথকে দেখে উঠে বসল। তারপর উদাসীন অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

নিশানাথ ডান দিকে বাঁক নিল। সরু রাস্তা, আলো কম, মানুষ নেই। আবার একদল কুকুর কোথা থেকে দৌড়ে এসে নিশানাথকে অনুসরণ করতে লাগল আর মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ বিলম্বিত স্বরে ডেকে উঠে আমূল ছুরিকাঘাতে সেই নৈশ গলিটার হৃদপিণ্ডে ক্ষত সৃষ্টি করল।

তারপর বাড়িগুলো আরও কাছে কাছে সরে এল। রাস্তাটা আরও সরু হলো। দুটো মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারে না। এই পথটুকু সিমেন্টের এবং সর্বত্র ময়লা ছড়ানো। যেন একটা বাড়ির উঠোন। বাড়িগুলি জীর্ণ, ছুঁলে পড়ে যাবে মনে হয়। আর অন্ধকার। খানিক গিয়েই রাস্তাটা ধনুকের মতো বেঁকে গেছে।

সেই বাঁকের মুখে প্রশস্ত একটি স্নানাগার। এ গলির পক্ষে অপ্রত্যাশিত, বেমানান। নিশানাথ ভেতরে ঢুকল। বৃহৎ শবাধারের মতো লম্বা চৌবাচ্চা। জল প্রায় নেই। তার ইচ্ছে হলো নেমে চুপ করে শুয়ে থাকে। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিল, শীত ধরল। নিশানাথ ত্রস্ত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল। আবার সরু গলি, লম্বা, ভৌতিক। হঠাৎ একটা বাড়ির দরজা খুলে গেল। কয়েকজন একটা মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে পলকে অন্তর্হিত হলো। নিশানাথ থমকে দাঁড়িয়ে তারপর খোলা দরজা দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। একটা ইঁদুর তার পা মাড়িয়ে দৌড়ে চলে গেল। নিশানাথ ওপরে উঠতে লাগল। জ্যামিতিক সিঁড়ি, কোথা থেকে আলো এসে পড়েছে। নিশানাথ ওপরে উঠতে লাগল।

তার পায়ে শব্দ নেই। আলো আর অন্ধকার স্পর্শ করে, আলোয় ছায়ায় নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে নিশানাথ ওপরে উঠতে লাগল। তারপর সিঁড়ি যেখানে শেষ হলো সেখানে অপ্রশস্ত বারান্দা। বারান্দার ঠিক মাঝখানে একটি নারীমূর্তি আলোয় ছায়ায় নিজেকে মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় ঈষৎ ঘোমটা। একটি চোখের পল্লব চোখে পড়ে। নিশানাথ থমকে দাঁড়াল। মাথা নিচু করল। কিন্তু নারীমূর্তি স্থির, তার চোখের পাতা কাঁপল না। নিশানাথ কাছে গিয়ে দেখল মেয়েটি বন্দিনী। নিশানাথ তার চোখের ভাষা পড়তে চাইল। তারপর সামনে নতজানু হয়ে বসল। আলোয় ছায়ায় শরীর মিশিয়ে দিয়ে বন্দিনী দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নিশানাথ আস্তে আস্তে যেন তার পদতলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

এক মিশ্র অনুভূতিতে ঘুম ভাঙল। একটি ছোট্ট নরম শীতল হাতের স্পর্শে হঠাৎ চমকে জেগে গেল। সেই স্পর্শের অনুভবে মুহূর্তে বুঝতে পারল জ্বর হয়েছে। আর মনে হলো, তার যেন এই ঘরে থাকার কথা নয়। কাল রাতে না কবে সে যেন কোথায়—চেয়ে চেয়ে দেখল। হ্যাঁ, সেই ঘরটাই। সেই কুৎসিৎ অভ্যস্ত এলোমেলো ঘর। আর কে যেন হাট করে জানলা খুলে দিয়েছে। অজস্র রোদ তার পায়ে বিছানায় পড়েছে। বেলা হয়েছে।

তারপর খুবই আশ্চর্য যে নিশানাথের মনে পড়ল আজ তার বাজারে যাওয়ার কথা। মন্দিরে যাওয়ার কথা। মনে পড়ল ছোটকুবা আসবে, বৌঠানের সাধ। প্রত্যেকটি ব্যাপারই ছিল বিরক্তিকর। কিন্তু সকালে উঠে তার ব্যত্যয় দেখে নিশানাথের গা ছমছম করতে লাগল। আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? আসলে কাল রাতে মা অথবা বৌদি—কারোর সঙ্গেই কি দেখা হয় নি? আজ কি হবার কথা ছিল না? আর হঠাৎ সে চোখের সামনে দেখতে পেল প্রখর দিবালোকে জলজল করছে প্রশস্ত স্নানাগার। তারপর—তারপরে যেন—যেন আমি—আহ্, সূর্যালোকে তপ্ত আর উজ্জ্বল আর প্রশস্ত সেই স্নানাগারে জল—ও, মনে পড়েছে, আমি স্নান করব।

নিশানাথ ধড়মড় করে উঠে বসল।

মন্টু বলল, তাই বলো। মটকা মেরে পড়েছিলে?

নিশানাথ দেখল মন্টু। অসহায়ের মতো যেন একটা অবলম্বন পেয়েছে

এমনিভাবে সে দুহাতে মন্টুকে জড়িয়ে ধরতে গেল। মন্টু ছিটকে সরে গিয়ে বলল, উঁহু। আগে দাও?

নিশানাথ যারপরনাই অপ্রস্তুত হয়ে বলল, এই যাহ্। আজও ভুলে গেছি।

মন্টু বলল, মিথ্যুক। রোজ রোজ ঠকাও।

নিশানাথ স্তব্ধ হয়ে মন্টুর দিকে তাকিয়ে রইল। মন্টু বলল, চাই না যাও।

নিশানাথ হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠল। আর হাসতে হাসতেই তার মনে পড়ল এ বাড়ির কানে তার হাস্যধ্বনি প্রায় অপরিচিত হয়ে গেছে। সবাই না ভয় পেয়ে যায়। আর একথা মনে পড়তেই সে আবার দ্বিগুণ জোরে হেসে উঠল। মন্টু একটু বা বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু হাসির ছোঁয়ায় তার বিস্ময় অন্তর্হিত হলো। মন্টুও হাসতে লাগল। দুজনের হাসি শুনে সাধনা দরজার বাইরে থেকে একবার উঁকি মেরে হাসিমুখে ঘরে ঢুকল, তারপর হঠাৎ মনে পড়ায় মাথার ঘোমটাটা টেনে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে মেজদা?

আর সাধনাকে দেখে নিশানাথ বুঝল নিশ্চয়ই কাল রাতে যার সঙ্গে তার কথা হয়েছে। তাহলে পাগল হইনি? নিশানাথ অতীব, অতীব পুলকিত হলো এবং আরো জোরে হাসতে শুরু করল। অগত্যা সাধনাকেও হাসিতে পেল। আর কাকীমাকে হাসতে দেখে মন্টু আরো বেশি হাসতে শুরু করল। নিশানাথ স্পষ্ট বুঝল এই মন্টুও জানে হাসার পেছনে একটা কারণ দরকার এবং সে কারণ তার কাকার হাসি হতে পারে না, পারে সাধনার হাসি। নিশানাথ মুহূর্তে অদ্ভুত হীনমন্যতা বোধ করল। এই মেয়েটি, অর্থাৎ কি না তার ভ্রাতৃবধূ, সে তার সম্মানার্থে হাসতে হাসতেও মাথার কাপড় ঠিক রাখছে—সেই ছোটকুর বউ যে তার শ্রদ্ধেয় ভাসুরটির থেকে নির্ভরযোগ্য বেশি, তা এই বালকও বোঝে। নিশানাথ হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে গেল।

ততক্ষণে স্বর্ণ ঘরে ঢুকছে। বলল, কি হয়েছে? সবাই মিলে এত হাসছ কেন তোমরা? বলতে বলতে স্বর্ণও প্রায় হাসতে শুরু করবে এমন সময় নিশানাথ আচম্বিতে হাসি থামিয়ে বলে বসল, মন্টু আমায় বলল আমি মিথ্যেবাদী, আমি ধোঁকা দি।

শুনেই সাধনার মুখের হাসি বন্ধ হলো। সে চকিতে একবার স্বর্ণর দিকে

তাকিয়ে আস্তে আস্তে মন্টুকে কাছে টেনে নিল। মৃদুস্বরে বলল, গুরুজনদের এমন বলে?

মন্টু বলল, বারে। আমি তো ধোঁকা দাও বলি নি, আমি তো বললুম রোজ রোজ ঠকাও।

নিশানাথ চমৎকৃত হলো। সে ভেবেছিল মন্টু বলবে বেশ করেছি। বলবে মিথ্যেবাদীই তো। রোজ রোজ আনবে বলো আর রোজই ভুলে যাও? মনে মনে সে মন্টুকে মাল্যভূষিত করল।

সাধনা মন্টুকে বলল, যাও, পিসিকে কাকুর চা নিয়ে আসতে বলো।

মন্টু নিশানাথের দিকে একবার তাকিয়ে বাধ্য ছেলের মতো চলে গেল।

এক মুহূর্তে কেউ কোনো কথা খুঁজে পেল না। নিশানাথ বুঝল তার কিছু বলা দরকার। সম্মুখে বৌঠান ও ভ্রাতৃবধূ। ভ্রাতৃবধূটি দূর থেকে অনেকদিন পরে আজ এসেছেন। সুতরাং স্বভাবতই কিছু কুশল প্রশ্নাদি করা যেতে পারে। ভ্রাতৃবধূটি, পুনরপি, শিক্ষিত ও সমাজসচেতন। সুতরাং রাজনীতি নিয়েও আলোচনা চলে। ভ্রাতৃবর বাড়ির অমতে প্রেমজ বিবাহ করেছিলেন। সুতরাং প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক নিয়ে—না না, আমি তো আবার—ধন্য নিশানাথ, তুমি একজনের ভাসুর, তুমি একটি বধূর গুরুজন। বধূ শব্দটির অর্থ যেন আজই সে আবিষ্কার করল। কপালকুণ্ডলার মতো অস্ফুটে যেন বলল, বি-বা-হ। বাস্তবিক, তাহলে বিয়ে একটা ব্যাপার। আর কি বিরাট সে অভিজ্ঞতা। তাহলে এই বালিকা, সাধনা—সেও কত না অভিজ্ঞতার, আর সুনয়, সুনয়িনী, কত না অভিজ্ঞতার, আর আমি নিশানাথ কত না অভিজ্ঞতার···আচ্ছা, ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ যে সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে এক অপরিহার্য ঘটনা এ নিয়ে যদি সাধনার সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম দার্শনিক ধাঁচের আলোচনা উত্থাপন করি তাহলে হয়তো সবদিকই বাঁচে। কিন্তু বৌঠান নিশ্চয়ই তাতে অস্বস্তি বোধ করবে। কারণ এই মহিলাটির ছোটকুর বিয়েতে কম আপত্তি ছিল না।

স্বর্ণ বলল, ওঠো না ঠাকুরপো।

নিশানাথ ধড়মড় করে উঠে বসল। ইতিমধ্যে সে আবার শুয়ে পড়েছিল। বাসি মুখে সাধনার দিকে তাকাতে হঠাৎ তার সঙ্কোচ হচ্ছিল। ভাবল এইবার নিশ্চয়ই এই ভদ্রমহিলা বাজারে না যাওয়ার জন্য তাকে অভিযোগ করবে। বৌমা সামনে আছেন, তাহলে কিন্তু আমি অত্যন্ত অপমানিতবোধ করব ইত্যাদি ভেবে নিশানাথ উত্তেজিত হবার চেষ্টা করল।

স্বর্ণ বলল মন্টু কাল কি বলেছে জানো ?

ভীত নিশানাথ বলল, কি ?

স্বর্ণ বলল, বলছিল বড় হয়ে আমি কাকুর মতো হব। সব সময় শুয়ে থাকব আর বই পড়ব। স্কুলে যাব না, অফিসে যাব না, আমি বলেছি, আচ্ছা।

স্বর্ণ হাসতে লাগল। কিন্তু সাধনা হাসিতে যোগ না দিয়ে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের গা থেকে পুরনো দুটো মাসের পাতা ছিঁড়ে বলল, আপনার চাকরির ব্যাপারটার কি হলো ?

নিশানাথ বিব্রতভাবে বলল, কি আর হবে।

আপনি তাহলে মেনে নিলেন ?

নিশানাথ যেন জেরার জবাব দিচ্ছে এমন একটা সন্ত্রস্ত ভাব চোখে ফুটিয়ে বলল, কেন ?

বারে। পুলিশ রিপোর্টে চাকরি যাবে, কেন চাকরি গেল তার কোনো কারণ দেখাবে না—এ সবই তো সংবিধানের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটসের বিরোধী। আপনি এ নিয়ে কেস করতে পারেন।

নিশানাথ বলল, লাভ কি ?

সাধনা একটু থেমে আস্তে আস্তে বলল, লাভের সম্ভাবনা অবিশ্যি কম, তবে—

স্বর্ণ হেসে বলল, তবে কেস করে তুমি তো অন্তত দেখতে পারতে এরা কত খারাপ, এরা মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও—মানে, তোমার খরচে সাধনাদের খানিক প্রচার হয়ে যেত। কি বল্‌রে সাধনা ?

নিশানাথ অতীব ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, ঠিক সেইজন্যেই কেস করি নি। কিন্তু না করলে যে দাদার খানিকটে সুবিধে হয় একথা পরে বুঝতে পেরে না করার জন্য খুবই আপশোষ হচ্ছে।

স্বর্ণ বলল, সে কি ঠাকুরপো ? তোমার দাদার সুবিধে আবার কিসে করলে ? একটু বলো শুনি। এ একটা খবর বটে।

আহ্ বৌঠান। এই সকালবেলাটা বিষাক্ত করে দিও না। তোমার উপস্থিতি, তোমার চাউনি, তোমার ঠোঁটের কোণের হাসি, আহ্ বৌঠান, তুমি যাও, বাস্তবিক, তোমার এই ধূর্তামি দেখলে আমার বমি আসে।

নিশানাথকে নীরব দেখে সাধনা উত্তর দিল, সে তো ঠিকই। মেজদা কেস করলে বড়দার ইলেকশনে একটু অসুবিধে তো হতোই।

স্বর্ণ যেন স্নেহভরে ছোট বোনকে শাসন করছে এমন ভঙ্গিতে সাধনার পিঠে আলতো চড় মেরে বলল, ওরে মুখপুড়ী, সেই জন্যেই বুঝি এদ্দুর থেকে দৌড়ে এসে মেজদা মেজদা বলে ঠাকুরপোকে উস্কানি দিচ্ছ? দাঁড়া, তোর বড় ভাসুরকে আজ বলছি। এমনিতে তো বউমা বলতে অজ্ঞান!

সাধনা একটুও না দমে হেসে বলল, তোমাকে আর বলতে হবে না। বড়দাকে আমি নিজেই বলব—আমি এসেছি আপনার এগেইনস্টে ক্যাম্পেন করতে। আপনি কেন এদের নমিনেশনে দাঁড়াতে গেলেন। তুমিই বলো দিদি। বড়দা নিজে কতদিন কত সমালোচনা করেছেন। কত দুঃখ করেছেন। ডাক্তারী কলেজে ছাত্র ভর্তিতে দুর্নীতি, পড়ানোয় অব্যবস্থা, পাশ করলে ইনসিকিউরিটি, বেঁচে থাকবার জন্যে ডাক্তারদের রুগী হাতে রেখে চিকিৎসা করতে হয়, ওষুধে ভেজাল, প্রয়োজনের তুলনায় হাসপাতাল সংখ্যায় নগণ্য, যা আছে তাও যেন মর্গ, লাস্ট সেন্সাসে—

স্বর্ণ বাধা দিয়ে বলল, থাম থাম থাম। হ্যাঁরে, ছোট ঠাকুরপোর সঙ্গে তুই কি নিয়ে গল্প করিস বলতো? এই সবই বলিস নাকি?

সাধনা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে মাথায় ঘোমটা তুলে দিল। সে কথায় কথায় উত্তেজিত হয়েছিল। বিব্রতের মতো হেসে বলল, যাও। ইশারায় নিশানাথকে দেখিয়ে বলল, যা হচ্ছ না?

নিশানাথ বিমূঢ়ের মতো সাধনাকে দেখছিল। তার উত্তেজনা, তার লজ্জা দেখছিল। স্বর্ণ, মানে বৌঠান, কি ভাবে হেরে গিয়েও সাধনাকে থামিয়ে দিল এবং কিভাবে সাধনাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে আবার নিজেই যেন তাকে উদ্ধার করার মহত্ব দেখাল ইত্যাদি প্রসঙ্গে ভাবনা করতে করতে করতে করতে নিশানাথ বিমূঢ়ের মতো এক দৃষ্টিতে সাধনাকে দেখছিল, এমতাবস্থায় ট্রেতে করে চা সাজিয়ে হৈমন্তী ঘরে ঢুকল। পেছন পেছন মন্টু। মন্টু এসেই সাধনার কোল ঘেঁসে দাঁড়াল।

স্বর্ণ বলল, যাও পড়তে যাও।

মন্টু বলল, না, আজকে—

নিশানাথ উদগ্রীব হয়ে শুনতে চাইল কি ভাবে মন্টু কথাটা শেষ করে। মন্টু কি বলবে আজ তোমার সাধ। আজ পড়ব না? মন্টু কি বলবে, মা, মন্টু কি বলবে, মা, মন্টু কি বলবে, মা……

নিশানাথ হঠাৎ উপলব্ধি করল নিঃশব্দে সে মাকে ডাকছে। মাকে ডাকছি আমি। রোমাঞ্চিত হলো। আর লজ্জা হলো, ভয় হলো, কেমন যেন উদ্বেগ

একটা। তার পলকে মনে পড়ল মা বলেছিল মন্দিরে যাবে। মা বলেছিল। মন্দিরে যাব। মা স্বপ্ন দেখেছে। আমার সর্বাঙ্গে শুচি। আমি কাকুর মত শুয়ে থাকব। পাগল হয়ে যাচ্ছি। মা কেন এল না? এত হাসি শুনে, আমাদের এত হাসি শুনে, আমার এত হাসি শুনেও মা কেন এল না? কাল রাতে কোনো কথা কি হয় নি? তবে সাধনা? সাধনা এখানে কেন? সাধনা কি এ বাড়িতেই থাকে?

ধর্মাবতার ও জুরীমহোদয়গণ, বন্ধুগণ বন্ধুগণ, আলো অন্ধকার সিঁড়ির ওপর বন্দিনী। নতজানু হয়ে বসেছিলাম। ঘুমিয়ে পড়লাম। আ, ঘুম।

নিঃশব্দে মনে মনে জপতে লাগল—আমি কতকাল ঘুমোই নি। বড্ড আলো। আমি এবার ঘুমোব।

নয়

নিশানাথ বিস্মিত হয়ে বলল, কি ব্যাপার?

হৈমন্তী হাসল। বলল, ছোটবৌদি করেছে। ফাসক্লাস।

স্বর্ণ বলল, তবেই হয়েছে। চায়ের সঙ্গে খাদ্য? ঠাকুরপোর আর জাত থাকবে না।

নিশানাথ বলল কেন? বলেই বুঝল প্রশ্নটা ঠিক হলো না। হাত বাড়িয়ে ডিশটা নিতে গিয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। কৈফিয়তের ভঙ্গিতে লজ্জিত হেসে বলল, যাই মুখটা—

মন্টু হাততালি দিয়ে বলল, ওমা চায়ের আগে মুখ ধোয়। ওমা, চায়ের আগে মুখ ধোয়।

নিশানাথ দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে মন্টুর দিকে তাকাল। আ, মনে পড়েছে। রেস্টুরেন্টের সেই ছেলেটি—আর মন্টু হেসে আমার যাবতীয় জেসচারকে এই ভাবেই উড়িয়ে দেবে। টেবিলের ওপর থেকে ব্রাশটা টেনে নিয়ে প্রায় চোরের মতো সে বেরিয়ে গেল।

বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিশানাথ হাঁপাতে লাগল। কি ব্যাপার? আজ সকালে এরা আমার ঘরে একটা মনোরম পারিবারিক আবহাওয়া ফোটাতে চাইছে কেন? বিচার করতে চায় কি? আর মন্টু, আহ্ মন্টু—আমিই বা সাধনাকে এত মূল্য দিচ্ছি কেন?

বেসিনের কল খুলতেই তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। উজ্জ্বল সূর্যালোকে প্রশস্ত স্নানাগার সে দেখল, জ্বলছে। আর সিঁড়ি। বন্দিনী। কোথায়

দেখেছি? আলো-অন্ধকার, প্রতিমার মতো চিবুক, একটি চোখে পলক পড়ে না। এক হাতে শক্ত করে বেসিনটা চেপে ধরল। সামনে আয়নায় প্রতিবিম্ব পড়ল। অস্পষ্ট, কারণ আয়নার কাঁচ বহুদিন পরিষ্কার করা হয় নি, নিশানাথ অতীব, অতীব বিরক্ত হলো। সে লক্ষ্য করল বেসিনের কানাচ ভাঙা, একটা সোপ-কেসে সাবান নেই, অন্য একটায় শুকনো গোবর, ঝাঁঝরির কাছে দেওয়ালটি হলুদ, পাথর বসানো মেঝেয় যত্নের কোনো ছাপ চোখে পড়ে না। আর, কেমন একটা চাপা দুর্গন্ধ।

নিশানাথ নিঃশব্দে হাসতে লাগল। আমাদের বাড়ি, আমাদের পরিবার। এই কলকাতা শহরটা। মধ্যযুগীয় অথচ আধুনিক। আধা গ্রাম, আধা ইওরোপ। আর রুচিহীন সচ্ছলতা ও দৈন্য। নিঃশব্দে হাসতে লাগল। এই বাড়িটাকে ঘৃণা করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সে পুনরায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল। তার মাথা-ধরাটা ছেড়ে গেল। নিশানাথ টিউব টিপে পেস্ট বার করল। টিউবের মাঝখানে কে টিপে রেখেছে। সে যারপরনাই খুশি হলো। চারদিকে অশিক্ষা ও যত্নহীনতার প্রগাঢ় ছাপ। বেশ সময় নিয়ে অভিনিবেশ সহকারে দাঁত মাজল। তারপর রীতিমতো একটা ভঙ্গি করে যেন শতাব্দীকাল পরে দর্পণে নিজের দাঁতগুলির চেহারা নিরীক্ষণ করতে গেল। দেখল সবুজ থুতু রক্তধারার মতো তার ঠোঁটের কোণ বেয়ে নামছে। আর অস্পষ্ট একটা মুখ।

আমার সমস্ত রক্ত যদি সবুজ—মানে দূষিত, মানে আমি কি এতদিনে, যদিও জানি পেস্টের রঙ, তথাপি কে বলতে পারে সেই নায়কের মতো রক্তে আমার, সেই নায়ক, রক্তে আমার, মা বলেছিল আজ মন্দিরে যাবে, সুনয় বলেছিল আজ তোমার জন্মদিন, আর প্রিয়গোপাল তার ডায়েরিতে আমাকেই দায়ী করে গেছে। তবু সাধনা বলল, আপনি মেনে নিলেন?

নিশানাথ অকস্মাৎ স্থির করল আজ সে সাধনাকে প্রকৃত অর্থে অপমান করবে। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে বাইরে এল। লক্ষ্য করল দিব্যনাথ বারান্দায় দাঁড়িয়ে উৎকর্ণভাবে তার ঘরের হাসাহাসি, সংলাপাদি শুনছে। নিশানাথকে দেখে দিব্যনাথ অপ্রতিভ ভঙ্গিতে সরে গেল। নিশানাথ অত্যন্ত চিন্তিতভাবে তার ঘরে ঢুকল।

চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আবার বসিয়ে এসেছি।

নিশানাথ গাম্ভীর্য সহকারে তার সদ্য পরিষ্কৃত খাটের ওপর রাজকীয় ভঙ্গিতে

বসে হাত বাড়িয়ে প্লেটের খাবারটি নিয়ে বলল, তারপর সাধনা, তোমাদের খবর কি ?

সাধনা মৃদু হেসে বলল, ভালোই।

ছোটকু কোথায় ?

উনি তো আসেন নি।

সাধনা কি তার স্বামীর নাম ধরে ডাকে না? আড়ালেও না? আর মিটিংয়ে বসে আলোচনার সময়ও কি বলে কমরেড উনি যা বললেন,—নিশানাথ মনে মনে দৃশ্যটি উপভোগ করে বলল, কেন ?

স্বর্ণ বলল, নারে, কাজের মানুষ তো।

মন্টু হেসে বলল, উঃ, যে না কাজ।

নিশানাথ মন্টুকে বলতে চাইল, চুপ। বলল, আজ ঠিক এনে দেব।

মন্টু বলল, চাই না।

হৈমন্তী বলল, ভুলে যাও তো কেন রোজ রোজ—স্বর্ণ বলল, থাম তো। ভারি একটা ব্যাপার যা মনে রাখতেই হবে আর ভুলে গেলে তোকে পর্যন্ত কৈফিয়ৎ—

নিশানাথ হঠাৎ বলল, তারপর, তোমাদের রাজনীতির—

সাধনা হাসল, মোটামুটি।

ইলেকশনে—

দেখা যাক।

নিশানাথ উত্তেজিত হয়ে বলল, কি দেখবে? কেরালায়ও শিক্ষা হয় নি ?

সাধনা হেসে বলল, হয়েছে বৈ কি। মেজদা আপনাকে বলছি, কেরালায় আমরাই জিতেছি। ইতিহাস একদিন একথা বলবে।

হৈমন্তী বলল, চলো বৌদি। পলিটিকস।

স্বর্ণ বলল, বোস না একটু। শোনাই যাক—

নিশানাথ বলল, ইতিহাস? তোমাদের এই এক মহৎ গুণ সাধনা। ইতিহাসের চরিত্র আর ভবিষ্যৎ শুধু তোমাদেরই নখদর্পণে। ঈশ্বর বিশ্বাসের মতো তোমাদের এই আরেক ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় বিশ্বাস।

সাধনা মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে বলল, মেজদা আপনিই একটা গল্প বলেছিলেন।

নিশানাথ পলকে সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, কি ?

যুদ্ধের সময় বোজ বাশিয়া হারছে, প্রত্যেকে বুঝতে পারছে আর রক্ষে নেই। আপনি সেই শিবানীবাবুর গল্প বলতেন? আপনাদের কোন ব্রাঞ্চ, না না, লোকাল কমিটির অফিস সেক্রেটারী ছিলেন? আপনিই বলেছেন ভাঙা অন্ধকার ঘরে নড়বড়ে একটা টেবিলের সামনে বসে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ভদ্রলোক রোজ বলতেন, উঁহু, অসম্ভব। আপনিই বলেছেন বঙ্কিমদার কথা। রোজ টেবিলে ম্যাপ খুলে পেন্সিল দিয়ে দাগ টেনে তিনি দুপক্ষের স্ট্রাটেজি বিচার করে গর্জে উঠতেন, উঁহু, অসম্ভব। মেজদা—এই বিশ্বাসের পেছনে অন্ধ বিশ্বাসই শুধু নেই—তা আপনি বেশ জানেন।

সত্য বটে, একদা এই গল্প বলেছি। একদা। কিন্তু সাধনা তা জানল কি করে? ছোটকু কি আমার সম্পর্কে তার স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে? আর, দিব্য, সে বাইরে দাঁড়িয়ে কি শুনছিল?

নিশানাথ হাসি ফুটিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। নইলে প্রমাণ করতে পারতাম বিশ্বাস মাত্রেই অন্ধ, এমন কি বিশ্বাসহীনতাও এক বিশ্বাস এবং তা-ও অন্ধ। এবং এই অন্ধতাই জীবন।

সাধনা হেসে বলল, মেজদা, আপনি দার্শনিকতায় চলে যাচ্ছেন। তবে আমার দর্শনে অন্ধতা নেই, তা নিয়ত বিকাশশীল। তাছাড়া আপনি তো জানেনই, দার্শনিকতা প্রচুর হয়েছে। এখন দি কোয়েশ্চেন ইজ টু চেঞ্জ।

নিশানাথ অপলক তাকিয়েছিল। সাধনার স্পর্ধিত বিনয়, অসংকোচ প্রত্যয়ে সে অতীত দেখছিল। তার নিষ্পাপ অতীত। গ্রন্থে, অভিজ্ঞতায়, বিশ্বাসে এমনই বিশ্বাসী ছিলাম। এমনই পবিত্র। সমস্ত পৃথিবীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নিজের মুঠোয় পেতাম। সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার ছিলাম আমি, আমরা। তারপর ঘা খেয়ে খেয়ে, ঘা খেয়ে খেয়ে, ঘা খেয়ে খেয়ে পাঁকে ডুবে গেলাম। বুঝলাম কি সীমাহীন অন্ধতাকে, কি ব্যাপ্ত মূর্খামিকে পবিত্র বিশ্বাস বলে আঁকড়ে রেখেছিলাম। বুঝলাম সেই যে বিশ্বাস, আমি বদলে দেব, আমি ইতিহাস হব—আসলে কি ভ্রান্ত, ফাঁকা। বুঝলাম কিছুই আমরা করি না—আমাদের করানো হয়।

নিশানাথ বলল, বেশ বললে, টু চেঞ্জ। বাট মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড—হু ইজ টু চেঞ্জ, হোয়াট ইজ টু চেঞ্জ? মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড—তুমি এখনো শিশু। কদ্দিন পার্টি করছ?

সাধনা মুখ তুলে দীপ্ত চোখে বলল, মেজদা, এই কথাটি আপনাকে বলছি, আমায় ক্ষমা করবেন। হ্যাঁ, বয়েস আমার কম, অভিজ্ঞতাও কম। কিন্তু

আপনি তো জানেন বয়েস বা অভিজ্ঞতার দুয়েরই কোনো শেষ নেই। আমি দেখেছি আমাদের মধ্যেও পুরনো কেউ কেউ এই একই কথা বলে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

সাধু সাধু ভ্রাতৃবধূ। হাততালি দেব কি? ঠিক এইভাবে, ভ্রাতৃবধূ, ঠিক এইভাবে একদিন আমি, আমরাও বয়েস এবং অভিজ্ঞতা শব্দ দুটিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছি। সাধু সাধু ভ্রাতৃবধূ। ঠিক এইভাবে একদিন আমি, আমরা নিজেদের বিশ্বাসের কাছে অনুগত থাকার স্পর্ধা অর্জন করেছি। তাহলে একটা গল্প বলি শোনো। তোমার এই চাকর সদৃশ ভাসুরটিও একদা অনুরূপ এক মতবিরোধের কালে শ্রদ্ধাস্পদ মাস্টার-মশাইকে বলেছিল পাড়ার মোড়ের বুড়ো কনস্টেবলেরও বয়স অনেক, তার কপালের ভাঁজেও অনেক অভিজ্ঞতা। শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর চোখে বেদনা প্রকাশ পেল। আমি পুনরপি বলেছিলাম, আসলে এ আপনার এসকেপিজম, আপনার সিকিউরিটির লোভ। তাকে র‍্যাশনা-লাইজ করেছেন অভিজ্ঞতা, দূরদৃষ্টি এবং বয়েসের দোহাই পেড়ে। আর শোনো ভ্রাতৃবধূ, তারপর প্রবল উপেক্ষায় আমি চলে এসেছিলাম, গর্ব করে সকলকে বলেছিলাম গল্পটা। প্রত্যেকে তাঁকে ঘৃণা করেছিল। বিদ্রূপ করেছিল। কিন্তু তারপর একদিন আমাদেরই ভুল স্বীকার করতে হলো।

নিশানাথ অসংলগ্নভাবে, উত্তেজিতভাবে শুরু করল, অনেক জ্বালায় বলি সাধনা, তুমি বুঝতে পারবে না। আমি জানি বয়েসের দোহাই দেওয়াটা এক ধরনের অশ্লীলতা (ভাল্‌গারিটি বলা উচিত ছিল কি?)। অনেকগুলো বাঁক পেরিয়ে আজ এইখানে এসে দাঁড়িয়েছি। প্রকৃতপক্ষে আমার বয়েস কয়েক শতাব্দী। অথচ সামনে কিছু নেই, পেছনটাও ফাঁকা। তুমি বুঝতে পারবে না সাধনা।

নিশানাথের আরক্ত মুখের দিকে সকলেই অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। এমনকি মন্টুও। সাধনা ক্ষণেক নীরব থেকে আস্তে আস্তে শুরু করল, বুঝি মেজদা। কিন্তু এই তো নিয়ম। ভুল তো হবেই। পৃথিবীর—

ভুল? নিশানাথ চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল, তুমি তো দেখ নি, সেই উন্মাদনা, সেই ত্যাগ, সেই অমানুষিক অত্যাচার আর বর্বরতার সামনে, আহ্‌ সাধনা, তুমি তো দেখনি—শত শত নিষ্পাপ বিশ্বাসের ওপর দিয়ে ঐতিহাসিক অনিবার্যতার রথে চাকা চলে গেল। আর হতবাক একদিন বুঝলাম সমস্তটাই ভুল। অথচ কত সঙ্গী মরে গেল, কিছুজন পঙ্গু হলো।

হতাশায় গ্লানিতে ক্ষোভে কেউ বা ক্লীব হলো। তুমি তো জানো না সাধনা। ভাই ভাইকে শাস্তি দিয়েছে, কারণ সে জানত বদলাতে হবে। পুত্র মাকে কাঁদিয়েছে, পিতা সন্তানকে মরতে দেখেও ফেরে নি, প্রেমিক প্রেমিকাকে মিছিলে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে দেখেছে—সাধনা, তুমি কি জানো না? তোমরা এখন ইলেকশন করো, শান্তি আন্দোলন করো, পীসফুল সহাবস্থানের জন্য নেহরুর সামনে কুর্নিশ জানাও। সাধনা, পুলিশের বুটের তলায় তোমার প্রিয়জনের হাত পিষ্ট হতে দেখেছ? জেলখানায় যে ব্যারিকেড বানিয়ে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, চল্লিশ দিন অনশন করে হার মানে নি—হঠাৎ যখন তাকে বুঝতে হয় সবটাই ভুল, তার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখেছ সাধনা? তাদের কেউ আজ কেরানী, কেউ মাস্টার, কেউ বা উন্নতির জন্য এই বয়েসে পরীক্ষায় বসে—তুমি তাদের চেনো সাধনা? উজ্জ্বল ছেলে—সব বিসর্জন দিয়ে একদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, পরাভূত, একদিন সব ছেড়ে আবার ঘরে ঢুকতে চাইল, পারল না, আত্মহত্যা করে তাকে ভুলের মাশুল দিতে হলো—কারণ নিজেকে সে ভাবত ঘাতক, ভাবত এই সামগ্রিক ভুলের দায়িত্ব থেকে সেও রেহাই পেতে পারে না। যে বন্ধুটি তাকে এই কথা বুঝিয়েছিল মৃত্যুর জন্য তাকে সে দায়ী করে গেল, বন্ধুকে ঘৃণা করে গেল। আর সেই বন্ধুটি! তুমি দেখেছ সাধনা বিশ্বাসের মৃত্যু, ঘৃণার জন্ম, সন্দেহ আর অপরাধবোধের নিয়ত অস্তি।

সাধনা আস্তে আস্তে বলল, মেজদা, আপনার যন্ত্রণা আমি বুঝি।

নিশানাথ বলল, একটা ভুল করো না। যা বললাম, এ সবই আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়। সেই আমলেও আমাকে এত সইতে হয় নি। তবে দেখেছি, শুনেছি। ভুগেওছি কিছু। আমি একটা জেনারেশনের কথা বললাম। আরও আছে সাধনা। পৃথিবীর দেশে দেশে মানুষ মার খাচ্ছে। মার খাচ্ছে আর একটা নিশ্চিন্ত অকুণ্ঠ বিশ্বাসে ধ্রুবতারার মতো একটি দেশের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, একটি জানলার দিকে, যেখানে বাতি জ্বলে আর একখানি মুখ অতন্দ্র প্রহরা দেয় পৃথিবীকে। সেই জানলায় তোমরা পর্দা টেনে দিলে, সেই বাতি তোমরা নিভিয়ে দিলে। নিজের দেশে ভুল হলেও এতদিন জানতাম অনির্বাণ শক্তি আছে পৃথিবী জুড়ে, আমি একা নই। আমি জানলাম সেখানেও ভুল, সেখানেও সংশয়। ঘরে বাইরে মানুষ আজ একা। তার কোনো অভিভাবক নেই। সভ্যতার, মনুষ্যত্বের এত বড় সংকট পৃথিবীর ইতিহাসে আগে আসে নি সাধনা।

বলো ভ্রাতৃবধূ, উত্তর দাও। তোমার দীপ্ত মুখ প্রত্যয়পূর্ণ চোখ এবার নত হোক। অকুণ্ঠ আত্মবিশ্বাসে মুখ তুলে তাকানো আমি দেখতে পারি না। সব ঠিক আছে, সব ঠিক হয়ে যাবে—এই একটা ভাব করে ঘুরে বেড়ানো, আ অশ্লীলতা। এর থেকে বৌঠান সহনীয়। সে ছোটো, তাব সমস্যাও ছোটো। বুঝতে পারি। কিন্তু চূড়ান্ত বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও তোমাদের এই নিরুদ্বেগ থাকার ঔদ্ধত্য সহ্য হয় না। ভ্রাতৃবধূ, স্বীকার করো, আজ ঘরে বাইরে আগুন। স্বীকার করো আশা কবার কিছু নেই, তবে সম্ভাবনা ছিল প্রচুর।

না মেজদা, সাধনা বলল, আমি মানতে পারলাম না। পৃথিবীতে এত বড় সংকটের দিন আর আসে নি, একথা সত্যি। আবার এতবড় সম্ভাবনাও এর আগে এমন বাস্তব চেহারা ধরে নি। মানুষ জিতেছে। প্রকৃতিকে সে ক্রীতদাস করেছে। এখন স্বর্গলোকে তাব যাত্রা। মানুষ জিতেছে মেজদা। মহাকাশে উপনিবেশ গড়ছে সে। এর তাৎপর্য কি করে ভুলি? আমি জানি আপনি বলবেন, তাতে পৃথিবীর সমস্যা কি মিটেছে? না মেটেনি। কিন্তু দেখেছেন কি মানচিত্র কি দ্রুত পাল্টাচ্ছে? দেখেছেন কি আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি আজ কোন্ দিকে? আমি আপনাকে অঙ্ক কষে হিসেব করে দেখাতে পারি পৃথিবী থেকে উপনিবেশবাদ নিশ্চিহ্ন হতে বাকি নেই। মানুষ স্বাধীন হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতায় পুঁজিবাদ ক্রমশ কোণঠাসা। আজ পৃথিবীর ভাগ্য এতদিন যে বিধাতাদের হাতের মুঠোয় ছিল, নিজেদের মর্জি মাফিক এতদিন যারা দেশ ও মানুষেব নিয়তি বাঁটোয়ারা করে নিত—আজ তাদেরই চোখেব সামনে সমাজতন্ত্র এক বিশ্ববিধান। আজ পৃথিবীর ভাগ্য নির্ধারণের প্রকৃত ক্ষমতা সমাজতন্ত্রেরই হাতে। দু-দুটো মহাযুদ্ধ বাধিয়ে, একেব পর এক ষড়যন্ত্র কবেও সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি রুদ্ধ করা গেল না। আপনি বললেন জানলা আমবা বন্ধ করে দিয়েছি, আলো নিভিয়েছি? না মেজদা, না, দেশে দেশে জানলা খুলে যাচ্ছে, আলো জ্বলে উঠছে। মানুষ মবীয়াব মতো লড়েছে এবং এখনও মুখ তুলে তাকিয়ে দেখছে ধ্রুব নক্ষত্র আছে—শুধু ক্রেমলিনে নয়, পিকিংয়ে, দেশে দেশে। আপনি বললেন আন্তর্জাতিক আন্দোলনে ভুলের কথা। হ্যাঁ, স্বীকাব করছি, আমাবও ভিতশুদ্ধ কেঁপে উঠেছিল। হ্যাঁ, আমিও চিন্তিত। কিন্তু আপনি তো জানেন এতৎসত্ত্বেও পৃথিবীব একাশিটি পার্টি আজও সাম্যবাদের মূল প্রশ্নগুলিতে ঐক্যবদ্ধ। আপনি তো জানেন এই তথাকথিত বিরোধেব পবও পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রই জয়লাভ কবছে। হ্যাঁ, কোনো ব্যক্তি আব

অভিভাবক নন, কোনো একটি মাত্র দলও নয়। আসলে মার্কসবাদ, সমাজতান্ত্রিক শিবির, মানুষের শুভবুদ্ধিই ইতিহাসের অভিভাবক। তাই আমেরিকার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে কিউবা আজ বিপ্লবের পথে, সুয়েজ থেকে ব্রিটিশ রণতরী পালায়, ভিয়েৎনামে হো চি মীন রূপকথা হন—কেউ একা নয়। তাই চোখের সামনে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস দেখে শুধু বিলাপ করে আর মৃগী রোগীর মতো হাত পা ছোঁড়ে কিন্তু ইতিহাসের মুখ ঘোরাতে পারে না। ভুল করা আর বিভক্ত হওয়া এক নয় মেজদা। সমাজতন্ত্র একটা জীবন্ত ব্যাপার। মার্কসবাদের নিয়মেই সমাজতন্ত্রের প্রয়োগে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। মার্কসবাদের নিয়মেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনেও কনট্র্যাডিকশন ইনএভিটেবল। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিবির আজ সাবালক, তাই সে প্রকাশ্যে ভুল আলোচনা করে, স্বীকার করে—যাতে তার অভিজ্ঞতা দেখে অন্য দেশে তার পুনরাবৃত্তি না হয়। তা ছাড়া কত বড় পার্টি ও কি সীমাহীন আত্মবিশ্বাস থাকলে এই ভুল প্রকাশ্যে তুলে ধরা সম্ভব দেখেছেন? মানব নিয়তি সম্পর্কে কতখানি আগ্রহ থাকলে এই ভুল স্বীকার করে অন্যদের সাবধান করে দেওয়া সম্ভব ভেবে দেখেছেন। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আত্মসন্তুষ্টির ভাব ভেঙে দিতে পারে সমাজতন্ত্রই। কোনো ব্যক্তি বা পার্টিকে অভিভাবক ভেবে নাবালক সেজে থাকার চেয়ে বড় হও, নিজের বাস্তব অবস্থার অনুধাবন করো, ভুল করতে করতেও বড় হও, তোমার বিপ্লব তোমাকেই করতে হবে—তা বোঝা—এই শিক্ষাকে আপনি সংকট বলেন? সব থেকে মানবিক দর্শন ঐতিহাসিক কারণে যে গোঁড়ামির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল—তার থেকে মুক্তি চাইছে—শিল্প বিজ্ঞান, জীবনের সর্ব দিকে সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছে—একে আপনি অভিনন্দিত করবেন না?

সাধু ভ্রাতৃবধূ, সাধু। চমৎকার বলেছ। ওজস্বিনী বক্তৃতা, ঘোমটাটি খসে পড়ায় কানের পাশে চুলের গুছি কুঁড়ির মতো যেন বা ফুল হয়ে ফুটবে। সাধু ভ্রাতৃবধূ, সাধু। যদিও উত্তেজনায় তোমার বক্তব্য এলোমেলো, যদি তোমার মূল পয়েন্ট সম্ভবত ঠিক থাকলেও তা যথেষ্ট যুক্তিসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারো নি—তথাপি তোমার দীপ্ত ভঙ্গি ও সুষ্ঠু ভাষা প্রয়োগ সত্যিই প্রশংসার্হ।

সাধনা বলল, আর আমাদের দেশের কথা? মেজদা, আপনার কি ধারণা আমরা খুব সুখে রাজনীতি করি? স্কুলে, কলেজে, সরকারী অফিসে কারোর ভাই কমিউনিস্ট হলেও তার চাকরী হয় না। আপনি নিজের কথা

ভেবে দেখুন। সেই করে কি করেছেন, আজ দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই—তবু পুলিশ রিপোর্টে আপনার চাকরি গেল। আমাদের দেশে ধনতন্ত্র ক্রমশ ম্যাচিওর হয়েছে। ছলে বলে কৌশলে শ্রমিক আন্দোলনকে সে পর্যুদস্ত করতে চায়। একদিকে তার প্রলোভন—অন্যদিকে তার অমানুষিক উৎপীড়ন। আপনি জানেন, মেজদা, কতদিন আপনার ভাইকে আমি পয়সার অভাবে—আপনি জানেন মেজদা গাঁয়ে কি কষ্টে আমরা থাকি। আপনি জানেন আজ এই বাজারেও পঞ্চাশ টাকা মাইনে নিয়ে কত কর্মী দিন কাটাচ্ছে। যারা অনায়াসে সুখে থাকতে পারত, যাদের প্রাক্তন সঙ্গীরা আজ যথেষ্ট আরামে দিন কাটায়—সেই তারা কত কষ্টে আর কি বিশ্বাসে লড়াই করছে। আপনার ধারণা আমি শুধুই ইলেকশন করি, শান্তি করি। মেজদা, এগুলিও তো আন্দোলন। শান্তি আন্দোলনের সার্থকতার ওপর পৃথিবীর অস্তিত্ব নির্ভর করে। কলকাতার দেওয়ালে কাঁচা হরফে খবরের কাগজে লেখা শান্তির পোস্টার দেখে যাঁরা একদিন হেসেছিলেন, পৃথিবীব্যাপী শান্তি আন্দোলনের প্রসারে তাঁরাও আজ স্তব্ধ। তাই ধনতন্ত্রকে যেমন সমাজতন্ত্র, তেমনই শান্তির বুলি আওড়াতে হচ্ছে। এই তো আন্দোলনের সার্থকতা মেজদা। তা ছাড়া গাঁয়ে যান, কারখানায় যান—আপনি দেখবেন মালিকপক্ষ, পুলিশ আর গুণ্ডার অত্যাচারের সীমা নেই। একদিনের বীরত্ব নয়, একটা সময়ের লড়াই না, প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত এই অত্যাচার আর গুণ্ডামীর সঙ্গে লড়াই করে কাজ। মেজদা আপনি ভুলে গেছেন ট্রাম, শিক্ষক, খাদ্য আন্দোলনের কথা। কত রক্তপাত, কত অশ্রু। বুঝি আপনাদের যন্ত্রণা। কিন্তু সরে থাকা, ভয় পাওয়া কি সমাধান? মেজদা, পৃথিবীর কোন্ দেশে মুক্তির আন্দোলনে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করতে হয় নি? কোন্ দেশেই বা মুক্তির আন্দোলন প্রথমাবধি নির্ভুল সরল ছিল? কোন্ দেশেই বা রাতারাতি বিপ্লব হয়েছে? ভুল কি শুধু আপনারাই করেছেন? আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কি অজস্র ভুলের ইতিহাস নয়? আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কি অনুরূপ ত্যাগ ও লাঞ্ছনার ইতিহাস নেই? আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কি খণ্ডিতভাবে হলেও শেষ অবধি সফল নয়? আপনি কি চেয়েছিলেন মেজদা? দেশের মুক্তি, মানুষের মুক্তি? তার মূল্য তো দিতেই হবে, দিতেই হয়। ইতিহাস তো ভুলে যাবে। ভুলে যায়। তবু কি মানুষের কর্তব্য থেকে সরে যাবার অধিকার আপনার আছে, উপায় আছে? মেজদা,

লেফ্‌ট্‌ পিরিয়ডের যে দু-একজনের কথা বললেন, শুধু কি তাঁরাই সত্য? আর কয়েক সহস্র মানুষ—যাঁরা তারপর নতুন উদ্যমে শুরু করেছেন, একেবারে গোড়া থেকে শুরু করেছেন—তাঁদের কথা ভোলেন কি করে? যাঁরা ভেবেছিলেন কালই বিপ্লব হবে—যাঁরা সেই আবেগে যে কোনো ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন—তাঁরা আবার সর্বত্র নতুন করে ছড়িয়ে পড়েছেন। আন্দোলন করছেন। বিপ্লব ভাবাবেগ নয় মেজদা। তার পেছনে বৈজ্ঞানিক কার্য কারণ সম্পর্ক আছে। বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্ত কোনো ঘটনা নয় মেজদা, তার বাস্তব সম্ভাবনাকে বাস্তব আকার দিতে হয়। তাই ঠিকই বলেছেন। আমাদের অনেকেই আজ নতুন করে পরীক্ষা দিচ্ছেন, চাকরি খুঁজছেন—তার কারণ আমরা বুঝেছি এখন বেঁচে উঠতে হবে আর সেই সঙ্গে নিয়ত, অবিরত সংগ্রাম। আজ বেঁচে থাকাটাও সেই লড়ায়ের অংশ।

আহ্‌ অশ্লীলতা। নিশানাথ অতীব বিরক্ত হলো। লড়াই, সংগ্রাম, বাস্তবতা এই সব বহু ব্যবহৃত শব্দগুলি শুনলে গা বমি বমি করে। শব্দতত্ত্ব বিষয়ে কিছু বক্তৃতা দেব কি? আসলে ভাদ্রবধূ, আমি জানি যে কোনো বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি তৈরি করা যায়। তা ছাড়া ডায়ালেকটিক্‌স্‌ এমনই এক দৈব ওষুধ যাতে কোনো ঘটনাই ব্যাখ্যার অতীত নয়। সোভিয়েতের সাফল্য, ব্যর্থতা, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের চরিত্র—সবই তুমি ব্যাখ্যা করতে পারো। আসলে বিশ্বাস। তাই বলছি ভ্রাতৃবধূ, আমি জানতাম কি বলবে। তোমার কথাগুলি আমিই আরো যুক্তিসহ বলতে পারি। কিন্তু ঘণ্টা পড়ে গেছে। এর থেকে বৌঠানের সঙ্গে কিছু ছ্যাবলামি করা যাক।

অবশ্য বৌঠান ও হৈমন্তী অনেক আগেই উঠে গেছিল। মন্টু ঘরের দেয়ালে একটা পিঁপড়েকে হাতের কৌশলে অনর্থক দৌড় করাচ্ছিল। নিশানাথের খুব ক্লান্তি লাগল। অথচ সাধনার মুখে চোখে বিরক্তি, ক্লান্তির কোনো ছাপই নেই। সে যেন আরও কয়েক ঘন্টা অনায়াসে তর্ক করতে পারে। নিশানাথের অতীব রাগ হলো। এই সমস্ত ক্রুসেডাররা সময়ে কিছুতেই হার মানবে না। পরে যেদিন পেছন ফিরবে, দেখবে বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

বৌমা এই ঘরে? মচমচ করে জুতোর শব্দ তুলে গম্ভীর ডাক দিয়ে কৃপানাথ ঘরে ঢুকল। নিশানাথ প্রায় স্তম্ভিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। সাধনাও তাড়াতাড়ি ঘোমটা দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর হেঁট হয়ে বড়দাকে প্রণাম

কবল। কৃপানাথ বলল, তারপব কি থবব? হাউ ইজ ছাট প্রেটি ইয়াং চ্যাপ?

সাধনা মৃদু হাসল। কৃপানাথ ঘবের চাবদিকে একবাব চোখ বুলিয়ে বলল, হবিবল। নিশানাথের দিকে তাকিয়ে বলল, ঘরেব কি চেহাবা? অসুখ নাকি?

নিশানাথও ভাববাচ্যে উত্তব দিল, না।

হৈমী, হারি আপ।

হৈমন্তী আব স্বর্ণ একটা টেপ বেকর্ডাব মেসিন ঘবে নিয়ে এল। কৃপানাথ বলল, বৌমা, আমাব ইলেকশান স্পীচের টেপ। তোমার মতো তো নয়। জীবনে এই প্রথম বক্তৃতা দিচ্ছি। ভালোই হলো। এসে গেছ। তুমি নিজে শুনে বলো কেমন বক্তৃতা দি।

স্বর্ণ খিলখিল করে হেসে বলল, পোড়াকপাল। শেষে বৌমাব সার্টিফিকেট্।

কৃপানাথ বলল, হোয়াট্ ইন ছাট? বৌয়ের সার্টিফিকেটের দিন কি চিরকালই চলবে? তাছাড়া তোমরা কি বুঝবে বক্তৃতার?

হৈমন্তী বলল, ও, আমরা বুঝব না, বুঝবে শুধু বৌদি? ঠিক আছে, চলো বৌঠান, আমরা যাই।

কৃপানাথ বলল, ইউ বুডি। ডোণ্ট বি ফুল। যাও মাকে ডেকে নিয়ে এসো। হোয়্যাব ইজ সী, বাসন্তী? অরু কোথায়? অহ্ ইয়েস, মেজবাবুকেও ডাকো। আচ্ছা, না হয় ফাদারেব ঘবে গিয়েই সকলে—না না থাক। মনটু এখানে এসো। তোমাব বাবার বক্তৃতা। বুঝলে, আমাব কোলের কাছে দাঁড়িয়ে শোনো।

নিশানাথ বিমূঢেব মতো তার দাদার দিকে তাকিয়ে রইল। প্রৌঢ দাদা, বোধহয় একযুগ বাদে তাব ঘবে ঢুকলেন। নিশানাথ লক্ষ্য কবল দাদার কানের কাছে চুলে পাক ধরেছে। আব তাঁর পৃথিবীতে কোনোই বদল নেই। এখন টেপ রেকর্ডে তাঁর বক্তৃতা শুনতে হবে। তার ইচ্ছে হলো সকলেব মুখেব ওপর হা হা কবে হেসে ওঠে। বা তাব মনে হলো সে যেন স্বপ্ন দেখছে। বা সকলে যেন তাব চারপাশে জড়ো হয়েছে কি একটা গভীব উদ্দেশ্যে। অথচ মা এখনও এল না। তাহলে কি বাস্তবিকই কাল কোনো কথা হয় নি। বৌঠানেব সাধ? সচ্ছল সুখী নিরুপদ্রব দাদা সামাজিক সম্মানের পথে ঝুঁকেছেন। ইলেকশনের বক্তৃতা শিশুর আনন্দে

টেপ করে বাড়ির সকলকে শোনাতে চাইছেন। আর দাদা, কত খুসী তুমি। বৌঠান, তোমার গর্ব আনন্দ গোপন করার চেষ্টার রূপটি কি অপরূপ। স্বামীগর্বে গর্বিতা, আ বৌঠান, তুমিও এই মুহূর্তে কত সুন্দর। আর সাধনা, কেমন বিব্রত অথচ সস্নেহ দৃষ্টিতে বড়দাকে দেখছে। যদিও সে ঘৃণা করে। আমি? ঘৃণা নেই, আসক্তি নেই, আমি, হায়, এখন কি করব?

তারপর বিশ্রী একটা শব্দ করে মেসিন চলতে লাগল। নারীকণ্ঠে গান। স্বর্ণ খিলখিল করে হেসে উঠে সাধনার পিঠে চিমটি কেটে বলল, হ্যাঁ গা, গলাটা এমন পেলে কোথায়?

কৃপানাথ খুব খুশী হয়ে বলল, ইডিয়ট। এটা একটা উদ্বোধনী সঙ্গীত। তারপর তো বক্তৃতা। দেখো বৌমা, তোমাদের যা ঠুকেছি না।

নিশানাথ অপলক ঘাড় হেঁট করে বসে রইল। এখানেও দুটি পক্ষ। দাদা আর সাধনা। বৌঠান স্বামী গর্বে গর্বিতা। মনটু, বোধহয় ও সাধনার পক্ষ। আর আমি? একা।

তারপর কৃপানাথের বক্তৃতা সুরু হলো।

দশ

আমি ভেবে দেখেছি, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্র হলো হিজিবিজবিজ। সেই যে সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল জীবটি—অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্যা ছিল যার, পৃথিবীর তাবৎ নদীর জল ডাঙ্গায় উঠে এসে যাবতীয় স্থলভূমিকে পেছল করে দিলে প্রতিটি মানুষ যখন আছাড় খেয়ে পড়বে—কল্পনায় সেই দৃশ্য দেখে গাছতলায় হাত পা ছুঁড়ে হেসে যে আকুল হয়েছিল—বাস্তবিক তার তুল্য ঋষি-দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা আছে কার?

দাদা মহাশয়, তোমার এই আত্মতৃপ্ত-গৃহস্থমার্কা হাসি আর বুড়ী বেশ্যার ব্রতকথা আওড়াবার ঢঙে বক্তৃতা—আহ্ অশ্লীলতা। যদি হিজবিজবিজের মতো হাত-পা ছুঁড়ে, সর্বনাশ, যদি হেসে উঠি, পালাও নিশানাথ, পালাও। এরা সকলে তোমাকে চিড়িয়াখানার জন্তু ভেবে ফুর্তি করতে ঘিরে বসেছে। অহো বন্ধুগণ, আমার দাদাও একজন ওরেটর? তিনিও রাজনীতির ভাবনায় ভাবিত! ভোট চাইছেন ভদ্রলোক—ভোট চাইছেন দেশবাসীর কাছে, দেশবাসীর কারণে। দাদা, তোমার বৌঠান আছে, মনটু আছে, ডাক্তারি আছে, এই প্রাচীন বাড়িটা আছে—দেশও আছে। আমার কিছু নেই। দাদা, তুমি কত সুখী। এই নির্বোধ উক্তিগুলো টেপ করে এনে বাড়ির সকলকে তোমার কৃতিত্বের পরিচয় দিতে

পাবছ, কি সবল তুমি, দাদা, তোতাপাখিব মতো মুখস্থ করে এই যে কথাগুলি বলছ, দাদা তুমি জানো না—তোমার প্রত্যেকটি কথা আমাব কাছে ক্লাউনের মুখের এক-একটি মুদ্রা। বেড়ে সার্কাস খুলেছ দাদা। বেশ, না হয় উপভোগই কবা যাক।

টেপ রেকর্ডে কৃপানাথের নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা নিশানাথ কিছুই শোনে নি। সবে যখন বিরক্তি কাটিয়ে ব্যাপারটা শোনাব জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—ঠিক তখনই বক্তৃতা শেষ হলো। কৃপানাথ একবার স্বর্ণব দিকে তাকাল, ভাবটা—আর খেলবে? তাবপর আডচোখে নিশানাথকে দেখে নিয়ে মন্টুকে বলল, কিবে? তাডাতাডি লেখাপডা শিখে বড হ। তা হলে তো তুইও এরকম ইলেকশনে—

নিশানাথ সেই মুহূর্তে কৃপানাথেব কণ্ঠে উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখল। সে ভেবেছিল দাদাকে বোকা বুঝিয়ে ওবা নির্বাচনে দাঁড কবিয়ে দিয়েছে। আজকাল ডাক্তার, ব্যারিস্টার, অধ্যাপক, সাহিত্যিকের নির্বাচন উপলক্ষে বাজার-দব আছে। সে ভেবেছিল ওবা দাদার অর্থ ও পেশাগত জনপ্রিয়তাব সুযোগ নিয়ে দাদাকে পুতুল খেলাচ্ছে। কিন্তু এখন নিশানাথ স্পষ্টই বুঝল—দাদাব সামনে এক নতুন জগতেব দরজা খুলে গেছে। আব দাদা এমনকি বংশ-পবম্পরায় সেই জগতে অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছে। একদিন দাদার স্বপ্ন ছিল সফল ডাক্তাব হওয়া। প্রথম সন্তানরূপে এই বিচিত্র পবিবাবটির জটিল সমস্যার গুরুভাব নিজেব কাঁধে বহন কবা। তাদের এই প্রাচীন, বিবর্ণ, ক্ষয়িষ্ণু বাডিটাকে বন্ধক মুক্ত করা। বাড়িটা নতুন কবে সাবানো। নিশানাথ কোনোদিন, কোনোদিন ভাবতেই পারে নি এই বাডি, এই পবিবাব ও গার্হস্থ্যধর্ম ছাডা দাদার সামনে আর কোনো সমস্যা আছে।

আজ দাদা ভাবছে সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা। বংশগত আভিজাত্যে আজকাল চিঁডে ভেজে না। অতীত মানুষ সহজেই বিস্মৃত হয়। বলাই বাহুল্য আজ কৌলিন্য শুধু অর্থেব। কিন্তু ভারতবর্ষে মনোপলি ক্যাপি-টালিজমের যুগ এসে যাচ্ছে। ছাতু খেয়ে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে আজ আব আলামোহন দাস হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে শত শত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীব প্রতিষ্ঠাবাসনা ও অহমিকা চরিতার্থ হওয়াব পথ কি? ধনতন্ত্র নিজেই সে পথ খুলে দিল। নতুন জীবিকা তৈরি হলো—বাজনীতি বা সংস্কৃতি করা। দেশেব লুপ্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ও স্বচ্ছন্দ বিকাশের জন্য বৎসবব্যাপী

আয়োজন, অনুষ্ঠান আজ নানা লোকের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও পরিবার পোষণের কারণ। তেমনই রাজনীতি। যার সাফল্য প্রত্যক্ষতর।

আর সদা অসন্তুষ্ট অথচ সহজে তৃপ্ত মধ্যশ্রেণী এই দুটি সহজ কারণে নিজেদের যাবতীয় প্রতিভা ও সামর্থ নিয়োগ করে আসলে ধনতন্ত্রেরই নিরুপদ্রব বিকাশের সহায়তা করছে। এই সৌখিন সেবকবৃন্দের অনেকে কোনোদিনই জানল না, অনেকে জেনেও মেনে নিল যে তারা বস্তুত পুঁজিবাদেরই ভৃত্য। দল, নির্বাচন, সংবিধান ও গণতন্ত্র নিজের হাতে পরিচালনা করে রথ ভাবল আমি দেব, পথ ভাবল আমি। কিন্তু অন্তর্যামী আড়ালে হেসে আরও বেশি বেশি তাদের মাথায় এই দেবমহিমা সঞ্চারিত করে দিল। চিরদিনই মধ্যশ্রেণী নকল বিধাতা হয়ে খুশি।

দাদা মহাশয়, এবার তুমিও বিধাতা হতে চাও নিশ্চয়ই, বিধাতাপনায় তোমার জন্মগত অধিকার। তোমার পূজনীয় পিতৃদেব ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। শৈশব থেকে তুমি সেই আবহাওয়ায় মানুষ যেখানে মিথ্যার জয়ে উৎসব। যেখানে ঘাতক তোমার পিতৃদেবকে অর্থ দিয়েছে আর তোমার পিতৃদেব তাকে দিয়েছে আইনের কূট প্রয়োগে স্বাধীনতা। যেখানে ব্যভিচারী নিষ্পাপ রমণীকে ধর্ষণ করেছে আর তোমার পিতৃদেব প্রমাণ করেছে তা ধর্ষণ নয়, সঙ্গম, কারণ সাক্ষ্যদানকালে রমণীটি বলেছিল সে 'আহ্' বলে চিৎকার করে ওঠে কিন্তু ভয়ে বা যন্ত্রণায় সেখানে তার 'উহ্' বলা উচিত ছিল। এই আহ্ আর উহ্-এর সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম প্রভেদটুকু আবিষ্কার করতে পারায় তোমার পূজনীয় পিতৃদেব আইন ব্যবসায়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

আর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র, তুমি দাদা মহাশয়, একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তুমি দাদা মহাশয়, জানো, কোন রোগে কি চিকিৎসা। যে অসুখ একদিনে আরোগ্য হয় তুমি তাকে এক মাস ভোগাও—কারণ তাতে তোমার ভিজিট বাড়ে। যে দুরূহ ব্যাধির আশু প্রতিকার আশা করা যায় না—এক ডোজ্ ওষুধে তুমি তাকে জীবন দাও—কারণ তাতে তোমার ধন্বন্তরী হিসেবে খ্যাতি হয়। সেই আহ্ আর উহ্-এর সূক্ষ্ম প্রভেদ নির্ণয় করার দুরূহ প্রতিভা তুমি তোমার চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রয়োগ করার অলোকসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছ। তাই জীবন আর মৃত্যু, ব্যাধি আর আরোগ্যে তুমি নির্বিকার।

দাদা মহাশয়, আজ তুমি সেই প্রতিভা আরও ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ

করতে চাও। দেবদূত ছিলে, বিধাতা হতে চাও। যে আইন, যে ব্যবস্থা তোমার পূজনীয় পিতৃদেবকে, তোমাকে আহ্ এবং উহ্-এর সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্ণয় করার সুযোগ দিয়েছে—এবার তুমি স্বয়ং সেই আইন ও ব্যবস্থা শুধু প্রয়োগ নয়, প্রণয়ন করতে চাইছ। দেবদূত তুমি দেবতা হতে চাইছ।

হায় নকল বিধাতা, তুমি জানো না, তোমরা জানো না, তোমাদের ওপরে এক অন্তর্যামী আছেন—যেন রক্তকরবীর জালের আড়ালে রাজা—তাকে দেখা যায় না, কোনোদিন যায় নি, কোনোদিন যাবে না। তোমরা এ যুগের নকল বিধাতা সেই জালের আড়ালের রাজাটির বরকন্দাজ মাত্র। তারই অভিমানে তোমরা স্ফীত। তারই অভিমানে তুমি দাদা মহাশয় এমনকি বংশগত সূত্রে মন্টুকে রাজনীতিবাজ করতে চাও।

ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হতো আর সম্রাটের পুত্র সম্রাট। সভ্যতার স্তরে স্তরে এই উত্তরাধিকারবোধ নানাভাবে ক্রিয়া করেছে। তারপর এল আধুনিকতা। মানুষ ঘোষণা করল জন্মসূত্রে তার অধিকার ও ভাগ্য নির্দিষ্ট হয় না। এল গণতন্ত্র, এল ধর্মনিরপেক্ষতা। এবং এই আধাসামন্ততান্ত্রিক আধা ইওরোপীয় দেশটি নতুন অবস্থা বিন্যাসের মধ্যেও তার অকৃত্রিম প্রকৃতিটি অক্ষুণ্ণ রাখল। তাই এদেশে নির্বাসিত জওহরলাল নেহরু জননেতা এবং ভাগ্যবান। তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী উত্তরাধিকারসূত্রে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। ধন্য দাদা, ধন্য এই তোমরা। বস্তুত, তোমার পুত্র হিসেবে মন্টু ডাক্তার যে হবেই তার নিশ্চয়তা কি? কিন্তু রাজনীতিতে যদি সফল হও তাহলে তোমার উত্তরাধিকার মন্টুতেই বর্তাবে। কারণ ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হতো, সম্রাটের পুত্র সম্রাট। আজ ব্রাহ্মণ্য নেই, সম্রাটত্ব নেই। আজ এই এক নতুন শ্রেণী তৈরি হয়েছে—নতুন জীবিকা।

'আসছি' বলে নিশানাথ উঠল। চটিটা পায়ে গলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ তার স্বপ্নের কথা মনে পড়ল।

থমকে দাঁড়িয়ে সে বাড়িটা দেখল। প্রাচীন বিবর্ণ আর ক্ষয়িষ্ণু। দেয়ালটা জায়গায় জায়গায় নোনা পড়ে ফেঁপে উঠেছে, কোথাও বা ক্ষত। অবাক হয়ে, অবাক হয়ে নিশানাথ বাড়িটা দেখল। যেন এই শতাব্দী, এই শহর তাদের গৃহটিতে মূর্ত। সে চারিদিকে বয়েসের ঘ্রাণ পেল।

আর নিশানাথকে এক আশ্চর্য ইচ্ছেয় পেয়ে বসল। সে শক্ত দুহাতে দেয়ালটা চেপে ধরল। ঝুর ঝুর করে খানিক চুনবালি খসে পড়ল।

হায়! আমি পুরাণের বীর নই। দু হাতের চাপে এই জরাগ্রস্ত গৃহটিকে চূর্ণ করে আমি এই শহর, এই শতাব্দীকে পাপমুক্ত করতে পারি না। হায়! বীর নই, আমি ধ্বংস করতে পারি না। আমি রয়েছি এমন একটা যুগে যখন মানুষ খর্ব, ক্ষীণ, অম্বল আর অনিদ্রায় রোগগ্রস্ত। অথচ তার হাতে অপরিমিত বিধ্বংসী শক্তি। পৃথিবীতে আজ আর বীরত্ব নেই, আছে হত্যা।

থুঃ করে দেয়ালে থুতু ফেলে নিশানাথ নিচে নামল। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল দাদার চেম্বারের দিকে। কার যেন গলা পাওয়া যাচ্ছে। ও, ফোন করছে হৈমন্তী। আচ্ছা, এইখানে দাঁড়াই।

বন্ধুগণ, বন্ধুগণ—আপনারা সাক্ষী, এই ভৌতিক গৃহের অণু-পরমাণু সাক্ষী—কোনো হঠকারী উত্তেজনার আকস্মিক উন্মাদনায় আমি আত্মহত্যা করি নি। পৃথিবীতে কে কবে এহেন ধীরতায় এমন স্থৈর্যে যাবতীয় খুঁটিনাটি বিচার করে চাবিয়ে উপভোগ করতে করতে মৃত্যুকে গ্রহণ করেছে? ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি কাল্পনিক—মিস্টার ক্রাইস্টের মুখ কেউ দেখে নি। তা ছাড়া কথিত হয়, যীশু মানবত্রাণে আত্মত্যাগ করেছিলেন। সক্রেটিস নিজের হাতে হেমলক পান করলেও আসলে তাঁকে হত্যাই করা হয়েছিল। বন্ধুগণ—আমি আত্মত্যাগ করছি না—এ কথাটি চিৎকার করে বলে যেতে চাই। আমি দাদার চেম্বার থেকে চুরি করে প্রত্যহ অল্প অল্প বিষপানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একটু একটু করে মরতে চাই। ধীর কিন্তু নিয়মিতভাবে। আমার এই মৃত্যুকে কোনো দর্শন বা কাব্যের রঙীন পোশাক পরিয়ে মনোহর করার বাসনা রাখি না। আসলে জীবনে মৃত্যু অনিবার্য, বর্তমান সভ্যতা জীবনকে আরো লোভনীয় এবং মৃত্যুকে আরও দ্রুত ও অনিবার্য করেছে। আমি জীবনের বিধান ও সভ্যতার উত্তরাধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছি।

আহ্ কি করছে হৈমন্তী, কাকে ফোন করছে এতক্ষণ? হঠাৎ নিশানাথের মনে পড়ল—তাই তো, হৈমন্তী, হৈমী—শেষ ওকে কবে দেখেছি—আজ, কাল, নাকি উনবিংশ শতাব্দীতে? কি করে হৈমী সারাদিন, কিভাবে দিন কাটায়? দিন কাটানো কি দুরূহ! ঘড়ির দিকে তাকাও—দেখবে কতখানি সময় নিয়ে একটা সেকেণ্ডের কাঁটা ঘোরে। তারপর মিনিট, তারপর ঘণ্টা, তারপর দিন, তারও পরে বছর। কি করে হৈমী সারাদিন, কি ভাবে সময় কাটায়?

একই বাড়িতে থেকেও দীর্ঘ, দীর্ঘকাল যে বোনের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার কোনো চেতনা ছিল না—হঠাৎ এই ভৌতিক বাড়িটার অন্ধকার সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে নিশানাথ যেন তাকে নতুন করে আবিষ্কার করল।

তিন বছর একটি অনাত্মীয় যুবাকে যে জেনেছে, তিন বছর (ঘড়ির দিকে তাকাও—দেখবে কতখানি সময় নিয়ে একটা সেকেণ্ডের কাঁটা ঘোরে) যে নতুন পরিবেশে নতুন অভ্যাসে দিন কাটিয়েছে, তিন বছর যে একটি পুরুষের কাছে নিজেকে নগ্ন করেছে—ডিভোর্সের পর গত দুবছর কি ভাবে, আহ্ কি ভাবে সে এই তার পুরানো বিবর্ণ মামুলি পিতৃগৃহে দিন কাটাল। কি নিয়ে কাটাল।

রাত্রে ঘুমঘোরে তার শিথিল হাতটি অবলম্বন খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ কি চমকে ওঠে নি? আর নিজেকে কি কখনো তার একা, অসহায় মনে হয় না? এই দিনগুলো কি করে হৈমী?

নিশানাথ উৎকর্ণ হয়ে টেলিফোনে হৈমন্তীর গলা শুনতে চাইল। ওর স্বর, উচ্চারণ, সংলাপে যেন সে পলকে দু বছরের ইতিহাস বুঝে নিতে চায়।

আমি তাঁর স্ত্রী।

হ্যাঁ।

কিছু করার ছিল না।

না না, ডিভোর্সটা একটা সাময়িক মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং। শেষ ছ মাস আমরা একসঙ্গেই থাকতাম।

ওটা গুজব।

আমি বলছি ওটা গুজব। আমার কোলে মাথা রেখেই তিনি—আচ্ছা নমস্কার।

হৈমন্তী টেলিফোনে কাকে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ দিচ্ছে? নিখিল মারা গেছে? বাড়িতে তো মৃত্যুর কোনো ছায়া—দাদার বক্তৃতা—হৈমী বিধবা হলো? বাঃ বেশ, বেশ, অতীব চমৎকার। শেষ ছ মাস ওরা এক সঙ্গেই থেকেছে। ওরই কোলে মাথা রেখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন। সাধু সাধু, হৈমী—জীবনে মরণে—

আপনারা খবর পেয়েছেন?

নিখিলবাবু বলতে বললেন, আমি ওঁর বোন।

হ্যাঁ, কালকের প্লেনেই স্টার্ট করছেন। সুইজারল্যাণ্ড থেকে আমার বৌদির ডেডবডি নিয়ে আসবেন।

তা দিন তিনেক হবে।

হ্যাঁ, এখানেই দাহ হবে।

আচ্ছা নমস্কার।

নিশানাথ ছিটকে বেরিয়ে এল। আমার বোন হৈমন্তী সুইজারল্যাণ্ডে মারা গেছে। স্বামী তার আজকেই প্লেন ধরছে, মৃতদেহ বহন করে আনবে।

একদা, কোনো এক যুগে, কথিত হয়, সতীর মৃতদেহ কাঁধে উন্মাদ মহাদেব স্বর্গে মর্তে পা ফেলে পা ফেলে, স্বর্গে মর্তে পা ফেলে পা ফেলে, স্বর্গে মর্তে পা ফেলে পা ফেলে—আর বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে খণ্ড খণ্ড করে—আর মহাদেব স্বর্গে মর্তে পা ফেলে পা ফেলে—পালাও নিশানাথ, পালাও। তোমার ভগ্নী হৈমন্তী টেলিফোনে কাকে যেন নিজের মৃত্যু সংবাদ জানাচ্ছে।

এগারো

ত্রস্ত পদে সেই জটিল ও অন্ধকার প্যাসেজটুকু পেরিয়ে এলো। উঠোন, তারপর সদর দরজা। নিশানাথ উঠোন থেকেই একটা সমবেত উল্লাসধ্বনি শুনতে পেল। অনুভবে বুঝল কারা যেন দৌড়ে কোথায় যাচ্ছে। মনে মনে বিদ্রূপের হাসি হেসে তাকে স্বীকার করতে হলো আজকাল উল্লাসের ধ্বনি শুনে তার কারণ বা প্রকৃতি অনুমান করা দুঃসাধ্য। চকিতে দিব্যনাথের কথা মনে পড়ল। বারান্দায় চোরের মতো দাঁড়িয়েছিল। মুখে অনুক্ষণ কেমন এক দুর্বিনীত ক্ষমাপ্রার্থীর হাসি। আমি বিলক্ষণ জানি ঘরের ভেতর সাধনাদের হাস্যধ্বনি শ্রীমানের মনে লোভ জাগায়! কিন্তু একসঙ্গে বসে গল্প করার সাহস কদাপি পায় না। দিব্য স্পষ্টতই সাধনাকে ভয় করে চলে।

বাহবা ভ্রাতৃবধূ, একেই বলি পার্সোন্যালিটি। তোমার ভাসুর তোমাকে সমীহ দেখায়। বাহবা ভ্রাতৃবর, প্রতিবেশী তোমায় ভয় করে, বাড়ির সকলে তুমি কখন কি করে বসো এই ভাবনায় সন্ত্রস্ত, আর তুমি, যুবক, আপন হীনমন্যতার তাড়নায় নিজের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিজের দাদার ঘরে নিজের পরিজন যে গল্পের আসর বসিয়েছে তা চোরের মতো শোনো। হায় ভ্রাতঃ, উচিত কি তব এ কাজ? তোমার অই ব্যায়ামপুষ্ট শরীরে, দুর্ধর্ষ একটা বুকে এই সঙ্কোচ কি সাজে? এ মনিহার তোমায় নাহি সা-আ-আ-আ-আ-আ-আ-জে-এ। কতদিন দেবব্রত বিশ্বাসের গান শুনি না। 'কোমল গান্ধার'-এর পরের ছবিতে যদি রাজেশ্বরী দত্ত, রাজেশ্বরী বাসুদেব, তোমার যোগ্য গান বিরচিত বলে, ফিরাইব তায় কেমনে। হায় ভ্রাতঃ, যে গৃহে তোমার বাস অথচ যেখানে তুমি রবাহূত—সে বাড়ির কটা তুচ্ছ মানুষের অলস জল্পনা সম্পর্কে এ কি তোমার দীন কৌতূহল? আসলে

দিব্যনাথ, আমার মতো তুমিও এই ক্ষয়গ্রস্ত বাড়িটা সম্পর্কে এক বিরাট অভিমান নিয়ে ঘুরে বেড়াও। আমার ঔদাসীন্যের মতো তোমার ভীতিও এক ছদ্মবেশ।

রাস্তায় পা দিয়েই মুখোমুখী দেখা। প্রায় হাঁটু অবধি ট্রাউজার গুটনো, বিবিধ বর্ণে নানা দৃশ্য ও মুখমণ্ডল শোভিত জামা, গলায় অনুরূপ রুমাল, পায়ে হাওয়াই চটি, বিচিত্র ছাঁদে বিন্যস্ত চুল—একটি ছেলেকে নিশানাথ প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার ?

সে নিশানাথকে দেখে স্পষ্টতই অপ্রতিভ। নিশানাথ যে ডেকে তাকে প্রশ্ন করবে এ যেন অপ্রত্যাশিত ছিল। তার মুখের হাসি, চোখের দৃষ্টিতে নিশানাথ অবিকল তার ভাইটিকে প্রত্যক্ষ করল। ছেলেটাকে ছোট থেকে দেখেছি, তায় দিব্যনাথের বন্ধু। সে কারণে সমীহ সহকারে ঘটনাটি সম্পর্কে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে যুবক বলল, "কিস্‌সু না, একটা বাওরা"—ছোকরাটি 'কিছু না' কে বলল 'কিস্‌সু না'। অথচ আমাকে অসম্মান করা তার অভিপ্রেত ছিল না। ছেলেটি 'পাগল'কে বলল 'বাওরা'। অথচ এ-ই আবার বঙ্গদেশে হিন্দী আধিপত্যে যারপরনাই ক্ষুব্ধ। সর্বোপরি এই বিদেশী মোড়কে এহেন কণ্ঠ, ভাষা ও উচ্চারণ কি বিবোধাভাসই না সৃষ্টি করে। নিশানাথের বমি এলো। বিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয়ার্ধ তাবৎ ধনতান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক পৃথিবীর এক শ্রেণীর যুবজনের পোষাক, প্রসাধন, ভঙ্গি, চলাচল মোটামুটি এক করে দিচ্ছে। যাকে এক ধরনের দেশ-কালাতীত বিশ্বসংস্কৃতিও বলতে পারো। এমন কি মহান সোভিয়েত ভূমিতেও আজ এই সাধারণ লক্ষণটি সেখানকার কোনো কোনো যুব মহলে প্রকাশ পাচ্ছে। মহামতি ক্রুশ্চভ ভুরুফুরু কুঁচকে একে বলছেন টেডি বয়ের সমস্যা। কিন্তু 'সমস্যা' এই বিশেষণ প্রয়োগে ঘটনাটির চরিত্র পাল্টায় না এবং টেডি বয়, উঠতি গুণ্ডা, ডেলিংকোয়েন্ট যে নামেই ডাকুন প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে সভ্যতার প্যাটার্ন ও রুচি আজ আর দেশ এবং সমাজ-ব্যবস্থার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল নয়। তাহলে বিপ্লবের চল্লিশ বছর পরে সোভিয়েতে টেডি বয়রা সমাজতন্ত্রের কামানো গালে বিশুদ্ধ থাপ্পর মারত না, ক্লাস এইটের বিদ্যে নিয়ে এই গরীব স্কুল মাস্টার-তনয়টি মাকে আধপেটা রেখে কি গুণ্ডামি বা দালালি করে যেন তেন একটা ট্রাউজার জোটানোকে পরমার্থ জ্ঞান করত না, পশ্চাদপদ আফ্রিকার একটি নিগ্রো যুবক কারখানার শ্রমিক বা বাড়ির ভৃত্য হওয়া সত্বেও একটা নেক টাইয়ের লোভে এমন কি তা'র জীবিকা বিপন্ন

করত না। আসলে পৃথিবীটা এই ভাবেই দ্রুত কাছে আসছে আর এক হয়ে যাচ্ছে।

শহরের উপকণ্ঠে আমি অজস্র কারখানা অঞ্চলে ঘুরেছি—রেডিও, গ্রামাফোন, চায়ের দোকান, আর সেলুনে ছেয়ে গেছে। কুচ্ছিত ফিল্মের গান ছাড়া কিছু বাজে না। অথচ ভ্রাতৃবধূ, এই শ্রমিকরা এসেছে কেউ বিহার থেকে, কেউ ইউ. পি. থেকে, কেউ উড়িষ্যা থেকে, কেউ বা দার্জিলিঙ থেকে। আসমুদ্র হিমাচলের বহুমুখী সংস্কৃতির প্রবাহে যেখানে এক মোহনা হতে পারত, সেটা আসলে এক মজা ডোবা।

ছুটির দিন এরা যখন দেশীয় প্রথায় গোল হয়ে বসে বিকট করতালধ্বনি সহকারে উন্মাদের মতো রাম-নাম গায়—তখন, তুমি কি জানো ভ্রাতৃবধূ, এরা যে সুরে পবন-নন্দন ও সীতাপতির গুণকীর্তন করে তার অনেকটাই শেষতম জনপ্রিয় ফিল্মী গানের সুর? তুমি অবশ্যই গবেষণা সহকারে প্রমাণ করতে পারো যে-হিন্দীভাষী শ্রমিকটি রামনামের আসরে খাঁটি দেশীয় প্রথায় হিন্দী ফিল্মের সুর গাইছে, তার উৎস একটি বিদেশী জাজ-সঙ্গীতের রেকর্ড যার উৎস আবার নিগ্রো পল্লীগীতির সুরধ্বনিতে নিহিত। মানবমুক্তি ও শুদ্ধ সংস্কৃতির অগ্রদূতরা এইভাবেই নানা মিশ্রণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ প্রলেটারীয় কালচার তৈরি করছে। আর নিউ এম্পায়ারে, সংস্কৃতি সম্মেলনে, জলসায়, এমন কি রাজনৈতিক সভায় পল্লীসঙ্গীত পরিবেশন না করলে আজ বঙ্গদেশের ইজ্জত থাকে না। কিন্তু, ভ্রাতৃবধূ, তুমি কি জানো অজ গাঁয়ের চাষীও আজ কি গান গেয়ে খুশি হয়? তোমরা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পতাকাবাহীরা কখনো কোনো মেলায় গেছ? মেলাগুলোর চরিত্র কি ভাবে পাল্টে যাচ্ছে জানো?

বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, বাংলা দেশের রেনেসাঁসে জন্ম মুহূর্তেই মৃত্যুর বীজ থেকে গেছে। আর্থনীতিক ভিত্তিভূমি ছিল অপ্রস্তুত, ঘটে গেল ভাবগত জাগরণ। এই কলকাতা শহরটি স্বভাবত গড়ে ওঠে নি, তাকে যথেচ্ছ বানিয়ে তোলা হয়েছে। উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনে যার সৃষ্টি, সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে যার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ব্যাহত; একদিকে যার রাজনৈতিক প্রাধান্য খর্ব করার অবিরাম ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে যে ভাবনৈতিক নায়কত্বের গরিমায় অফুরান আহ্লাদিত—এই শহর চিরদিন ভারতবর্ষের মাটিতে যেন এক নিক্ষিপ্ত উল্কাপিণ্ড, আজও যা মানব বসতির সম্পূর্ণ উপযোগী হয়ে উঠল না এবং প্রাকৃতিক নিয়মে চিরদিনই যে নাকি ক্রমশ গড়ে উঠছে।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, অর্ধসম্ভব শিল্প বিপ্লব, দ্বিধাগ্রস্ত ভাব-জাগরণ,

নবজাত কৃত্রিম মধ্যশ্রেণী যে জীবনের স্বপ্ন দেখল, বুর্জোয়া বিকাশের প্রয়োজনে যে বন্ধনকে অস্বীকার করল—তার সঙ্গে সর্বদা দেশের নাড়ির যোগ ছিল না। এই প্রথম আমাদের দেশে এক 'আউট সাইডার' শ্রেণী তৈরি হলো। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। আর সেই থেকে স্পষ্টত সমান্তরাল ভাবে আধুনিক ও প্রাচীন দুই সভ্যতা দীর্ঘকাল প্রবাহিত রইল। রেনেসাঁসীরা যে কূপমণ্ডুক সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন—আসলে তা ছিল দরবার, জমিদার, চণ্ডীমণ্ডপ আর হঠাৎ বাবুপুষ্ট এক বিকৃত অবক্ষয়ী সভ্যতা। দূরতম পল্লী অঞ্চলেও জীবনে সংস্কৃতিতে অনিবার্যভাবে এই ক্ষয় ধরে ছিল। কিন্তু ঘুমভাঙানিয়ারা তাদের দেশ-কাল-পাত্র সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাবে এবং অপরিসীম উচ্চম্মন্যতায় সেই অবক্ষয়ী সভ্যতার বিরুদ্ধেই শুধু সংগ্রাম করলেন না, পল্লী সংস্কৃতির সজীব সচল যে ধারা তখনও প্রবাহিত ছিল, যে মূল্যবোধ ও জীবন-ধারণা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি—তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন। অন্যদিকে বুর্জোয়া বিকাশের বিরুদ্ধবাদী যে সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থ কিছু মূঢ়কে তার সহযাত্রীরূপে নানা সময়ে পেল—"ঐতিহ্য বাঁচাও" বুলি তাদের মুখে কাকাতুয়ার মতো ধ্বনিত হলেও আসলে ঐতিহ্য সম্পর্কে তাদের কোনো স্পষ্ট ধারণাই ছিল না। নতুন সভ্যতা হওয়ার কথা নগরভিত্তিক, অথচ তা সম্পূর্ণত হলো কলকাতা কেন্দ্রিক। বুর্জোয়া বিকাশের সুবিধাটুকু পেল কলকাতা, তার মূল্য দিল গোটা দেশ। গ্রাম দূরস্থান, শহরের উপকণ্ঠে, এই শহরের উপকণ্ঠে, নতুন সংস্কৃতি প্রচার ও প্রসারের ভিত্তিভূমি তৈরি হলো না। ফলে বাংলার নবজাগরণের সভ্যতা তথা সাহিত্য-শিল্প-মূল্যবোধ হয়ে রইল মুষ্টিমেয় শিক্ষিতজনের সম্পত্তি। তা ব্যাপকতা পেল না, শেকড় পেল না। অথচ ক্রমশ পরিবর্তিত সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে তাই ক্রমে দেশের সভ্যতার মাপকাঠি হিসেবে স্বীকৃতি পেল। আস্তে আস্তে তা পল্লীসংস্কৃতির কিছু বহিরঙ্গ গ্রাস করল, যেমন বিজাতীয়ত্বের দুর্নাম ঘোচাবার জন্যে নিকট অতীতে বঙ্কিমচন্দ্রকে লিখতে হয়েছিল কৃষ্ণচরিত্র। অর্থাৎ আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন কোনোদিনই শ্রদ্ধা এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ভিত্তিতে হলো না, তা হয়ে রইল কখনো অগ্রগামীর এক কৌশল, কখনো বা পশ্চাৎপদের এক অজুহাত। এবং এই যে খিচুড়ি সভ্যতা, যার ভিত্তিভূমিতে গণ্ডগোল, তার সৌধ যে খানিকটা দুর্বল হবে তাতে আর সন্দেহ কি ?

ধর্মাবতার ও জুরী মহোদয়গণ, আমি একে বলব না তাদের ঘর, এ ববং জতুগৃহ। একদা আশা করেছি সমাতা পঞ্চপাণ্ডব শেষ পর্যন্ত মুক্তি পাবে। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পর মহাপ্রস্থানের পথ। একে একে পৌরাণিক বীরদের পতন, ধর্ম রাস্তার কুকুর আর ধর্মরাজ নরক-দর্শক।

কৌঁসুলী মহোদয়, কলকাতার জতুগৃহ জ্বলছে। কুন্তী ও পঞ্চপান্ডব পলাতক। শুধু মরে গেল সেই অসহায় পাঁচটি ভাই ও তাদের মা, আতিথ্যে তৃপ্ত নির্বোধ ছটি প্রাণী। দেশ যে মরে গেল, কেউ তা জানল না। কুন্তী এবং পঞ্চপাণ্ডবের মৃতদেহ দেখে দুর্যোধন নিশ্চিন্ত। কৌঁসুলী মহোদয়, আমি আমাদের এই রেনেসাঁসকে অভিযুক্ত করি যে আপন নিরাপত্তার জন্য তার জতুগৃহে আতিথ্যের লোভ দেখিয়ে ছটি নির্বোধ সরল আত্মাকে নিজের হাতে পুড়িয়ে মারল। আর এই হত্যাপরাধের কোনো তুলনা নেই, কারণ যারা মরল তারা তৃপ্ত হয়ে অকালে বিনষ্ট হলো। এবং বিনষ্ট হয়ে পঞ্চপাণ্ডবের শত্রুপক্ষকে দীর্ঘকাল প্রতারিত করে রাখল। আমাদের এই বুর্জোয়া বিকাশ এমনই প্রতারক। আর তারই ফলে আজও কলকাতা শহরে ভূতের ওঝা, জ্যোতিষী, ধর্মের ষাঁড় ও ভগবানের বাচ্চার অবাধ প্রাবল্য।

বন্ধুগণ বন্ধুগণ, আমরা, আমাদের সন্ততি আজ ঘাড় উঁচু করে আকাশে স্পুৎনিক খুঁজি, রেডিয়োয় তার বিপ বিপ ধ্বনি শুনি, অথচ হো-হো-হো, ইয়্যাও ইয়্যাও, মহাভারত তো শুদ্ধই রয়েছে, সুইজারল্যাণ্ডে মৃতদেহ আনতে যাচ্ছেন, হ্যাঁ আমরা বন্ধুগণ, আমরাই বন্ধুগণ বসন্তের টীকা নিতে ভুলে গিয়ে মহামারীর সময়ে মনসার মন্দিরে পূজা দিতে যাই, চন্দ্রগ্রহণে তেষ্টায় মরে গেলেও রোগীকে পর্যন্ত জল খেতে দিই না, হাওড়ার ব্রীজ পেরোবার সময় গঙ্গায় পয়সা ছুঁড়ে দি। অবিশ্বাস্য কুসংস্কার, প্রখর বিজ্ঞান বিশ্বাস, অন্ধ ধর্মজ্ঞান আর পাশবিক নীতিহীনতার এমন অপূর্ব সহাবস্থান অল্পই মিলবে। আর এই চূড়ান্ত পরস্পরবিরোধিতাই আমাদের সমগ্র দেশ ও জাতীয় জীবনের মহতী ট্র্যাজেডি। একে ফার্সও বলতে পারেন। এর ফলে আমরা কোনো কিছুই সম্পূর্ণ পাই নি, সম্পূর্ণ চাই নি। আস্তে আস্তে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে আমাদের জীবন ভাবনার পদ্ধতি পাল্টেছে। কিন্তু অধিকাংশের সংস্থান সেই অনুপাতে বাড়ে নি। অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক আর্থনীতিক কার্য-কারণের অসামান্য প্রভেদ সত্ত্বেও তাই দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ইউরোপের মতোই স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সর্বস্তরে

যাবতীয় মূল্যবোধের অবসান ও উত্তরদেশের জীবনগত দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্রমশ সাযুজ্য ঘটেছে। ধনতন্ত্র, ফাসীবাদ ও বিশ্বযুদ্ধ, হিরোসিমার স্মৃতি ও শীতল সংগ্রামের পরিণামভীতি এবং কখনো বা সাম্যবাদ—আতঙ্ক সমস্ত ধনতান্ত্রিক জগৎকে রুগ্ন ব্যাধিগ্রস্ত, মরিয়া করে দিয়েছে। শেলটারে, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, ফ্রন্টে যারা বাল্য থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে বেঁচে আছে—এ যুগের সেই শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব কি ব্যর্থ কি অভিশপ্ত। আর যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির সর্বনাশা ভাঙনে যারা ভেসে গেল, দেশে দেশে আজও যারা কর্মসন্ধানী এবং উদ্বাস্তু, পশ্চিম জার্মানী ইটালী ফ্রান্স ইংল্যাণ্ড বন্যার স্রোতের মতো যাদের অভিঘাতে কাঁপছে—সেই তারা, যে কোনো বয়েসের লস্ট জেনারেশন, যাদের অভিজ্ঞতায় জীবন ও মূল্যবোধ কি তুচ্ছ, মামুলী, হাস্যকর এবং তাৎক্ষণিক হিরোসিমার শ্মশানে বোমা পড়ার মাত্র কয়েকদিন পরে দখলকারী মার্কিন সৈন্যদের জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকার জাপানী মেয়েদের সংগ্রহ করে বেশ্যাপটি খোলা হয়েছিল, আলোর মালা জেলে সেই শ্মশানে উৎসব বাসর বসেছিল। পুরুষানুক্রমে রক্তে আনবিক রোগ ও স্মৃতিতে লাঞ্ছনার বীজ বহন করবে একটা গোটা জাত। আর বাণিজ্য কূটনীতি সংস্কৃতি ও সাহায্যদানের মিশনারীরা দেশে দেশে—এমনকি আদিম-জীবনে অভ্যস্ত দূর অঞ্চলেও তা সার্থক ভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে, দেবে।

ধর্মাবতার ও জুরীমহোদয়গণ, আমি হলফ করে বলতে পারি আজ এদেশে নিছক মোটা ভাত-কাপড়ের জন্য বা সামাজিক অত্যাচারের কারণেই মেয়েরা সর্বক্ষেত্রে বেশ্যাবৃত্তি করে না। দাঙ্গা এবং দেশবিভাগের পর এক শ্রেণীর যুবক যে শহর, শহরতলী, এমনকি সুদূর গ্রামেও বে-পরোয়া জীবন কাটাচ্ছে, রাজনৈতিক কারণে শাসনযন্ত্র যাদের পৃষ্ঠপোষক, আমাদের রাষ্ট্রজীবনে উদ্দেশ্যহীন, উত্তেজনায় ক্রম-অভ্যস্ত, জটিল চক্রের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধনতন্ত্রের প্রসাদপুষ্ট, অথচ অসম্মান ও নিরাপত্তাবোধের অভাবে সদা আত্মপীড়িত এই যে মরিয়া যুবসমাজ আমাদের রাষ্ট্রজীবনে ফ্যাসিজমের পথ তৈরি করছে—তারও কারণ সর্বক্ষেত্রে নিছক অন্নাভাব নয়।

পার্কের অন্ধকারে নাবালিকা মেয়েকে যখন প্রৌঢ় পিতৃবন্ধু নগ্ন করে, তখন সেই সমগ্র ঘটনাটিকে যে কুকুর পাহারা দেয়, সে মেয়েটিরই বাবা। আর ভাই নিজের বোনকে কলোনী থেকে মদের দোকানে পৌঁছে দেয়। আর মা তার মেয়েকে নিয়ে শেষ বাসে চায়ের দোকান থেকে গৃহে

প্রত্যাবর্তন করবে। বস্তুত বেশ্যাবৃত্তির কত অভিনব ক্ষেত্র ও রীতি প্রস্তুত হয়েছে। আর আমাদের পূত পুত্র ভদ্রলোকেরা রেসের মাঠে, মদ্যালয়ে, গণিকাগৃহে এবং সর্বত্র ব্যভিচার ও দুর্নীতির ধুনুচি জ্বালিয়ে বিসর্জন নৃত্যে আত্মহারা। গত দশ বছরে মদের কন্‌জাম্‌শান সীমাহীন বেড়েছে। অথচ সামাজিকভাবে আজও আমরা মদ্যপানে অভ্যস্ত নই। সুতরাং পুনরপি সেই ভণ্ডামি, যা আর শুধু উচ্চস্তরে সীমাবদ্ধ নেই। ভেবে দেখেছ কে খায় এত মদ? আর চোলাই করে, কে খায়? তুমি বলবে—কেন খায় সে-কথা বলুন মেজদা। ভ্রাতৃবধূ, সমস্ত ব্যাপারের মূল অনুসন্ধানে এই যে প্রবৃত্তি, এ-ও এক ধরনের আত্ম-প্রতারণা। ইয়ে সমাজব্যবস্থার ওপর তাবৎ দায়িত্ব চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। আমি রোগের কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত নই। আমার কারবার লক্ষণ নিয়ে স্ট্যাটিসটিক্স বলে সমস্ত ধরনের অপরাধ বেড়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশে শিশু-অপরাধ, সমকামিতা, কুমারীর মাতৃত্ব, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উন্মাদরোগ, অসম্ভব সব উপায়ে হত্যা ও আত্মহত্যা, বিকৃত রুচি চরিতার্থ করার জন্য প্রায় নারকীয় ধরনের ক্লাব ও চক্র প্রকাশ্যে গোপনে তাবৎ অগ্রগামী ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে অজগরের প্যাঁচে জড়িয়ে ফেলেছে। সুতরাং উপনিবেশের মারফৎ তার বিস্তৃতি অন্যত্রও ঘটেছে। লাটিন আমেরিকা, মিডল ইস্ট, আফ্রিকা, মালয়-সিঙ্গাপুর-হংকং প্রভৃতি দ্বীপ, জাপান,-ব্রহ্ম-ভারতবর্ষ—কেউ এই বেড়াজালের বাইরে নয়।

অসমাপ্ত

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর বাংলা বিভাগের গবেষণা পরিষদের পক্ষ থেকে এই সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়। এই সাক্ষাৎকারটি পাঠিয়ে, গবেষণা পরিষদ-এর সম্পাদক, আমাদের জানিয়েছেন:

'ইং ২৫. ৮ ৭৫ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের অধ্যক্ষের ঘরে শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সাক্ষাৎকারটি টেপ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে একটি গবেষণা প্রকল্পের কাজ তখন আমরা চালাচ্ছিলাম, সেই উদ্দেশ্যেই কয়েকজন নির্বাচিত বুদ্ধিজীবীর মতামত সংগ্রহ করা হয়েছিল, এটি তার একটি। নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে এতদিন এই সাক্ষাৎকারের অনুলিপিগুলি পড়ে ছিল। বর্তমানে এই কাজটি প্রকাশের চেষ্টা হচ্ছে।

ক্যাসেটের অভাব থাকায় টেপগুলি রাখা যায় নি; তখনই টুকে নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে আপনার কাছে যা প্রেরিত হলো, তা দীপেন্দ্রনাথের বলা কথার অনুলিপি, লেখা নয়। তাই কিছু অস্পষ্ট বাক্য আছে—যা বলা কথাতে থাকবেই। আমরা এ-সবের উপর ইচ্ছে করেই কলম চালাই নি। অন্য সাক্ষাৎকারগুলির ক্ষেত্রে আমরা বক্তাকে দিয়ে এই সংশোধনগুলি করিয়ে নিই। কিন্তু দীপেন্দ্রনাথের বেলায় যেহেতু সে উপায় আর নেই তাই তাঁর মতামত, বাচনভঙ্গী ও শব্দব্যবহার সম্পর্কে যিনি আপনাদের মধ্যে সব থেকে অবহিত আছেন তেমন কোনো একজনকে দিয়ে আপনি এ কাজটি করিয়ে নিলে আমরাও উপকৃত হতে পারবো, শুধু দেখতে হবে যে তাঁর সে সময়ের চিন্তাটাই যেন যথাযথভাবে ফুটে ওঠে।'

খুব কম জায়গাতেই আমাদের অতি সামান্য কোনো সংশোধন করতে হয়েছে—সে সংশোধন যে-কারো পক্ষেই করা সম্ভব ছিল, এতই পরিষ্কার।—সম্পাদক, পরিচয়

প্রশ্ন : সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর : প্রথমেই এমন প্রশ্ন করলেন যার উত্তরটা অনেকটা মুখস্থ বলার মত বলতে হয়। এমনি বলা যেতে পারে যে আমার সময়কে সৃজনশীলভাবে ধরে রাখা, আমার কথাগুলো জানানো।

প্রশ্ন : আমার মনে হলো এটা আপনি সাহিত্যস্রষ্টার দৃষ্টিতে বললেন, কিন্তু যাঁরা সাহিত্য পড়েন তাঁদের দৃষ্টিতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি রকম হবে ?

উত্তর : পাঠক হিসেবে আমি চাইব সৃজনশীল ভাবেই জীবনের সমগ্রতার উপস্থাপন।

প্রশ্ন : এখানে একটা প্রশ্ন আছে, আপনার কাছে যা জীবনের সমগ্রতা অন্য একজনের কাছে তা কিন্তু জীবনের সমগ্রতা নাও হতে পারে। তার কাছে জীবনের সমগ্রতাটা হয়তো অন্যরকম। আপনার কাছে সেটা মনে হতে পারে জীবনের বিরুদ্ধতা। এ সব জায়গায় সাহিত্যের উদ্দেশ্যটা আপনি কি করে ঠিক করবেন ?

উত্তর : আপনি জানতে চাইছেন কোন জীবনের সমগ্রতা ? 'কোন জীবনে' এই কথাটার মানে কি। জীবন, এই তো, তার সমগ্রতা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি যেটা বলছেন না কিন্তু জানতে চাইছেন তা হল আমার দৃষ্টিভঙ্গির কথা। এই জীবনকেই নানা লেখক নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন, দেখছেন এবং দেখবেন। তাদের অনেকেই ঠিকভাবে এবং অনেকেই ভুলভাবে জীবনের খণ্ডকে সমগ্র বলে ভুল করেছেন, করেন এবং করবেন। আমি কাকে জীবনের সমগ্রতা বলব, এই তো ? এখন এ নিয়ে প্রশ্ন করলে তো মহাভারত বলা যায়। তা না-বলে এক কথায় উত্তর দিচ্ছি তাতে সবটাই বোঝা যাবে।

আমি জগৎ ও জীবনকে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে চাই। আমি মনে করি একমাত্র এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই জগৎ ও জীবনের সমগ্রতাকে, তার প্রকৃত ঐতিহ্যকে, আত্মস্থ করা ও সৃজনশীল ভাবে নির্মাণ করা সম্ভব। অনেকে এই দ্বান্দ্বিক দেখায় বিশ্বাসী নন। ফলে আমি মনে করি যে তারা খণ্ডিত ভাবে জগৎ ও জীবনকে দেখেন। পার্থক্যটি ঘটে যায় দৃষ্টিভঙ্গিগত। সেটা ছিল এবং এখনও আছে।

প্রশ্ন : দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগে যাঁরা জীবনের

সমগ্রতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁদের সাহিত্যকে আমরা ভালই বলি। আজও তত্ত্ব হিসাবে একে না-জেনে কি ভাল সাহিত্য রচনা করা সম্ভব ?

উত্তর : আজও যদি কেউ দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতন না হন অথচ জীবনের কথা লেখেন, আপনি যা জানতে চাইছেন, তাঁর পক্ষে কি জীবনের সমগ্রতার অনুধাবন সম্ভব ? আমি বলব, সম্ভব। কারণ, ঐ ব্যালজাকের উদাহরণ দিয়েই বলব যে, একই ঘটনা আজও ঘটতে পারে, ঘটেও মাঝে মাঝে। তা ছাড়া পরে আমরা যখন আলোচনা করব, দেখতে পাব যে আমাদের এই সময়েই এমন লেখক আছেন যাঁদের কোনো কোনো লেখায় জীবনের এই সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা অসামান্য লেখা লিখেছেন। আমি একটু আগ বাড়িয়েই বলছি, যেমন কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসটি অথবা সমরেশ বসুরই কোনো কোনো গল্প, আবার তাঁদের অন্যান্য রচনাতে এই সমগ্রতার বোধ দেখা যায় নি বলে সে লেখা তেমন উত্তরোয় নি। সমরেশ বসুর ক্ষেত্রে তো অনেক লেখা খারাপই হয়েছে, দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে হবে। এবং এমন লেখকও আমাদের দেশে আছেন যাঁরা তাঁদের সাহিত্যজীবনের একটা পর্ব থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ না করে সৃজনশীল ভাবে জীবনের এই সমগ্রতাকে রূপায়িত করতে চাইছেন এবং সুন্দরভাবে এবং নিশ্চিত পদক্ষেপে করেও যেতে পারছেন। যেমন দেবেশ রায়।

প্রশ্ন : আমাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের সাহিত্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতিফলন কি যথোপযুক্ত হয়েছে বলে মনে করেন ?

উত্তর : না হয় নি।

প্রশ্ন : কেন হয় নি ?

উত্তর : কেন হয় নি, এটা এক কথায় বলা যাবে না। আমার কথা হচ্ছে আমি নিজেও এই 'কেন'-র উত্তর এখনো খুঁজছি। তবে কয়েকটা কথা আমি বলব। আমার একটা সেমিনারের কথা মনে পড়ছে। যেখানে অনেক বক্তা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোনো প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকও। তাঁরা বলছিলেন বাংলা কথাসাহিত্য বিশেষত বরাবরই ভীষণভাবে জীবননিষ্ঠ। আমি একটু অন্য কথা বলেছিলাম। আমি কয়েকটা প্রশ্ন তুলেছিলাম। আপনারা তো স্বাধীনতা-উত্তরকালের কথা বলেছেন বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কথা বলছেন। আমাদের এই ভারতবর্ষে যে একান্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কয়েক পুরুষ ধরে, কয়েক দশক ধরে চলল, বাংলা উপন্যাসে তার

ছাপ কতখানি আছে! আমি ভাবি যে পৃথিবীর বহু দেশের সাহিত্যিক দেশপ্রেমী রচনার জন্যে কত উৎপীড়ন সহ্য করেছেন। আমাদের দেশে ক'জন সাহিত্যিক প্রাক-স্বাধীনতার আমলে সেই উৎপীড়ন সহ্য করেছেন? আমি ভাবি যখন একদিকে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনকে প্লাবিত করল তখন রবীন্দ্রনাথের কিছু অসাধারণ গানই কেবল সৃষ্টি হয়ে থাকল কেন? এর পরবর্তীকালে একমাত্র 'গোরা' ছাড়া বড় জাতের কোনো উপন্যাস রচিত হল না কেন? আমি ভাবি, আমাদের অগ্নিযুগের কল্পনা-পরাস্তকারী বীরত্ব, রাজনৈতিক ভ্রান্তি, অথবা মহত্ত্ব এবং কত আন্দোলনের কথা—কত বীর ও শহীদের কথা মনে পড়ে—তাঁদের নিয়ে তৎকালীন জীবিত লেখকরা না লিখে থাকতে পারলেন কি করে? আমি ভাবি যে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পর রাজনীতি যখন গ্রামের কৃষকের ঘরেও পৌঁছে গেছে বা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন যখন সত্যিসত্যিই ইংরেজ-রাজকে কাঁপিয়েছে তখন আমাদের সেই বিদ্রোহকে সীমিত রাখি কি করে 'কল্লোল' ও 'কালিকলম'-এর পাতায়।

তারপর ধরুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কথা। একটা কথা যদি তার আগে বলে না দিই যে তার সঙ্গে চল্লিশের দশকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে কিছু কিছু যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছিল এবং আপনারা তো জানেন যে সেই সময়ে আমাদের দেশে ফ্যাশিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠিত হয়েছিল, যাঁরা শুধু সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, তাকে শিল্প মাধ্যমের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আন্তর্জাতিকতাবোধ এবং জাতীয়তাবোধ এই দুইকে মিলিয়েছিলেন, জীবনের নতুন বাস্তবতাগুলিকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করছিলেন, রূপ দিতে পারছিলেন। এই সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন করে লিখতে শুরু করলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন যে উপন্যাস, তার নায়ক পাঁচটা গ্রাম। একটি উপন্যাস লিখলেন নাম 'গণদেবতা' অর্থাৎ বাংলার কথা সাহিত্যে নিশ্চিতভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং নতুন মূল্যবোধ এলো। এই সময় 'নবান্ন'-নাটক হয়েছিল। এই সময় 'নবজীবনের গান' গাঁথা হয়েছিল। এবং এই সময় ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ এবং প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বাংলা দেশের প্রায় প্রত্যেকটি প্রবীণ ও নবীন শিল্পী ও লেখক। তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই খুব ইতিবাচক ও সদর্থকভাবে গল্পে কবিতায় গানে নাটকে ছবি আঁকায় এই নতুন মূল্যবোধের

শিল্পরূপ দিয়েছিলেন। আপনাদের চিত্তপ্রসাদের নাম নিশ্চয়ই জানা আছে, আলোকচিত্রও যে কতবড় একটা শিল্প মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে তা এই সময়ে আবার জানা গেল সুনীল জানার ছবিতে। এমনি কত নাম বলব। মহাভারত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারগুলি এ সময় ঘটে। এই সুযোগে এইটুকুও বলে রাখি যে, চল্লিশের দশকের এই যে যুগান্তকারী আন্দোলন তার স্রোতেই আজও ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য চলছে। এটা আপনারা খেয়াল করবেন যে এখনও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাষায় যে নবনাট্য, সৎনাট্য ইত্যাদি হচ্ছে, নতুন চলচ্চিত্রের যে আন্দোলন হচ্ছে, আর কথা-সাহিত্য ও কবিতায় যে-সার্থক অংশগুলি, তা নিশ্চিতভাবে সেই চল্লিশের দশকের ঐতিহ্যকে প্রসারিত করে এগোচ্ছে। তাছাড়া বাংলা কবিতায় সেই সময়ে বিষ্ণুবাবু, সুভাষদা, এবং নিশ্চয়ই আপনারা শুনে বিচলিত হবেন, তবু বলছি, এমন-কি, জীবনানন্দ দাশ পর্যন্ত যে আশ্চর্য কবিতা লিখেছিলেন, আজও আমরা তারই প্রতিফলিত আলোতে অনেক দূরের পথ হাঁটতে পারছি।

কিন্তু আপনাদের প্রশ্নটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের, অর্থাৎ ৪৫ সালের পর থেকে, সেটাকে যদি বলি স্বাধীনতা-উত্তর কালের, সেটা কি খুব দোষ হবে? যুদ্ধের শেষ ১৯৪৬ সালে এটা খুব স্মরণীয় কাল। কারণ এ-সময়েই বিশেষত বাংলা দেশে যে প্রচণ্ড ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা হয়, তারই প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছিল। এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল। এ তো গেল ইতিহাসের কথা। পূর্ব পাকিস্তান আমাদের চোখের সামনে বাংলাদেশ হল। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলা সাহিত্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতিফলন যথাযথ হয়নি। একেবারেই কি হয়নি? আমি বলব—না কিছু-কিছু হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু বড় লেখক তো জন্মেছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা স্বাধীনতা-উত্তরকালে জীবিত ছিলেন আমি তাঁদের আমার আলোচনার সীমার মধ্যে রাখছি। প্রশ্নটা হল স্বাধীনতা উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গে যে নতুন বাস্তবতার জন্ম হল, তাকে বাংলা কথাসাহিত্যে ঠিকমত আনা গেল না কেন? এ নিয়ে অনেক কারণ বলা যায়, অনেক কঠোর মন্তব্য করা যায়। আমি একটু অন্যদিক থেকে বলি, স্বাধীনতার পরে আমাদের সাহিত্যজগতে কিছু নতুন লক্ষণের জন্ম হল। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বটে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও বটে। স্বাধীনতার পূর্বে সাংবাদিকতা ছিল এক ধরনের দেশপ্রেমী কাজ। এবং প্রকৃত

সাংবাদিকরা দুঃখভোগের জন্য প্রস্তুত হয়ে সাংবাদিকতা করতেন। দুঃখভোগও করেছেন তাঁদের অনেকে। সাহিত্যিকরা কিছুটা দুঃখবরণের জন্য প্রস্তুত হয়েই সাহিত্য করতেন। পুরনো গল্প খুঁজলে দেখবেন, সেকালের মা-বাবারা কোনো সাহিত্যিকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইতেন না। কারণ হলো যে তা হলে মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনকে ক্ষুধার হাতে সমর্পণ করা হবে। স্বাধীনতার পরে কি হল? সাহিত্যিকরা দেখলেন যে সাহিত্য একটা চমৎকার জীবিকা হতে পারে, রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পাওয়া যেতে পারে। নানা ধরনের পুরস্কার, নানা ধরনের বৃত্তি, খেতাব এবং এই রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যের পাশেপাশে আমাদের সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক ধরনের মনোপলির আবির্ভাব ঘটল। এবং মোটামুটি স্বাধীনতার দশবছর পরে ৫৬।৫৭ সাল থেকে আমাদের সাহিত্য জগতকে নিয়ন্ত্রিত করতে লাগল একটি বৃহৎ পত্রিকা গোষ্ঠী। নাম করেই বলছি, 'আনন্দবাজার' এবং 'দেশ' গোষ্ঠী। তাঁরা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র মধ্য দিয়ে বাঙালি সাংবাদিকতার যে-ধরন-ধারণ তাতে বহুল পরিমাণে বদলে দিতে পারলেন। মোটের ওপর আধুনিক বুর্জোয়া জার্নালিজম্ তাঁরা আমাদের রাজ্যে প্রবর্তন করলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয়, তাঁরা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত এবং ক্ষমতাশালী প্রায় সমস্ত লেখককে চাকরি অথবা অন্য কোনো সূত্রে তাঁদের গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত করলেন। একদিক দিয়ে এটা ছিল খুব বড় কাজ। কারণ সাহিত্যিকরা চিরকালই অর্থের জন্য প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে অভ্যস্ত ছিলেন। দুঃখভোগ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-ই বড় সাহিত্যিকদের হয় চাকরি দিয়ে, নয় ফিচার লিখিয়ে মাসে একটা নিশ্চিত অর্থাগমের ব্যবস্থা করে দিলেন। এখন, এই যে 'ফিচার' বললাম, এটা কিন্তু খুব লক্ষণীয়। পত্রিকার, সংবাদপত্রের যে চরিত্র তা ক্রমে ক্রমে পাল্টাতে লাগল। নানা ধরনের চোখ-ঝলসানো, মন-ভোলানো ফিচারের সংখ্যা পত্রিকায় বাড়তে লাগল। যেহেতু সৃজনশীল সাহিত্যিকরা লিখতেন, সেহেতু তার মধ্যে দক্ষতা থাকত খুবই। তাই সংবাদপত্রের পাঠকেরা প্রতিদিনই এক ধরনের সংবাদপত্রের সাহিত্যপাঠে অভ্যস্ত হতে লাগলেন এবং অনিবার্যভাবেই ওটা কিছুটা হালকা হতে বাধ্য। ফলে একই সঙ্গে একটা প্রক্রিয়া আরম্ভ হল। বাঙালি পাঠকসমাজ আস্তে আস্তে দেখতে লাগলেন যে, সংবাদপত্রের ভাষা ও প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে। তাদের পাঠের অভ্যাস একটা নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে পাক খাচ্ছে। অন্যদিকে লেখকরা, আগে যাঁরা একান্তভাবেই ছিলেন সৃজনশীল, তাঁরা তাঁদের সাহিত্য প্রতিভা বা দক্ষতা নিয়োগ করতে

লাগলেন সৃজনশীল সাহিত্যের পাশাপাশি এই ধরনের ফিচার ইত্যাদি রচনায়। তাদের লেখার অভ্যাসও খানিকটা বদল হতে লাগল। অর্থাৎ কি-না লেখক এবং পাঠকের একটা বিরাট অংশ, তাঁরা তাঁদের জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে বদলাতে লাগল। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে ঘটে যায় আমারই বা আমাদের অনেকের চোখের সামনে—যার ফল আজ খুব প্রকটভাবে দেখা যাচ্ছে।

পাশাপাশি আরেকটি মনোপলি আমাদের আছে—'যুগান্তর' এবং তার সঙ্গে 'অমৃত'। বলা যেতে পারে 'দেশ'-এর সি-অথবা ডি-টিম। তার, পাশাপাশি তো নয়ই, এমনকি বি-টিমও নয়। ফলে সৎ সাহিত্যিক এবং সৎ পাঠক যাঁরা, তাঁদের কিছুই লাভ হল না, এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ায়। এবং ক্রমে একটা ভিসিয়াস সার্কেল তৈরি হল, যাকে প্রথমেই বলেছি মনোপলির আবির্ভাব। এই পত্রিকা গোষ্ঠীদুটি, বিশেষত প্রথমটি, তাঁরা যে শুধু পত্রিকা জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন তা নয়, ultimately তাঁরা বাংলা দেশের পুস্তক ব্যবসাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন। এবং অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত বহু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও দুর্বল হয়ে পড়ল, নয় বাধ্য হয়ে ভোল বদলালেন। নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেন বলতে সিগ্‌নেট বুকশপকে মিন করছি, ভোল পালটালেন বলতে ডি এম লাইব্রেরি, বেঙ্গল পাবলিশার্স-এর কথা বলছি। আর নানা রকমের প্রকাশনার প্রতিষ্ঠান রাতারাতি গজিয়ে উঠল এবং অতি দ্রুত বই বেরোতে লাগল। লেখকরা বা অনেক লেখক দু হাতে লিখতে লাগলেন। এখন ঘটনা হচ্ছে যে কোনো লেখকই তো ভগবান নন মানুষ। তাই তাঁর অভিজ্ঞতার একটা মাত্রা আছে, লেখার ক্ষমতারও একটা সীমা আছে। কিন্তু যেহেতু মনোপলি পাঠক-রুচিকে বদলে দিতে পেরেছে এবং সাহিত্যের বাজারটা প্রায় সিনেমার স্টারদের মতো অবস্থায় পরিণত হয়েছে, সেহেতু সৃজনশীল লেখকদের কাছে 'ইয়েস স্যর হাজির আছি'—এই কথা বলাটা প্রয়োজন পড়ল। ফিল্মস্টার যেমন তাঁদের বয়েসের ভাবনায় ভাবিত থাকেন তেমনি আমাদের সাহিত্যকুলের এক বড় অংশও ভাবিত হলেন কি-পরিমাণ উপস্থিতির প্রমাণ তাঁরা দিতে পারছেন তার ওপর, রচনার মানের ওপর নয়। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল। এটা হতে পারল এই কারণেই যে, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি, এমন কি বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি এবং আমাদের রাষ্ট্র সুস্থ এবং সদর্থক সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন নি এবং লেখকদের নিজের মর্জিমতো লিখে বাঁচবার উপায় করে

দিতে পারেন নি। সেইজন্য বহু লেখককে ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক, এই মনোপলির ভিসিয়াস সার্কল-এর মধ্যে পড়তে বাধ্য হতে হলো। খুব দুঃখজনক-ভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ জীবন অতিক্রান্ত হলো এবং সমরেশ বসুর মতো অত্যন্ত শক্তিশালী লেখক, তিনিও তাঁর যা-দেবার ছিল সাহিত্যে তিনি তা দিতে পারলেন না। এখন আপনারা বলবেন—না হয় তর্কের খাতিরে আপনার কথা মেনে নিলাম, তাহলেও এই লেখকদের বাধা কী ছিল যা তাদের স্বাধীনতা-উত্তরকালের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনকে রূপ দিতে দিল না। বাধা একটাই ছিল। সেটা হল শিল্পীর স্বাধীনতা। কমিউনিস্টরা শিল্পীর স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় সেই অর্থেই আমি বলছি, এটা মনে রাখবেন।

বাধা আরেকটাও ছিল, জীবনের সমগ্রতার বোধ এবং তাকে সাহিত্যে আনার ইচ্ছা, চেষ্টা ও সামর্থ। অনেকের ইচ্ছেই ছিল না, ফলে চেষ্টাও ছিল না আর অধিকাংশের সামর্থও ছিল না। কারণ মনোরঞ্জনই যখন সাহিত্যের এ্যাজেণ্ডা তখন জীবনের সমগ্রতা-এই ধারণাটাই ফিকে হতে হতে মিলিয়ে যায়। জীবনের সমগ্রতার ধারণা অনুপস্থিত থাকলে জীবনের সামগ্রিক রূপায়ণের প্রশ্নটাও অদৃশ্য হয়ে যায়। আর সেটা যখন অদৃশ্য হয়ে যায় তখন সমসময় ও সমাজ—তার বৈচিত্র্য, জটিলতা ও সমগ্রতা সহ—সাহিত্যে আসতেই পারে না। সেইজন্যই লক্ষ লক্ষ উপন্যাস এই সময় লেখা হয়েছে একহাজার থেকে দেড়হাজার পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

বলা উচিত আমাদের কোনো কোনো সাহিত্যিক এক-এক বছরে সেই সংখ্যক উপন্যাস লিখেছেন যা বিশ্ববন্দিত কোনো কোনো ঔপন্যাসিক গোটা জীবনেও লিখতে পারেন নি। তবে এসব ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এই মনোপলির পাপচক্রে পড়লেও এটা তো সত্যি যে এদের অনেকেই সাহিত্যিক। যেমন সমরেশবাবু। আমার বহু শ্রদ্ধাভাজন বা অন্তরঙ্গ, সমরেশ বসুর সম্পর্কে ভয়ানক অভিযোগ এবং অভিমান পোষণ করেন। অভিযোগ তো আমারও আছে। তার থেকে বেশি আছে অভিমান। কিন্তু আমি তো মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারি না যে তিনি একজন জাত-লেখক এবং বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে তিনি এসেছিলেন। তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে-পর্বে, তার পরবর্তীকালের প্রধান লেখক তাঁরই হবার কথা ছিল। নানা কারণেই তিনি বেশি লিখছেন, লিখতে বাধ্য হচ্ছেন হয়তো। আমি খুশি হতাম যদি প্রথম জীবনের মতো আমৃত্যু তিনি সৃজনশীলতার স্বাধীনতার জন্য দুঃখবরণে প্রস্তুত থাকতেন। তা সত্ত্বেও, আমি তো জানি, এরই মধ্যে

যেহেতু তিনি প্রকৃত লেখক, সেহেতু মাঝেমাঝেই এমন লেখা লেখেন যা সর্ব অর্থেই এক সময়ের প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা, এবং আপনাদের স্তম্ভিত করে আমি যদি বলি যে আমি 'বিবর'-কে একটি significant লেখা মনে করি, তাহলে কি আমার আরো অনেক বন্ধুর মতো আপনারাও আমাকে ভুল বুঝবেন? তা বুঝুন। কিন্তু আমি আবার বলছি যে, significant লেখা হচ্ছে 'বিবর' এবং সমরেশ বসুর পক্ষেই এই উপন্যাস লেখা স্বাভাবিক ছিল। বা তার পরে, আমি এখন সব লেখা পড়ার সুযোগ পাই না, হাতের কাছেও পাই না, তার পরেও তার কিছু কিছু গল্প আমাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু আলোচনাটা খুব ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমি এবার শেষ করছি এই প্রসঙ্গে-যে, না, যেহেতু সাহিত্য এখন পণ্যে পরিণত হয়েছে সেহেতু আমাদের সাহিত্যিক সমাজ স্বাধীনভাবে লিখতে পারেন না এবং ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আমাদের খণ্ডিত রেনেসাঁসের যে-দায়ভাগ আমরা আজও বহন করছি, বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে বুদ্ধিজীবী সমাজের যে-বিচ্ছিন্নতা, ক্রমেই যা তুঙ্গে উঠছে, তার অনিবার্য প্রতিফলন হিসেবে আমাদের সমকালের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ঔপন্যাসিকরা প্রায় অনেকেই আমাদের সময় এবং সমাজকে সমগ্রভাবে ধরতে পারছেন না। তাই সমকালের সামাজিক অর্থনীতিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিফলনও তাতে ঘটছে না। কিন্তু কয়েকজন লেখক, এঁরা নিশ্চিতভাবে ব্যতিক্রম, যাঁরা মনোপলির পাপচক্রের মধ্যে থেকেও মাঝে মাঝে অসামান্য ভালো বা মোটামুটি ভালো লেখা লেখেন, তাঁরা তো আছেনই কয়েকজন। তার বাইরে আছে কিছু লেখক, খুব মুষ্টিমেয় অবশ্য, বাংলা দেশের পাঠকসমাজ তাঁদের নাম বিশেষ জানেন না, তাদের বই কম ছাপা হয়, আদপেই বিক্রি হয় না, এই যে কয়েকজন লেখক, এঁরা স্বাধীনতা-উত্তরকালের যে জীবন তাকে তার সমগ্রতায়, বৈচিত্র্যে, জটিলতা-সহ ধরবার নিরন্তর চেষ্টা করেছেন, কখনো কখনো ধরতে পারছেন, কখনো কখনো পারছেন না। কিন্তু তাঁরা যে চেষ্টা করছেন, এটা নিশ্চিত ভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত, এবং তারা চেষ্টা করতে পারছেন এই জন্যে যে, সুলভ জনপ্রিয়তার জালে তাঁরা নিজেদের জড়ান নি এবং সাহিত্যের জন্যে দুঃখবরণে এঁরা আজও প্রস্তুত।

প্রশ্ন: এ প্রসঙ্গেই আর একটি প্রশ্নে আসি, সেটা হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলা সাহিত্যে আর-কি দুর্বলতাগুলো আপনি দেখেছেন?

উত্তর: আর-কি দুর্বলতা? এ-বিষয়ে বলার আছে আমার, জিজ্ঞেস

করা উচিত, আমি যে এই দীর্ঘক্ষণ ধরে কথাগুলো বললাম তার মধ্য থেকে কি কি দুর্বলতা আমি বলেছি বলে আপনারা বুঝলেন? কিন্তু আমি সে প্রশ্ন করছি না, আমি বলছি যে, আমি যা বলেছি তাতেই সব বলা হয়ে যায়। এক নম্বর কি? আমি বলেছি যে,—সেটা অবশ্য একলাইনে বলেছি, অনেকক্ষণ ধরে বলা যেতে পারত—উনবিংশ শতাব্দী থেকে আমাদের শিক্ষিত, পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা দেশের সমষ্টির থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তাঁদের অনেক বড় অবদান আছে, কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতা তাদের জীবন ও কর্মকে প্রভাবিত করেছিল, পরবর্তী কালে তার দায়ভাগ আজও অবধি আমরা বহন করছি। আমরা প্রধানতঃ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী লেখকরা, এ হচ্ছে 'এক', দ্বিতীয়ত, গত দশবছরে দেখেছেন যে, বাংলা উপন্যাস কি ভীষণভাবে কলকাতাকেন্দ্রিক হয়েছে, আমার এমন কোনো ছক নেই যে উপন্যাস গ্রাম নিয়েই লিখতে হবে, নিশ্চয় না। কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবি যে একজন লেখক তিনি তার অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ রাখেন কি করে বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে? আরো সত্যি করে বললে, বিশেষ কয়েকটি সামাজিক স্তর-বিন্যাসের মধ্যে? এই যে অভিজ্ঞতাকে সীমাবদ্ধ রাখা, সংকীর্ণ রাখা, এটা তো আমার সমগ্রতা-বোধের ঘোরতর পরিপন্থী। এই জিনিসটাই চলতে থাকে। তৃতীয় ব্যাপার হল যে, এত কলকাতাকেন্দ্রিক বা শহরকেন্দ্রিক উপন্যাস লেখা হয়, কিন্তু কলকাতা শহর তার অসামান্য ঐতিহ্য, প্রচণ্ড বৈচিত্র্য এবং, কি বলব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না এই মুহূর্তে, মোদ্দা কথাটা হল, কটা উপন্যাসে কলকাতা শহরটা আসে, বা কলকাতার মানুষগুলো আসে। এখানে তাহলে বোধহয় দেখার মধ্যে কোথাও ফাঁকি বা ফাঁক থেকে যায়। যার ফলে আমরা কলকাতার বাইরের তো জানিই না, এমনকি কলকাতাকেও ভাল করে জানি না, আর আমি বলতে চাই যে জনপ্রিয় উপন্যাসের একটা ছক জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে যখন লেখককে পরিচালিত করে তখন এই ধরনের ব্যাপারগুলি ঘটতে বাধ্য, এই।

প্রশ্ন: আর-কি কিছু চোখে পড়ে নি আমাদের কাছে বলার মত। দুর্বলতার আর কোনো ক্ষেত্র কি আপনার চোখে পড়েছে?

উত্তর: একটা কথা কি খুব স্পেসিফিক্যালি শুনতেই চান আপনারা, আপনাদের পরবর্তী প্রশ্নে দেখছি—'পশ্চিমী প্রভাব'। আমি পশ্চিমী প্রভাব ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝি না। পুরানো কথা যে, আমার বিশ্ববীক্ষা আছে,

তাই বিশ্ব সাহিত্যের যে মহৎ উত্তরাধিকার তা আমারই উত্তরাধিকার, যেমন রবীন্দ্রনাথের ছিল যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। এবং বাংলা সাহিত্যও পশ্চিম থেকে নানাভাবে ঋণ গ্রহণ করেছে। এগুলো সব কেতাবী কথা, বলতে সংকোচ বোধ করি। কিন্তু একটা কথা আমি বলি, ১৯৫৯/৬০ বা ৬১/৬২ সালে কলকাতা শহরে তরুণতর এবং তরুণতম কথাসাহিত্যিক, কবি, যাঁরা তাঁদের মত existentialism এবং আলবের ক্যামুকে বুঝেছিলেন এবং কিছু মার্কিন গল্প-কবিতা-নাটককে একটু অতিরিক্ত মূল্য দিয়েছিলেন তাঁরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, প্রধানত লিটল ম্যাগাজিনগুলোয় যা প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে, আমার বিচারে, কিছু সদর্থক দিকও ছিল। তাঁরা সমকালীন অবক্ষয়কে হয়ত তাঁদের অজ্ঞাতসারেই, তাঁদের সাহিত্যে প্রতিভাত করলেন। আর, আর-এক ধরনের ছকে তাঁরা পড়ে গেলেন, যে-ই ছক আবার প্রায়ই ননকমার্শিয়াল সাহিত্যের বেশ ক্ষতি আনে। আমি কারোও নাম করলাম না, কোনো পত্রিকার নাম করলাম না, কোনো গোষ্ঠীর নাম করলাম না, ইচ্ছে করেই করবও না এখন। আশাকরি, আপনারা বুঝতে পারলেন আমি কি বলতে চেয়েছি, অর্থাৎ ব্যবসায়ী পত্রিকাগুলিতে যেমন একধরনের ছক ছিল, তেমনি কোনো কোনো অ-ব্যবসায়ী লিটল ম্যাগাজিনেও আর এক ধরনের ছক আবির্ভূত হল। এবং এই দুই ছক বাংলা সাহিত্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আবার এই দুই ছকের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ বেশ কিছু ভাল লেখা লিখেছেন, এবং এই দুই ছকের বাইরে থেকেও কেউ কেউ আরো অনেক ভালো লেখা লিখেছেন। এই আমার মোট বক্তব্য।

প্রশ্ন: এই কালসীমাতে বাংলা সাহিত্যে গল্প নাটক কবিতা ইত্যাদি যতগুলি শাখা হয়েছে তার মধ্যে কোন শাখাটা সবচেয়ে বেশি ঐশ্বর্যবান হয়েছে?

উত্তর: আমি যদি একটু গোষ্ঠীতান্ত্রিক হই তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই মার্জনা করবেন। আমি বলব গল্পের শাখা, এবং প্রমাণ হিসেবে আমি একজন সমালোচককে উদ্ধৃত করব। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে, বাংলা গল্পে যখন নতুন ভাবে গল্প লেখবার একটা চেষ্টা চলছিল, তখন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মোটামুটি ভাবটা আমি বলছি, আমারই ভাষায়। কথাটা এই ছিল যে চিরকাল বাংলা কবিতা বাংলা গল্পের চেয়ে এগিয়ে থাকত, পথ দেখাত। এই প্রথম বাংলা গল্প বাংলা কবিতার থেকে এগিয়ে আছে এবং বাংলা কবিতাকে প্রভাবিত করছে—এই জাতীয় কি যেন

একটা বলেছিলেন আর-কি। কথাটা আমার খুব ভালো লেগেছিল তখন, বুঝতেই পারেন। এবং তারপর ষাটের দশকে বা এই সত্তরের দশকের পঁচাত্তর বছর চলছে, এই পনের বছরে তেমন কোনো আন্দোলন হয় নি সাহিত্যের, যা সবাইকে নাড়া দিয়েছে। কি গল্পে, কি কবিতায়। কিন্তু নিশ্চিতভাবে ভালো গল্প-কবিতা লেখা হয়েছে বেশ কিছু। আমার ত মনে হয়েছে এখনও যত কম সংখ্যাতেই হোক, বাংলা গল্পই বেশি লেখা হচ্ছে উপন্যাস-কবিতা-নাটক ইত্যাদির চেয়ে।

প্রশ্ন: একটা প্রশ্ন আছে—আপনি বলছেন গল্পটা সবচেয়ে বেশি এগিয়েছে, কিন্তু এটাও বোধহয় আপনি দেখেছেন যে গল্পের বইটা সবচেয়ে কম বিক্রি হচ্ছে এবং গল্পের পাঠক খুব কমে গেছে এর কারন কি?

উত্তর: আমি ঠাট্টা করে একটা কথা বলব, আমাদের একজন প্রখ্যাত রাষ্ট্রনীতিক বলেছিলেন, statesman নিন্দে করেছে তাহলে বুঝতে হবে আমরা ঠিক পথেই আছি। তো আপনি বলছেন যে এখন যখন দশ-দিনে পনের-দিনে বই এর সংস্করণ হয় বলে বিজ্ঞাপন দেখি তখন বাংলা গল্পের বিক্রি একেবারে কমে গেছে? তাহলে হয়ত— ঠাট্টা করেই বলছি অবিশ্যি— যে, বাংলা গল্প বোধ হয় কিছু ভালই লেখা হচ্ছে।

প্রশ্ন—একালটাতে আপনি আমাদের সাহিত্যে এমন কিছু কি দেখেছেন যা সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর রচনাগুলোর সমপর্যায়ভুক্ত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: সমকালীন বিশ্বসাহিত্য আমি কিন্তু যথেষ্ট পড়ি নি এটা আগেই বলে রাখি। এমন-কি এক সময় যাদের লেখা দ্বারা আমি প্রভাবিত হয়েছিলাম বলে কাগজে-কলমে কিছু লেখা হয়েছিল তাঁদের অনেক লেখা আজও অবধি আমি পড়তে পারি নি। এটা গৌরবের কথা নয়, লজ্জারই কথা, তবু এটা সত্যি কথা। তাই সমকালীন বিশ্ব-সাহিত্যের সম্পর্কে কিছু রায় দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে কিছু ত আমি পড়েছি। আমি টলষ্টয়, দস্তয়েভস্কি পড়েছি। পশ্চিমের আরো কিছু প্রাচীন মাস্টার্স বা আধুনিক লেখকের লেখা আমি পড়েছি। আমি মনে করি নিশ্চিতভাবে স্বাধীনতা উত্তর কালে, এমন কিছু গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে যা বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পেতে পারে। এখন, আমরা কে না মনে করি, যে তারাশঙ্কর বা মানিকবাবুর অনেক লেখা নিশ্চিতভাবে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পায়, কিন্তু আমি তাঁদের কথা বলছি না। আমি বলছি এই এখনকার লেখকদেরই কথা।

যেমন ধরুন, একটি উপন্যাস, 'অন্তর্জলী যাত্রা', যার কথা আমি আগেই বলেছি, আমি মনে করি মহৎ উপন্যাস। বা গল্প, আমি মনে করি যে আমাদের দেবেশ রায়, গত দশ বছরে কি পনের বছরে এমন কয়েকটি গল্প লিখেছেন যা নিশ্চিতভাবে পৃথিবীর পাঠকদের উপহার দেওয়া যায়। আপনারা যদি আমাকে একটু সময় দিতেন তাহলে আমি অসীম রায় এবং আরো কারোর কারোর কয়েকটি গল্পের কথা তালিকা করে দিতে পারতাম। সেগুলোও আমি মনে করি দুনিয়ার পাঠকদের সামনে তুলে ধরা যায়। এবং এটা খুব অকুণ্ঠিতভাবেই আমি বলছি যে, নিশ্চয় হয়। এখন এঁদের দুর্ভাগ্য, যেমন দুর্ভাগা ছিলেন তারাশঙ্কর, মানিকবাবু যে এঁরা বাংলা ভাষায় লিখতেন, এবং আমাদের এই দেশে অনেক আয়োজন আছে কিন্তু বড় লেখার উপযুক্ত তর্জমা করার আয়োজন ঠিকমতো নেই। এবং তা বাইরের পাঠকদের পড়াবার ব্যবস্থাও ঠিকমতো নেই, তাই এঁরা বাইরে খুবই অপঠিত। আর তাছাড়া বাইরের কথা কি-ই বা বলব, ধরুন আমার ঘরেই কি কমলকুমার মজুমদার, দেবেশ রায়, অসীম রায় এঁরা আদৌ পঠিত! বহুল-পঠিত ত দূরস্থ।

নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ

দীপশিখা অনির্বাণ !

গোপাল হালদার

অরুণা হালদার

প্রদীপই আগুন, তবু প্রদীপ ফুরিয়ে যায়
হয়ত বা শেষকালে দীপকলিকার বৃন্তে
একটুকু ছাই পড়ে থাকে।
দীপশিখা ততক্ষণ জ্ব'লে, জ্ব'লে, চলে
শিখা থেকে শিখান্তরে—আলোক প্রয়াণে
অন্ধকার দীর্ণ ক'রে ! তবুও জানি না
সে জলা কি চলা নাকি নিয়তি নিষ্ফলা !
কখনও সে মাঙ্গলিক গৃহের অঙ্গনে
প্রিয়মুখে চোখের প্রদীপ প্রতিভাসে—
কখন সে দীপ্তশিখা—অতি সমুজ্জ্বল
কোনও আহিতাগ্নিক সংকল্পের
কল্যাণ শোভন হোমজ্যোতি !
শিখা থেকে শিখান্তরে—জ্বলে আর নেভে

কখনও স্তিমিত রেখা নিবিড় আঁধারে
কোথাও সে সুনির্মল পরিমিত আয়ুতৈল সেকে।

মানব হৃদয় শিখা হাসির প্রদীপে, দু চোখের জলে
ডাক দেয়—আলো দেয়—আর, নিভে যায়।
অ পরিমেয় যন্ত্রণায় ইশারায়
দিগন্ত সম্বৃত কালো আকাশের বুকে
বিদ্যুৎ জ্বালায়।
দিশাহারা পথিকের অন্ধচোখে জাগে
ক্ষীণ দীপালোক—ভালোবাসা আলো হঠাৎ জ্বলে,
প্রাণের স্ফুলিঙ্গ থেকে নব প্রাণোন্মেষ
জন্মান্তরিত হয় মেঘে মৃত্তিকার স্বপ্নে—
আকাশের অন্ধকার চিরে দিয়ে যায়
বিজ্জ্বলন্ত অহমিকা বেদনাভিযান—
কাঁপা দীপকলিকার পাশাপাশি দীপ অনির্বাণ।
কাল থেকে কালান্তরে স্রোত বয়ে যায়
ক্ষীণ একা দীপশিখা দূর—আরও দূর!
তট হ'তে সীমাহীন তরঙ্গ বিস্তারে
আপন আবেগ লক্ষ্যে জ্ব'লে জ্ব'লে চলে যায়
সে চিরায়মান শিখা, একা বড একা!
বিধুনিত তরঙ্গের ওপারে যায় না দেখা আর
এপারের মানুষের বাসনার বেদনার স্পর্শের বাইরে
দেখতে দেখতে শেষ প্রদীপের ইতিহাস—
সবটুকু একাকার উদয় বিলয়।

তারপরে? একমুঠি ভস্মের তিলকে
মানুষের স্মৃতি খোঁজে চির নির্বাপিত
অনির্বাণ দীপ কলিকারে!

২২.১.৭৯

দীপেন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদে শোকাহত অরুণা হালদার ও গোপাল হালদার
এই কবিতাটি শ্রীমতী চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠান

দীপেনের জন্য, একটি স্বপ্ন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমাদের বুকের ভেতর
যে হৃৎপিণ্ডটা ধুকপুক করছে
তার সঙ্গে যদি
কিছু গরম চোখের জল মেশাতে পারতাম,
আমরা কি তা দিয়ে
অনেকগুলি রুটি বানাতে পারতাম
যা মানুষের ভালবাসার খিদে মেটায় ?

অথবা আমরা কি
শ্মশান থেকে ঘরে ফেরার পথে
সবাই একসঙ্গে
এমন একটি ভাল-থাকার গান বানাতে পারতাম,
যা শুনতে পেলে
আমাদের সেইসব বন্ধুরা—যারা আজ, কাল,
পরশু এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে
সবাই দল বেঁধে আবার ফিরে আসে ,
আমাদের গলায় তাদের গলা মেলায় ,
আর পৃথিবী
একটি আশ্চর্য, সুন্দর মানুষের পৃথিবী হয় ?

২০ এপ্রিল, ১৯৭৯

খবর

রাম বসু

দীপেনের ৪।৬।৭৮ তারিখের একটা চিঠির অংশ : 'আমি লোকটা যে আছি না গেছি একবার খবর তো নেন না !'

নিশাক্রান্ত রণভূমি পার হয়ে গেলে
পুরাণের চরিত্রের মতো

খবর এখনই নিতে হবে
কারণ, এখন তুমি বাঁচার প্রখর সুগন্ধি ।

বুকের আট দলের পদ্মটা ফেটে পড়েছে
বৃষ্টির ধারায় ভিজে গেছে আশ্রয়ভূমি
দীপেন, পরস্পরের নিবিড় খবরের সময় এল এখন ।

ধ্রুবপদের পায়ে পরিপূর্ণ ফল
আলোর প্রান্তরে ঋতুচক্রের গোলাপ
ঠোঁটে অপরিমিতের স্বাদ
দুই হাতে গরল আর অমৃত
তুমি এখন নক্ষত্রের ধুলোয় প্রসারিত
নদী আর নক্ষত্রের কাছ থেকেই তোমার
খবর পাবো, দীপেন ।

রাজার চিঠি

সিদ্ধেশ্বর সেন

শ্রীমান দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য

": প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও—এখন আকাশের
তারাটি থেকে আলো আসুক
: এরা আমার ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন ! তারার
আলোতে আমার কি হবে !
: চুপ করো অবিশ্বাসী ! কথা কোয়ো না"

—ডাকঘর

সুধা, দাও তোমার ফুল

অমলের শিয়রে রইল

তোমার ফুল র'য়ে গেল, তুমি
তো ভোলোনি তাকে, এই সত্য থাক—

কেউ কী ভুলেছে তাকে, কে
ও-কে ভোলায়

হাসপাতালের মধ্যে যে বকুল, তার কতো ফুল
ঝরে যায়

ফুলের স্তবক, স্তূপ, ক্রিমেটোরিয়ম
অবধি ছড়ায়

ফুল থেকে
আগুনের ফুল্‌কি, থেকে
আকাশের তারা থেকে আলো—

প্রদীপ নিবিয়ে ফেলো

বন্ধ যত দরোজা-জানালা খুলে দিলেন রাজ-কবিরাজ,
অন্ধকারের ওপারের সব তারা
দেখে তুমি নিয়েছ অমল ?

মধ্যরাতে রাজা এলেন নিজে, শয্যা ছেড়ে
উঠেছ অমল ?

রাজদূত বার্তা এনে দিয়েছিল জানি, দ্বার ভেঙে,
তোমার প্রহরীর ঘণ্টা তেমনি কি বেজেছিল

ঢং ঢং ঢং

দু' প্রহরে, রাতে, তুমি শুনেছ অমল ?

রাজার চিঠি তো ছিল, ফকিরের বেশে সত্যবাদী

ঠাকুর্দা হলফ করেছিল

গাঁয়ে-না-মানলেও সেই আপনি-মোড়ল
স্থূল হাসাহাসির বিষয়, তবু তুমি
ক্ষমা করে দিলে যে তাকেও, অমল

তোমার নামের মতো অনাবিল, তুমি না অমল.
তোমার জানালার পৈঠে বেয়ে, তাই
চলে যেত লোকযাত্রা ঘুরপথে, দূরে
পাহাড, ঝর্ণা, নদী ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে

কখনো সে দইঅলার হাঁকে, ছেলের দলের
চাষবাসের খেলায়
মল ঝল্‌মল্‌-করা মালিনীর মেয়ের
ফুলের সাজির সঙ্গ নিয়ে

রাজার তকমা-আঁটা ডাক-হরকরাদের কাঁধে
একগাদা বিলি-করবার
চিঠির থলিতে
(তোমারও চিঠিটি যার মধ্যে ছিল, লুকিয়ে, অমল)

বাদল-হরকরা, শরৎ-হরকরা,—ঋতুতে, ঋতুতে প্রত্যেকে ওরা—
মনে পড়ে ?

মনে পড়ে পাঁচমুড়ো পাহাড়তলীতে, শামলী নদীর ধারে
গাঁ ?
খঞ্জ ভিখারী এক নতুন কাহিনী শুনে গিরিও ডিঙোতে যেত মনে

আর, লাঠির আগায় পুঁটুলিতে চিঁড়ে বাঁধা
পুরোনো নাগরা জুতো পায়
ডুমুর-গাছের তলা দিয়ে, ঝিরঝিরে নদীটি পেরিয়ে

কাজ খুঁজতে যাওয়া সেই মানুষ, অমল
তোমারই দেখা

কাজ খুঁজতে কাজ খুঁজতে, মানুষ
খুঁজতে খুঁজতে, মানুষের কাজে
তোমাকেও দেখা যে, অমল

একটি তারার আলো ধ্রুব-বিশ্বাস
রাজা এসে জাগাবেন ও-কে—
ততক্ষণ দিয়ে যেও ফুল,
বোলো 'সুধা, ভোলেনি তোমাকে'॥

তুমি আছো, সেইভাবে আছো

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ভালোবাসা ভেবেছিলো, তোমাকে অর্পণ করে তার
যা আছে সবটুকু, দিয়ে, ছুটি নেবে, বিদায় জানাবে ··
বিচারসাপেক্ষ এই জনে-জনে বেঁটে দেওয়া থেকে
এবার নিষ্কৃতি নেবে, ভালোবাসা ভেবেছিলো এই
কিন্তু, তুমি ছুটি নিয়ে গেলে···
স্মৃতির স্থগিত রূপ রেখে গেলে চোখের সুমুখে
বুকের ভিতরে রেখে গেলে নিষ্ঠাবান মাতৃমুখ
করস্পর্শ রেখে গেলে শোকদুঃখ থেকে তুলে নিতে
বন্ধু ও শিশুর মতো কতোকাল তোমার প্রশ্রয়
পেয়েছি, তা, আমি জানি, আর জানি কখনো পাবো না।

পিছনে দেবদারু গাছ, তার শান্ত ছায়ার বিকেলে
প্রেসিডেনসি কলেজের সেই থান, উর্ধ্বগামী সিঁড়ি
বরফখণ্ডের রোজ বারান্দার এখানে-সেখানে
পড়ে আছে, তুমি নেই...
কোনদিন ছিলে না এমন, ছিলে নাকি ?

স্বভাব ছিলো না কিছু আগে আসা, সময়ের আগে?
সময়ের বেশ কিছু আগে এসেছিলে বলে আফসোস করোনি
এতো স্বাভাবিকভাবে তুমি সব মেনে নিয়েছিলে
আমরা পারি নি, তাই, মাঝেমধ্যে বেঁকেচুরে গেছি…

সাদর আঙুল তুলে তুমি সাবধান করে দিতে, মনে আছে?
তোমার মন তো ভালো, কারো মন্দ কখনো ছাখোনি
নিজেকে বিপন্ন করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছো
দীর্ঘ ও সহাস্য হাত অসুখের রেখেছো কপালে
কতোবার, আরোগ্যের মধ্যে ছিলো তোমার করুণা।
করুণাই বলি একে, বিশ্বাসভাজন ভালোবাসা
কিংবা, তারও চেয়ে কিছু বেশি এই নিষ্পলক আলো
অন্ধকার গলি থেকে বহুবার সড়কে এনেছে
আমাদের।

বন্ধু, সুখে থেকো আর মনে রেখো দেবদারুচ্ছায়ে
কিছু কিছু লতাগুল্ম, ছোট গাছপালা—তার কথা
তোমার মন তো ভালো, মনে রেখো, পরিত্রাণ করো
প্রকৃত সংকট থেকে, ভালোবাসাহীনতার থেকে
ক্ষমা করো, শেষ দৃশ্যে আমি যেতে কিছুতে পারি নি
যাতে, মনে হতে পারে, তুমি আছো, সেইভাবে আছে,
যেভাবে আগেও ছিলে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে
কাছাকাছি

ক্রীতদাস কি বোঝে মুক্তির?

অমিতাভ দাশগুপ্ত

'প্রায়'—এই শব্দটির ভুল ব্যবহারে
প্রকৃত প্রলয় ঘটে যেতে পারে—একথা জেনেও
আমার সমস্ত প্রায় কেড়ে নিয়ে চলে গেলে তুমি।

বিপন্নতা এসেছে এখন
অমোঘ মোষের মত প্রস্তুতিবিহীন খুব কাছে।
তাছাড়া আমার আছে লাল শার্ট
যা সবারই প্রিয়,
বিশেষত পশুদের—নির্বিবেক বুনো প্রবৃত্তির
ভারী মনোমত সেই বিপদসংকেত,
অমোঘ মোষেব মত খুব কাছে এসেছে এখন
প্রস্তুতিবিহীন—বিপন্নতা।

•

স্তিমিত আলোর নিচে ঐখানে সমাসীন ছিলে।
টেবিল ও থুতনির মাঝখানে হাতের হাইফেন
বালকেব চেয়ে খুশি প্রবীণের চেয়েও গম্ভীর
দশবছর আশিরনখর
আমাকে জরিপ করে কি পেয়েছ? খুঁতো গুল্ম, তীক্ষ্ণ কাঁটাগাছ?
ভালো নয়, কমসম নষ্ট, কবি নামে হঠকারী?
অত ভালোবাসা মানে শাস্তি, মানে দীর্ঘ দশ বছব
মুঠো খুলে ফেলা নয়, পুবো নষ্ট হতে দেওয়া নয়।

তোমাব মৃত্যু এসে একটানে হঠায় চাদব।
বাতাসে উড়েছে খড়, ময়না কাঁটা উড়ে এসে
বসেছে ভালু ও বুকে,
সকলেই ছুঁড়ে দিয়ে অনুকম্পা
যাব যার তুলেছে কুঠার—
দায়বদ্ধতার থেকে পুরোপুরি কাকে মুক্তি দিয়ে যাও তুমি?

•

আমার অসুখ আগে নিয়েছিলে,
পরাধীনতার অর্থ সুখ
সেই সুখও কেড়ে নিলে,
কাকে মুক্তি দিয়ে যাও—ক্রীতদাস কি বোঝে মুক্তির

দীপ

কবিতা সিংহ

গগন ঠাকুর তাঁর জলরঙা ছবিটির থেকে
ডোবান-ওঠান তুলি
রঙে রঙে গাঢ় ছয়লাপ !
তুমি সেই প্রলাপের পরপারে গিয়ে পাও—
জীবনের দুরূহ সবল।

অমন সজল ধাপ
অমন ভবল ধাপ
দুলে ওঠা রক্তের সরণি ধিকি ধিকি

বড় অশ্রুময় ওই উত্তরণ ওঠা
বড় রক্তময় কাঁটা ফোটা।

জ্বলন্ত সময় থেকে, ঘুবন্ত সময় থেকে তবু তুমি
তুলেছ তর্জনী
তোমার নির্বাকে আমি
আমি, ও আমরা সব—
সময়ের বজ্রঘোষ শুনি।

হিরণ্ময় দেবদারু

তুলসী মুখোপাধ্যায়

কার কাছে যাবো আর
কোথায় দাঁড়াবো ? আশ্রয় কোথায় ?
যুদ্ধ কই ? নিরাময় কই ?
মাংসাসী প্রেমিকার মতো
নষ্ট পাপোষ এসে

কোমর দুলিয়ে ধরছে তীব্র নখে দাঁতে
চিলের ঠোঁটের মতো
ঘরের আরাম এসে ছোঁ মেরে নিতে চাইছে
অন্ধকার কামুক পাতালে
কে দেবে শাসন? বিবেক কোথায়? কোথায় তক্ষক?
চিত্রল হরিণী ডাকছে
মায়াময় গূঢ় আলিঙ্গনে
অবিরাম ··দিবানিশি· অবিরাম
অশ্বখুরে জ্যাকপট অশ্বখুরে জ্যাকপট ঝমাঝম জ্যাকপট
হায়! এই অলৌকিক মত্ত আন্দোলনে
আমি আর শিরদাঁড়া রাখতে পারি না
আমি আর শিরদাঁড়া রাখতে পারি না
কে দেবে উদ্ধার? কে দোলাবে জয়ের নিশান?
দীপেন্দ্রনাথের মতো আর কোনো দেবদারু
আর কোনো হিরণ্ময় দেবদারু
আমাদের চারপাশে নাই।

হিব্রুদের ভগবান

কমল চক্রবর্তী

আগুনের জাহাজে আগুন ধরিয়ে এলুম।
দীপেন মারা গেছেন।
আমাদের ঘোড়াটির রং কালো
বিদ্যুৎবাহী ঘোড়াদের খুরে আগুন ধরেছে, হে আকাশ।

ধরা যায় রাত হয়, রাতে কাক ডাকে, কাকের পালকে ভালবাসা
গতকালও খোকাদের জন্য মোয়া গেছে
শেষ ট্রেনে আবেগ তাড়িত পোনা মাছ, চিতলের পেটী

গতকালও জবা ফুল ফুটেছে মড়কে
আজ দীপেনের চণ্ডালেরা ভাত ঘুম ভেঙে, কাঠ নিয়ে তর্ক জুড়েছে

এসো খেয়া পারাপার কবি
মনে শোক গোপন কোর না নৌকো বাও, মন মুরশীদের ছবি
ডুবে গেলে ছাপাখানা ঘণ্টা হয়ে বাজে
রতিশাস্ত্র বিশারদ কলম ধরেছেন, ভুবনের মা
হিক্রুদের ভগবান বড বেশি সময় নিচ্ছেন, জেগে ওঠো।

দীপেন্দ্রনাথ সঙ্গে আছে

অমরেশ বিশ্বাস

সপ্তব্যূহের বেড়াজালে
পথ পাওয়া-না-পাওয়ার কালে
দুহাত কাটা নেত্যচরণ
আগুন নিয়ে রক্তে নাচে।
বস্তুত এই মাৎস্যন্যায়ে
মিছিল হাঁটে পায়ে পায়ে
বজ্রমুঠি একটি মানুষ
কলম শানায় অসির ধাঁচে।
দেউলে-হওয়া আমরা দেখি
মরে গিয়েও হয় নি মেকি
ছোটো মাপের বড়ো মানুষ
দীপেন্দ্রনাথ সঙ্গে আছে।

স্বর্গের ঠিকানায়

প্রশান্ত মিত্র

জানি না মুখোমুখি দেখা হয় কি না,
হবে কি না।

শাপভ্রষ্ট দেবশিশুর মতো
আজকেব 'স্বকীয়' জীবনেব মেলায়
সম্ভ্রান্ততা নিয়ে—
সর্বজনেব কাবণে কর্ম যেখানে তোমাব
'স্বার্থ' হয়ে উঠেছিল।

সম্ভাবনা শেষ বিন্দু স্পর্শ কবে না কেন ?

অনেককেই না পেযে
শেষ পর্যন্ত তোমার দেখা পেলাম।
আর পাশে টেনে নিলে—
সূর্যে আলোকিত হতে গোত্রবিচার নেই।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিন্তু তুমি আমাব অগ্রজ,
আয়ু থাকলে প্রথম জীবনেব অভিভাবককে
হারাতেই হয়,
কিন্তু শেষ জীবনের বয়ঃকনিষ্ঠ
অভিভাবককেও হারাতে হবে—
ভাবিনি ,
জীবন বড়ো নতুন-নতুন ক'বে ভাবায।

আত্মজীবনে কোথায যেন চিড ধ'বে গেল !

দীপেন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জি

পরিশিষ্টের সংযোজন

রচনাপঞ্জির পরিশিষ্টে দীপেন্দ্রনাথের এমন কয়েকটি রচনার উল্লেখ করা হয়েছিল যেগুলির প্রকৃত শিরোনাম ও প্রকাশ তারিখ এখন জানা যায় নি। সেগুলোর ভেতর কয়েকটির ও কিছু নতুন রচনার প্রকাশ-তথ্য রচনাপঞ্জি-অংশ ছাপা হয়ে যাওয়ার পর সংগ্রহ করতে পেরেছি।

মালবিকা চট্টোপাধ্যায়

১৩৭৭ [১৯৭০]

শ্লোক। 'সুকান্ত স্মৃতি', ১৫ জুলাই, ৩০ শ্রাবণ

১৩৮০ [১৯৭৩-৭৪]

শোক মিছিল। গল্প, পরিচয়, শারদীয় ১৩৮০, ১৯৭৩

১৩৮৪ [১৯৭৭]

বিবাহ বার্ষিকী। উপন্যাস, কালান্তর, শারদীয়

১৩৮৫ [১৯৭৮]

প্রিয়েরে দেবতা করি। সাপ্তাহিক ঘরোয়া, ১৪, ২১, ২৮ এপ্রিল ও ২২ মে
গোরাঃ তমিজ বাংলা উপন্যাসের মুক্তি। পশ্চিমবঙ্গ ১৯ মে, ৪ জ্যৈষ্ঠ
চার্লি চ্যাপলিন ও কুমারসম্ভব কাব্য। সাপ্তাহিক ঘরোয়া, ২৬ মে
সুকুমারী গোলাপের কথা। সাপ্তাহিক ঘরোয়া, ১৬ ও ২৩ জুন,
৭ ও ১৪ জুলাই

দীপেন্দ্রনাথের স্মরণে

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতা শহরে, ১৯৩৩ সালের ১০ই নভেম্বর। পাঁচ ভাই, তিন বোনের পরিবারে তিনি ছিলেন চতুর্থ।

তাঁর শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের বেশির ভাগ সময়টাই কেটেছে উত্তর কলকাতায়, বা আরো বিশেষভাবে বলতে গেলে শিয়ালদহ-বৌবাজার এলাকার মধ্য কলকাতায়। শিয়ালদহের কাছে তাঁদের পারিবারিক বসবাস ছিল দীর্ঘকাল—১৯৫৭ পর্যন্তও। তখন দীপেন্দ্রনাথ পঞ্চম বর্ষের ছাত্র। তারপর তাঁরা নিউ আলিপুরে নিজেদের বাড়িতে উঠে যান।

অবশ্য কলেজে ঢোকার পর থেকে শুধু এই অঞ্চলটুকুই নয়, সারা কলকাতা শহরই চষে বেড়াতেন তিনি—কখনো ছাত্র-আন্দোলনের সূত্রে, কখনো-বা নিতান্তই সাহিত্যিক আড্ডার টানে। ফলে তাঁর বিভিন্ন গল্পে ও উপন্যাসে কলকাতা শহর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। প্রথম দিকের কিছু রচনা বাদে এই কলকাতাই ছিল তাঁর গল্প-উপন্যাসের পটভূমি।

অবশ্য তাঁদের পিতৃপুরুষের বাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। সেদিক থেকে এই আজন্ম নাগরিক লেখকের একটি শিকড় পূর্ববাংলায়। দেশে অবশ্য তিনি খুব একটা যান নি। একবার গিয়েছিলেন, খুব ছোটবেলায়, পরিবারের লোকজনের সঙ্গে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করার পরও গিয়েছিলেন। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। আরো একবার ১৯৭২ সালে, বাংলাদেশ তখন স্বাধীন।

পূর্ববাংলার সঙ্গে এই যোগসূত্র নিয়ে কখনো ভাবাবেগ প্রকাশ করেন নি দীপেন্দ্রনাথ। কিন্তু, বোঝা যায়, এই সময়েই পূর্ববাংলার প্রকৃতি ও সেই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আগামী' যখন তিনি লেখেন, তখন তাঁর বয়স ১৮। এই উপন্যাসে তিনি পূর্ববাংলার অনতিনির্দিষ্ট স্থানকে তাঁর ঘটনাস্থল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। দেশ-বিভাগের যে-যন্ত্রণা তাঁর লেখকজীবনের সূত্রপাতের সমসাময়িক ঘটনা, তাকেই তিনি রূপ দিয়েছিলেন খেয়া-পারাপারকারী বোবা মাঝির রূপকে।

১৯৫৪ সালের পুজো সংখ্যা 'নতুন সাহিত্যে' তাঁর 'ভাসান' গল্পটি বেরোয়। এই 'ভাসানে'-এ পূর্ববাংলার মানুষ আর প্রকৃতি অনেক বেশি প্রত্যক্ষ।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, যদিও তিনি কোনোদিনই কলকাতা শহরের বাইরে দীর্ঘকাল বসবাস করেন নি, কিন্তু 'আগামী' ও 'ভাসান' দুটিতেই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে দেখাতে পেরেছেন অসামান্য দক্ষতা।

দীপেন্দ্রনাথের স্কুল-জীবন শুরু হয় কলকাতায় সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে। বাল্যে মেরুদণ্ডের গুরুতর পীড়ায় তাঁকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল দেড়-দু-বছর। তারপর তিনি দেওঘরে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে যান পড়তে। বিদ্যাপীঠে দীপেন্দ্রনাথ নানারকম সাংস্কৃতিক কাজে অংশ নিতেন ও উঁচু ক্লাসে নেতৃত্ব দিতেন। কিশোর দীপেন্দ্রনাথ এই বিদ্যাপীঠেই একটি হাতে-লেখা দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। বলা যায়, দীপেন্দ্রনাথের সম্পাদনা কর্মের এখানেই হাতে খড়ি। বিদ্যাপীঠের সন্ন্যাসীগণ দীপেন্দ্রনাথকে তাঁর সাহিত্যকর্মেও নিয়ত উৎসাহ দিতেন। স্বামীজিদের কারো কারো প্রভাব তাঁর জীবনে বেশ গভীর ভাবেই পড়েছিল। তাঁদের মধ্যে পানু মহারাজের নাম তিনি প্রায়ই করতেন। ধার্মিক ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে স্বামীজিদের সংস্পর্শে কিছুটা আধ্যাত্মিকতার দিকেও ঝুঁকেছিলেন। তখনকার অনেক স্বামীজি পরেও দীপেন্দ্রনাথের খোঁজ-খবর রাখতেন—এখন তিনি নাস্তিক ও মার্কসবাদী জানা সত্ত্বেও।

দীপেন্দ্রনাথের পরিবারে রাজনীতির পরিবেশ ছিল। পিতামহ বৈকুণ্ঠনাথ স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। পিতা ধীরেন্দ্রনাথ দেশবন্ধুর নেতৃত্বে রাজনীতি করেছেন। তাঁদের পরিবারের অনেকে পরে ও এখনো রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন ও আছেন।

দেওঘরে থাকার সময়ই ছাত্রাবস্থায় দীপেন্দ্রনাথের প্রথম রচনা বেরোয় তখনকার দৈনিক 'কিশোর'-এ। আর তারপর, বোধহয় বছরখানেক বাদেই বেরোয় তাঁর প্রথম বই 'আগামী'—অন্নদাশঙ্কর রায় তার ভূমিকা লিখেছিলেন।

•

ভালো রেজাল্ট করে ১৯৫২ সালে স্কুল ফাইনাল পাশের পর দীপেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কলেজ জীবনের প্রথম দিকে সাহিত্যই ছিল তাঁর প্রধান ব্রত। কিন্তু তখনই তাঁর সাহিত্যে এসে যুক্ত হয়েছে প্রখর সমাজবাস্তবতাবোধ। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে একটি ছাপানো সাময়িকপত্রও প্রকাশ করেন। সেই সাময়িকপত্রের একটি-দুটি সংখ্যাই বেরিয়েছিল, কিন্তু সাংবাদিক-রচনায় দীপেন্দ্রনাথের ক্ষমতার পরিচয় তাতে পাওয়া যায়।

সাহিত্যিক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গে দীপেন্দ্রনাথের খানিকটা পারিবারিক পরিচয়। তাঁরই সস্নেহ আনুকূল্যে দীপেন্দ্রনাথ বৃহত্তর সাহিত্যিক পরিবেশে পরিচিত হন। তিনি তাঁর প্রকাশনালয় 'মিত্রালয়' থেকে দীপেন্দ্রনাথের 'কাছের মানুষ', 'তৃতীয় ভুবন' ও 'চর্যাপদের হরিণী' এই তিনটি বই প্রকাশ করেন।

এ ছাড়া, সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন দীপেন্দ্রনাথকে বিশেষ স্নেহ করতেন। রমেশচন্দ্রর বাড়িতে সাহিত্য সেবক সমিতির নিয়মিত অধিবেশন হত। দীপেন্দ্রনাথ তাঁর কম বয়স সত্ত্বেও এই সমিতির অধিবেশনে নিয়মিত যেতেন, আলোচনায় অংশ নিতেন ও গল্প পাঠ করতেন। কাছের মানুষ গল্পটি তিনি এখানে প্রথম পড়েছিলেন।

'নতুন সাহিত্য' মাসিক পত্রের সঙ্গে দীপেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। শিশু ও কিশোর সাহিত্যের বাইরে তাঁর গল্প প্রথম 'নতুন সাহিত্য'-তেই প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই পত্রিকার সম্পাদক অনিলকুমার সিংহ তাঁকে সস্নেহ যত্নে লালন করতেন।

১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গ সফরে যে সাহিত্যিক প্রতিনিধিদল গিয়েছিলেন তাতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন, দীপেন্দ্রনাথও ছিলেন। মনে হয় এই সময়েই সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর মাধ্যমে দীপেন্দ্রনাথ 'পরিচয়'-এর সঙ্গে যুক্ত হন। এই পূর্ববঙ্গ সফরের বিবরণ দিয়েই 'পরিচয়'-এ তাঁর লেখা শুরু। এই সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও ননী ভৌমিক দীপেন্দ্রনাথকে প্রশ্রয়ই দিয়েছেন শুধু তাই নয়,

বস্তুত দীপেন্দ্রনাথের গল্পরচনায় ননী ভৌমিকের ও জীবনচর্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা ও প্রভাব কার্যকর ছিল।

সাহিত্য ও রাজনীতির এই পরিবেশের মধ্যেই দীপেন্দ্রনাথের কলেজ-জীবনের প্রথম দু বছর কাটে। ১৯৫৪ সালে তিনি আই-এ পাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভর্তি করতে প্রত্যাখ্যান করেন। সেই বছরই স্কটিশ চার্চ কলেজে বাংলা অনার্স সহ বি-এ ক্লাসে ভর্তি হন। তখনই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে অত্যন্ত গভীরভাবে যুক্ত হন এবং ছাত্র সংগঠন গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন।

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ দীপেন্দ্রনাথের জীবনে এক অত্যন্ত, বলা যায় প্রায় সবচেয়ে, মূল্যবান অভিজ্ঞতা। এই সদস্যপদ তাঁর কাছে ছিল—পৃথিবীর সব দেশের মেহনতী মানুষের সঙ্গে মৈত্রীর প্রতীক, আন্তর্জাতিকতাবাদের উত্তরাধিকারের রূপক, আর তাঁর নিজের কর্ম ও জীবনের সমন্বয়ের প্রধান সূত্রটির সংকেত।

দীপেন্দ্রনাথের রাজনীতি-সচেতন পরিবারে একমাত্র তিনিই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তাঁদের পরিবারে প্রাদেশিক কংগ্রেসের অনেক গুরুত্ব-পূর্ণ নেতাও ছিলেন। মতাদর্শের এই বিরোধ তাঁর ছাত্রজীবনে যেমন ছিল, তেমনি ছিল তাঁর কর্মমুখর যৌবনেও। ছাত্রজীবনে পরিবারের সস্নেহ প্রশ্রয় যেমন হয়ত তাঁকে পাশ কাটিয়ে গেছে তেমনি আবার দীপেন্দ্রনাথকে তাঁর অবস্থার মূল্য হিসেবে দুঃখব্রতও গ্রহণ করতে হয়েছে বারবার। যে-রাজনীতি ছিল দীপেন্দ্রনাথের জীবন ও বিশ্বই, তাতে তাঁর বৃহত্তর পারিবারিক পরিবেশের সমর্থন ছিল না।

স্কটিশচার্চ কলেজে, দীপেন্দ্রনাথের জীবনের আরো একটি প্রধান ঘটনা ঘটে। তাঁর সহপাঠিনী শ্রীমতী চিন্ময়ীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়। ১৯৫৯ সালে তাঁদের বিবাহ। তাঁদের দুজনকেই প্রবল বাধা পেরিয়ে পরস্পরের কাছে আসতে হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিজীবনের এই প্রেম ও দাম্পত্য তাঁকে মানবসম্পর্কের এক অমলিন উৎসের সঙ্গে গ্রথিত রেখেছে। তাঁর গল্প-উপন্যাসেও ঘটেছে তার ছায়াসম্পাত। কোনো বিশেষ গল্প বা উপন্যাসের উদাহরণ হয়তো এখানে অবান্তর, কিন্তু কথাসাহিত্যিক হিসেবে দীপেন্দ্রনাথ তাঁর বস্তুবিশ্বে প্রবেশ করেন তাঁর ব্যক্তিবিশ্বের এই একান্ত অন্তরপথ দিয়েই।

বি-এ ক্লাশ দীপেন্দ্রনাথের কেটেছে উত্তাল রাজনীতিতে ও সাহিত্যে, ছাত্র আন্দোলনে ও সংগঠনে, পরে, যুব আন্দোলনে, বিভিন্ন যুব উৎসবের সাহিত্য-সংক্রান্ত অধিবেশনের সংগঠনে। পঞ্চাশের দশকে বামপন্থী রাজনীতিতে চঞ্চল পশ্চিমবাংলায় রাজনীতি আর সাহিত্য এইভাবেই তাঁর ব্যক্তিত্বে ও কর্মে মিলেমিশে গেছে। এই সময়ে লেখা তাঁর গল্পগুলির ভেতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'ভাসান' ও 'মুহূর্ত'। স্কটিশচার্চ কলেজে তাঁর ছাত্রজীবনের আলেখ্য পাওয়া যায় ১৯৫৭ সালে লেখা 'তৃতীয় ভুবন' উপন্যাসে।

১৯৫৬ সালে দীপেন্দ্রনাথ বি-এ পাশ করেন ও বাংলা এম-এ ক্লাসে ভর্তি হন।

স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র আন্দোলনের ধারাতেই বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি ছাত্র আন্দোলনের নেতা ছিলেন। তাঁর দু-বছরের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি ছাত্র-সংসদের সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা 'একতা'-র সম্পাদক হয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনও ছিল প্রধানত ছাত্র-আন্দোলন ও কলকাতাকেন্দ্রিক। পশ্চিমবাংলার ছাত্র-আন্দোলনে তখন দীপেন্দ্রনাথের স্থান ছিল বেশ উঁচুতে।

বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত, সাহিত্য-আন্দোলন ও রাজনীতি সব দিক থেকেই সহযাত্রী দেবেশ রায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রপাত। ১৯৫৬-৫৭ সালে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প নিয়ে যে আত্মসচেতনতার আন্দোলন শুরু হয়, দীপেন্দ্রনাথ তাঁর কমিউনিস্ট প্রত্যয় নিয়ে তাকে নিছক প্রকরণের চর্চা থেকে উত্তীর্ণ করে বিষয়-অন্বেষণের গতিমুখে স্থাপন করেন। এই সময়কার লেখা গল্পগুলো পড়লে দেখা যায়, দীপেন্দ্রনাথের গল্পগুলো কিভাবে সমগ্র আন্দোলনের দিকদর্শনের কাজ করেছিল। 'ছোটগল্প: নতুন রীতি' নামে একটি অনিয়মিত কাগজ কিছুদিন বেরিয়েছিল বলে এই আন্দোলনকে 'ছোটগল্প—নতুন রীতি' নামেও চিহ্নিত করা হয়।

১৯৫৬ থেকে ৬২ এই মাত্র ছটি বছর দীপেন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের সবচেয়ে উর্বর সময়। এই সময়ের ভেতর বেরিয়েছে গ্রন্থাকারে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'তৃতীয় ভুবন' এবং 'ঘাম', 'নরকের প্রহরী', 'চর্যাপদের

হরিণী', 'জটায়ু', 'অশ্বমেধের ঘোড়া', 'স্বয়ম্বর সভা', 'ফুল ফোটার গল্প', 'উৎসর্গ', 'পরিপ্রেক্ষিত'—এই অবিস্মরণীয় গল্পগুলি।

৬৩ সালে দীপেন্দ্রনাথের কন্যা মৃত্তিকার জন্ম। সেই সময় তিনি তাঁদের পারিবারিক বাড়ি ছেড়ে মনোহর পুকুর রোডে একটি একতলা ভাড়া বাড়িতে উঠে আসেন। এই বাড়িতে কিছুদিন বাসের পর দীপেন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই পূর্ণ-যৌবনে যখন দীপেন্দ্রনাথ তাঁর জীবন ও কর্মের এক আস্থাবান বোধে দৃঢ় ও ভবিষ্যৎ-কর্মে প্রস্তুত, সেই সময় চীনের ভারত আক্রমণ ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাঙন দীপেন্দ্রনাথকে বিধ্বস্ত করে দেয়। তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পরও দীর্ঘদিন তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকতে হয়। সুস্থতার পর আবার তিনি পারিবারিক বাস ছেড়ে নিজের আলাদা বাড়ি ভাড়া করেন। এরই মধ্যে মাত্র একমাস তিনি সাপ্তাহিক বসুমতীতে চাকরি করেছিলেন।

৬২ সালের পর আর তিনি মাত্র দু-বার দুটি গল্প লিখেছেন। ৬৭-তে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ার পরে, রাষ্ট্রশক্তির প্রতি-হিংসার বিরুদ্ধে বামপন্থী গণ-জাগরণের —ঙ্গ মুহূর্তে: 'হওয়া না-হওয়া'। আর ১৯৭৩-এ পশ্চিমবাংলার বামপন্থী, বিশেষত কমিউনিস্ট আন্দোলনের জিঘাংসু আত্মহত্যার পরাজয় মুহূর্তে: 'শোক মিছিল'। দীপেন্দ্রনাথ এর পর আর একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, ১৯৭৭-এর শারদীয় 'কালান্তর'-এ—'বিবাহবার্ষিকী'। দীপেন্দ্রনাথের শেষ রচনা ১৯৭৮-এর শারদীয় 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত 'পাড়ি'—শম্ভু মিত্র-র 'চাঁদ বনিকের পালা' পাঠ নিয়ে লেখা।

এখন, দীপেন্দ্রনাথের জীবনের অবসানে যেন ছক কেটে বলা যায়, তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির সবচেয়ে উর্বর কালের শেষেই সাহিত্য-জগতে তাঁর অন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার শুরু, সম্পাদক-হিসেবে।

'পরিচয়' মাসিকপত্রের সঙ্গে যোগ তাঁর কলেজ-জীবন থেকেই। 'পরিচয়'-এর কর্মী হিসেবে তিনি সক্রিয় হন ১৯৫৯ সাল থেকে। সেই সময় থেকেই তিনি 'পরিচয়'-এর অন্যতম সহ-সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে সাময়িক অসুস্থতার ফলে কিছুদিন তাঁর সঙ্গে বাইরের সম্পর্ক বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু যে মহাকাব্যিক মানবিক বীরত্বে দীপেন্দ্রনাথ তাঁর শারীরিক বাধা অতিক্রম করেছিলেন, তারই জোরে দীপেন্দ্রনাথ তাঁর মানসিক বাধাও

সামলে ওঠেন। ১৯৬৮-তে আর শুধু সহ-সম্পাদক নন, 'পরিচয়'-এর সম্পাদনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সম্পাদনাকর্মে দীপেন্দ্রনাথ বাংলা-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পাদকদের সঙ্গে তুলনীয়। এ-বিষয়ে উপেন্দ্রনাথ-রামানন্দ তাঁর পূর্বসূরী। পাঠক ও লেখকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগস্থাপনে, প্রেরিত বা আমন্ত্রিত প্রতিটি লেখার নিখুঁত সম্পাদনায়, প্রতিটি প্রুফ সংশোধনে, নতুন লেখকদের দিয়ে লেখানো ও পুরনো লেখকদের অবিরল অনুরোধ জ্ঞাপনে তিনি নিজেকে বাংলা-সাহিত্যের আদর্শ সম্পাদকে পরিণত করেছিলেন।

কিন্তু কর্মের সেই চূড়ান্ত নিপুণতার সঙ্গে মিশে ছিল সাহিত্য স্রষ্টার দূরবিস্তারী কল্পনা। ইতিহাসবোধ ও সাহস নিয়ে তিনি 'পরিচয়'-এর একেকটি বিশেষ সংখ্যার পরিকল্পনা করতেন এবং তাকে রূপায়িতও করতেন।

দীপেন্দ্রনাথের সম্পাদনা-কর্মের আরেক উদাহরণ শারদীয় 'কালান্তর'। বেশ কয়েক বছর তিনি 'কালান্তর' শারদীয় সংখ্যার সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদনায় এই পত্রিকাটির উৎকর্ষ দলমতনির্বিশেষ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

এই সম্পাদনাকর্মের সঙ্গেই দীপেন্দ্রনাথ যুক্ত করেছিলেন সাংবাদিকতাকে। 'কালান্তর' পত্রিকার সঙ্গে তিনি প্রথম থেকেই জড়িত। এই কাগজে তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত রিপোর্টাজ প্রকাশিত হয়। ১৯৬৭-র নির্বাচনের পর, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিলের পর, ১৯৬৯-র নির্বাচনের আগে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে—তাঁর রিপোর্টাজ ও ফিচার রচনা 'কালান্তর'-এ নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে, পাঠককে আলোড়িতও করেছে। সাপ্তাহিক 'কালান্তর'-এ 'ঘোড়েওয়ালাবাবু' নামে এক দীর্ঘ রচনা বেরিয়েছিল, তারপর পুরুলিয়ার খরা নিয়ে একটি রিপোর্টাজ এবং তারপর 'নো পাসারন'। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি লেখার নাম মাত্র উল্লেখ করা যায়। মনে হয়, ১৯৬৭ থেকে ৭৬ এই ন-বছরই দীপেন্দ্রনাথের সাংবাদিক রচনার সবচেয়ে ফলপ্রসূ সময়।

সাহিত্যিক-সংগঠক হিসেবে দীপেন্দ্রনাথের তুলনাহীন ভূমিকা আরো জানা গিয়েছিল ১৯৭১-এর বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময়। বাঙলাদেশ সহায়ক লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সমিতি গড়ে ওঠে তাঁরই প্রধান উদ্যোগে। তিনিই ছিলেন ঐ সমিতির অন্যতম সম্পাদক। তারপর গয়ায় ন্যাশনাল ফেডারেশন অব প্রগ্রেসিভ রাইটার্স বা আরো পরে কলকাতায় প্রগতি লেখক সংঘের

পুনরুজ্জীবনে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। ১৯৭১-এ একবার সোভিয়েত ইউনিয়নে ও ১৯৭৪-এ একবার লেবাননে তিনি গিয়েছিলেন বিশ্বব্যাপী প্রগতি লেখক আন্দোলনের সূত্রেই।

দীপেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের ব্যাপকতা বিস্ময়কর। একদিকে শিল্প-সাহিত্যের বিচারে ও চর্চায় তিনি ছিলেন প্রায় শুদ্ধতার পূজারী—ক্লাসিকাল আদর্শে স্থির। টলস্টয়ের কথা বারবার বলতেন বন্ধুদের। নিজে প্রবলভাবে অনুরাগী ছিলেন ভারতীয় রাগসংগীতের। শব্দের শুদ্ধতার সন্ধানে সদাসতর্ক। প্রকরণের পরীক্ষায়-নিরীক্ষায় চিরউৎসাহী। শিল্প-সাহিত্যে অন্ধত্ব বা একদেশদর্শিতার প্রবলতম বিরোধী।

অন্যদিকে সেই দীপেন্দ্রনাথই ছিলেন সক্রিয় কমিউনিস্টকর্মী, শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন। কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর প্রায় ২৫ বছরের সদস্য-জীবনে তিনি সদা-সর্বদাই ছিলেন শৃঙ্খলা, আনুগত্য, ত্যাগ ও কর্মের উদাহরণ।

আবার এই দুয়ের মিলই হয়তো নিহিত তাঁর সেই ক্লাসিক জীবনাদর্শে, যার চিরন্তন আধার ছিলেন তাঁর কাছে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। লেনিন শতবর্ষে 'লেনিন-শতাব্দী' নামে একটি কবিতা-সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন দীপেন্দ্রনাথ। তার ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—'আগামী শতাব্দীতে মানুষ গ্রহান্তরে লেনিন জন্মজয়ন্তী পালন করবে।'

এই প্রত্যয়েই দীপেন্দ্রনাথের ৪৫ বছরের জীবনের অবসান ঘটেছে গত ১৪ই জানুয়ারি।

পশ্চিমবঙ্গের কবি-লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের আহূত দীপেন্দ্রনাথের স্মরণসভায়—শিশির মঞ্চ, ২২ জানুয়ারি, ১৯৭৯—পঠিত জীবনালেখ্যটি 'পরিচয়'-এর কর্মীরা প্রস্তুত করেন, অতিদ্রুত, প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।

এটি তারই কিছুটা বর্ধিত, কিছুটা সংক্ষিপ্ত রূপ।

দীপেন

সুশোভন সরকার

দীপেনেব সঙ্গে আমাব প্রথম যোগাযোগ তাব ছাত্রাবস্থায়, প্রেসিডেন্সি কলেজে। কি একটা ব্যাপাবে একটি ঘবোয়া বৈঠক বসেছিল, পবিচালনাব ভাব পড়েছিল আমাব উপব। খর্বাকৃতি মানুষটি বলতে উঠল, তার শাবীরিক বৈকল্য সুস্পষ্ট, কিন্তু অদ্ভুত লাগল তার দৃপ্ত আত্মপ্রত্যয়। বলিষ্ঠ স্ববে সে বলতে লাগল আব তাব বক্তব্য পেল তুমুল হর্ষধ্বনি। সেদিন নিঃসন্দেহে সে-ই ছিল শ্রেষ্ঠ বক্তা। আমি বুঝলাম ছেলেটি এক আগুনেব হল্‌কা।

এব ক-দিন পব ইতিহাস সেমিনাব ঘবে দীপেনদেব অনুবোধে বসল আব এক বৈঠক। আমি তাতে মার্ক্স-তত্ত্বেব কিছু কিছু জটিলতা বোঝাবার চেষ্টা কবছিলাম। সেদিন দেখলাম দীপেনেব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল। তাব প্রতি আমাব শ্রদ্ধা আবও বাড়ল।

ষাটেব দশকেব গোড়ার দিকে জনশিক্ষা পবিষদেব পব পর দুই অধিবেশনে আলোচিত হয় বাংলা গল্পে 'নূতন বীতি'ব প্রবর্তন। ইতিমধ্যে দীপেন বাংলা সাহিত্যে একটা তোলপাড় এনেছে। অধিবেশনে প্রথমে অশোক রুদ্র তীব্রভাবে আক্রমণ করে নূতন বীতিকে, তার মতে দীপেনই হল প্রধান আসামী। বোধহয় দ্বিতীয় দিনে দীপেন উত্তব দেয় অসাধারণ দীপ্তির সঙ্গে। আমি সব ব্যাপারটা ঠিক বুঝতাম না, তাব সব যুক্তিও আমাব অকাট্য মনে হয় নি, কিন্তু মুগ্ধ করেছিল তাব তেজস্বী ভঙ্গি, তাব অকপট আত্মবিশ্বাস, তার দৃঢ় তেজ। মনে হচ্ছে এই বাদানুবাদ পবিচয় পত্রিকায়

প্রকাশিত হয়েছিল। বন্ধুবর হিরণকুমার সান্যাল (দীপেনের অন্তরঙ্গ হাবুলদা) তার এক মজার কবিতায় দীপেনকে এই বিতর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইতিমধ্যে দীপেন কমিউনিস্ট কর্মী হয়েছে, পরিচয়-গোষ্ঠির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। আমার সঙ্গে তার অনেকবার মতান্তর ঘটল, কিন্তু মতান্তর কখনই মনান্তরে পরিণত হয় নি তারই গুণে। রাশিয়া হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ করার সময় দীপেনের মনে হয়েছিল শান্তিকামী রুশদেশের পক্ষে কাজটা অন্যায়। আমি তখন তাকে বুঝিয়েছিলাম যে বিপ্লব বিশ্বশান্তি ইত্যাদির পথে সরল সহজ রাস্তা নেই, এগোতে হয় বাঁকা পথে মোড় ঘুরতে ঘুরতে। বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে হলে আণবিক সমশক্তি অর্জন করাই ছিল সেদিন প্রাথমিক কর্তব্য। এর পর দীপেন সোভিয়েতের প্রচণ্ড সমর্থক হয়ে ওঠে। ১৯৬৮ সালে আমি যখন চেকোস্লোভাকিয়ায় রুশ সামরিক হস্তক্ষেপের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করি তখন দীপেন অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিল, তখন সে পরিচয়ের সম্পাদকমণ্ডলীতে, বোধহয় যুগ্ম-সম্পাদক। পরিচয় পত্রিকায় আমাকে আক্রমণ করা হয়। আমি তার উত্তর পাঠাবার আগে গিরিজাপতিবাবুর বাড়িতে পরিচালকমণ্ডলী ও অন্যান্য বন্ধুদের এক সভার আয়োজন করেছিলাম। মনে হয় দীপেন এতই মর্মাহত হয়েছিল যে সেদিন সে নিজে এল না, এল সহ-সম্পাদক তরুণ সান্যাল। আমার প্রবন্ধ পরিচয়ে প্রকাশিত হয়, সম্ভবত প্রকাশ না করলে অত্যন্ত বিসদৃশ হবে, আমি পরিচালকদের অন্যতম। দীপেন নিশ্চয় পরে আমাকে ক্ষমা করেছিল।

পরিচয়ের নীতি নিয়ে এর আগেই অনেক আলোচনা সভা বসে—অফিসের সংলগ্ন বিশাল হল ঘরে, পার্টি অফিসেও। আমি বারবার আমার মত প্রচার করি। প্রগতির স্রোতে নানা ধারা আছে, নেই সম্মিলিত একমুখীন ধারা। প্রগতিশীল পরিচয়ের কাজই হল বিভিন্ন ধারাকে অনেকটা স্বাধীনতা দিয়ে এগোন, প্রগতির ভূমিকা তাতেই সার্থক হয়, বিভিন্ন ধারাকে একমুখীন করে তোলার কাজ সফল হয়ে ওঠে এই পথেই, ছক-বাঁধা পদ্ধতিতে নয়। মনে হয় প্রথমে দীপেনের খানিকটা দ্বিধা-সংকোচ ছিল এই ভাবে এগোবার পথে। কিন্তু এ-ও জানি পরিশেষে সে এটাই সিদ্ধির পথ বলে বোঝে, এবং এ-পথের দৃঢ় সমর্থক হয়ে ওঠে। তার প্রমাণ পরিচয়ের গত কয়েক বছরের সংখ্যার পর সংখ্যায়।

দীপেন ছিল অত্যন্ত অসুস্থ, দিন দিন বাড়ছিল তার শরীরের যন্ত্রণা। এর মধ্যে সে যে কি করে চলাফেরা করত, আমার আশ্চর্য মনে হয়। কি অসম্ভব মনের বল, কি আশ্চর্য সহ্যশক্তি! হিরণকুমার সান্যাল তার সম্বন্ধে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল, কতবার আমাকে বলেছে এত লোককে বিদেশে পাঠানো হয়, রুগ্ন দেশে চিকিৎসার জন্য যায়, কিন্তু দীপেনের দিকে কেউ ফিরে তাকায় না, কারণ সে অভিমানী, কারো কাছে সে কিছু প্রার্থনা করার পাত্র নয়। একেবারে শেষে বন্ধু আশীষ বর্মন চেষ্টা করছিল চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশ পাঠাবার, কিন্তু কিছু ব্যবস্থা করে ওঠার আগেই সে চলে গেল।

দীপেন আমাদের মধ্যে যে-ফাঁক রেখে গেল সে কি কোনও দিন পূর্ণ হবে? অসাধারণ এক প্রতিভাদৃপ্ত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব শূন্যে মিলিয়ে গেল।

দ্বিতীয় কিশোর

ননী ভৌমিক

কী লিখব? যাবা চলে গেল, আমরা, দেবেশের ভাষায় যাবা 'বেঁচে-বর্তে' আছি, কী লিখতে পারি তাদের সম্পর্কে। বটুকদা, হাবুলদা, বিজনকে নিয়ে অমন অমূল্য একটা সংখ্যা বাব কবার পর যে ছেলেটা নিজেই চলে গেল তাদের পেছু পেছু, দাড়ি বাখলেও আমি তাকে কিশোর ছাড়া অন্য কোনো মূর্তিতে ভাবতে পাবি না—প্রথম যেমন তাকে দেখেছিলাম। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যাযের মুদ্রিত প্রশংসাসহ তার সম্ভবত প্রথম বিদিকিচ্ছিবি ছাপা বইখানা নিয়ে এসেছিল 'পরিচয়'-এর দপ্তবে—কত তখন তার বয়স—পনেবো, ষোলো? আমায় সে আচ্ছন্ন কবেছিল। শুধু এইজন্য নয় যে তার লেখা আমায় ভাবিযেছিল, সব মিলিয়ে। কিশোব বলতে আমি সর্বাগ্রে স্মবণ করি সুকান্তকে, তার মৃত্যুব কিছু আগে আমবা ছিলাম একই হাসপাতালে (কমিউনিস্ট পার্টিব নিজস্ব উদ্যোগ, সামান্য) পাশাপাশি শয্যায়, দ্বিতীয় কিশোর দীপেনকে আমি শেষবার দেখতে পেলাম না। গত বছব গ্রীষ্মে দেশে গিয়েছিলাম, মায়েব অসুখ বলে কলকাতায থাকতে পারি নি, তবু দু-একদিনের যেটুকু ফাঁকা পেয়েছিলাম 'মনীষা' আব 'পরিচয়'-এ যেতে অন্যথা করি নি। দীপেন ছিল না।

সেই না-থাকাটা এমন চিবকালের হয়ে যাবে, কান্না পাচ্ছে, যদিও প্রৌঢ়, বলতে কি বৃদ্ধ।

দীপেনের সাহিত্যকৃতি নিয়ে আলোচনা করুক অন্যে, প্রধানত তরুণেরা,

হয়ত গোপালদাও কিছু বলবেন, আমি নিশ্চিত, তিনি দীপেনের গুণগ্রাহী, আমার কাছে মুখ ফসকে 'একদা' ফাঁস করেছিলেন। তবে আমি জানি, মস্কোয় বিদ্যার্থী বাঙলাদেশের কিছু ছাত্রছাত্রী দীপেনের লেখার বেশ অনুরাগী। কোথেকে ওদের কাছে পৌঁছেছিল ওর বই কে জানে। তবে ভালোবাসার তো সীমান্ত নেই।

মস্কোয় দীপেন এসেছিল সম্ভবত দু-বার। দু-বারই আমাদের সঙ্গে দেখা না করে সে যায় নি। আমার স্ত্রী, স্ভেৎলানা, আমি বলি শ্বেতা, তার আন্তরিক মর্মবেদনা জানাবার ভাষা পাচ্ছে না।

দীপেন আমার জন্য পরিচয়ে লিখেছিল আমি ওর জন্য পরিচয়ে লিখছি

সরলা বসু

দীপেন আমার জন্য পরিচয়ে লিখেছিল। আমিও ওর জন্য পরিচয়ে লিখছি—ওকে আমি অনেক দিন থেকে চিনি, আলাপ সাড়ে-তিন ঘণ্টার, তবু সে আমার সর্বহারা, শোকাতুর জীবনে, বোঝার পরে শাকের আঁটি হয়ে রইল। বহুকাল আগে ওর একটি গল্প আমি পড়েছিলাম, কোনো পত্রিকায়, হয়তো পরিচয়-ও হতে পারে, মনে নেই। অরুণাচলের কাছে জানতে চাইলাম লেখাটা কার, বেশ ভাল তো। ও উত্তর দিল 'ও একটা ছোট ছেলের।'

কিছুদিন পরে আমরা সবাই গেলাম রবীন্দ্র শত বার্ষিকীতে, পার্ক সার্কাস ময়দানে। দেখে শুনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অরুণাচল ওকে দেখিয়ে বলল, 'এই যে মা, তোমার সেই গল্প-লেখ ছেলেটা। ও হাসিমুখে নমস্কার করল।

কিন্তু ওকে আমি ভুলি নি। বহুদিন আমার সুকান্তকে হারিয়ে ফেলেছি। 'সুডৌল চাঁদের তনিমা, মদির বাতাস এল ঠাণ্ডা বট থির'—অরুণাচলের কবিতার একটু অংশ বিশেষ। এতদিন, বটের ছায়ায় ছিলাম। কিন্তু এই তিন বছর আগে ঠাণ্ডা বট মদির বাতাসেই উপড়ে পড়ে গেছে। জীবনের প্রথম বজ্রাঘাতে আমি বিধ্বস্ত হয়েও আমায় উঠে দাঁড়াতে হল। মৃত ছেলে অরুণাচলের একখানা কাব্যগ্রন্থ, আর একখানা 'সুকান্ত জীবন ও কাব্য' আর আমার অন্ধ চোখে প্রায় হাতড়ে লেখা শেষ রচনা একখানি উপন্যাস, অরুণাচলের মৃত্যুর কয়েকদিন আগে মাত্র শেষ হয়েছিল। ওর নতুন সংস্কৃতি সংস্থার

ছেলেমেয়েরা কেঁদে কেটে সবাই চলে গেল। আমি তখন খুঁজে বেড়াচ্ছি ওর স্মৃতির টুকরো যদি কার কাছে পাই আর বইগুলির যদি কিছু হয়। অবশ্য ওর মৃত্যুর দু-তিন দিন পরে অভাবনীয়ভাবে এক কাণ্ড হল। চোখে না-দেখা, কিন্তু অরুণাচলের মুখে যার কবিতা শুনে শুনে গল্প শুনে অত্যন্ত পরিচিত, সেই ছেলেটি এসে দাঁড়াল। সে অরুণাচলের বড় শ্রদ্ধার, বড় ভালবাসার সুভাষদা। সুভাষ ও ডাক্তারবাবু (ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী) যখন আমার বাড়িতে আসেন আমার চোখ জলে ভরে যায়। ভাবি আমার শিশুর মতো সরল, মাতৃভক্ত, হতভাগ্য ছেলেটি আজ বেঁচে থাকলে ওঁদের পেয়ে কি করত। দারিদ্র্য ব্যাঘ্রেই গ্রাস করল, আমার সুকান্ত— অরুণাচলকে। 'দারিদ্র্য-ব্যাঘ্র' অরুণাচলের কবিতার একটু।

এখন আমার দীপেনের কথায় আসা যাক। আমি তখন সবাইকে চিঠি লিখে চলেছি। শ্রীমান তরুণ সান্যালকে পরিচয়ের ঠিকানায় একখানা চিঠি দিলাম। তরুণকে চোখে না দেখলেও অরুণাচলের মধ্য দিয়ে চিনতাম। তরুণকে আসতে লিখলাম। আর দীপেনকেও। তরুণ অবশ্য আজও আসেন নি। দীপেন একখানি চিঠিতে কোনো একটি সাহিত্য সভার আমন্ত্রণ জানিয়ে সাড়া দিল। এই পর্যন্তই, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আমি একটি আশ্চর্য ঘটনায় মনে একটু স্বস্তি পেয়েছি। দিনরাত ছবি এঁকে চলেছি, কোনো দিনই আমি ছবি আঁকতে জানতাম না। আমার শিক্ষয়িত্রী জীবনে মাত্র একটি আপেল, একটি গেলাস এঁকে ড্রয়িং-এর কাজ সারতাম, তাও আবার অরুণাচলের কাছে শেখা। তবে আমি কোনো দুঃখ পেলে ও আমাকে বড় বড় লোকের ছবি দেখিয়ে শান্ত করত, ও নিজেও ছবি আঁকতে পারত। ওকে ওর উনপঞ্চাশ জন্ম তিথিতে ছবি আঁকতে বড় একটি খাতা আমি দিয়েছিলাম, সেই খাতাখানা আবার আমার হাতে ফিরে এল। সেই খাতাখানা ভরে অরুণাচল, সুকান্তর কবিতার পদগুলি এঁকে চলেছি। যে আসে আমার কাছে তাকেই ছবি দেখতে হয়, বং তুলিতেও আঁকছি। তার থেকে সুভাষও বাদ যায় নি। সবারই একটি মন্তব্য ছবি দেখে করতে হয়। বুদ্ধিমান সুভাষ 'এ তো আমি বুঝি না' বলে আমার হাত থেকে উদ্ধার পেল।

ঠিক এই সময়ে, শ্রাবণ মাস যেন হবে, হঠাৎ দেখি রিক্সা থেকে আমার কনিষ্ঠা কন্যা মহাশ্বেতা দীপেনকে নামিয়ে আনছে আর আমাকে ডাকছে 'মা, দীপেনদা এসেছেন'। ও দীপেনকে চিনত। আর আমাকে পায় কে। না

বসতে বলা। (অবশ্য আমার কন্যা ওকে বসিয়েছিল) আমি ছবি দেখাতে শুরু করে দিলাম। আমার ছবি দেখানোর আকুলতা দীপেনের অসহায়তার ব্যাকুলতা। ও না পেরে আমাকে বলল, 'এরও একটা ছবি নেব।' বুদ্ধি প্রখর ছেলেটি আমার এই বিভ্রান্ত অবস্থাটা বুঝে মহাশ্বেতাকে বলল, 'ভাই তুমি আমায় একটু সহায়তা কর।' তখন আমার কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল, বুঝলাম ও কোনো কাজে এসেছে। ও বলল, 'পরিচয়'-এ কোনোদিন উপন্যাস ছাপা হয় নি, এই সুকান্ত-বর্ষে আমার উপন্যাসের কিছুটা দেওয়া যায় কিনা। আমি উত্তর দিলাম 'তোমাদের 'পরিচয়' তো নীরস তরুবর'। দেখ আমার ছোট্ট নাতি অরুণাচলের পুত্র ঋতুরাজের নকল করা এলোমেলো লেখা প্রথম দু-খণ্ড 'জলপদ্ম', 'স্থলপদ্ম' উপন্যাসের সূচনাটুকু, উপনায়ক গাছুর কাহিনীর খানিকটা নেওয়া যেতে পারে।' ও বলল, 'ভুল আমি ঠিক করে নেব।' এখন নাম কি হবে আমার কাছে জানতে চাইল। আমি বলতে পারলাম না। ও বলল 'গাছুর পাঁচালী' নাম দিলে কেমন হয়?' আমি সম্মত হলাম। ও আমার লেখক জীবনের কিছু কিছু জেনে নিল। সেদিন ঘণ্টা দুই ও আমাদের কাছে ছিল। সেদিনকার আমার ছবি দেখানোর আকুলতা আর ওর অসহায়তার ব্যাকুলতা মনে করে কত দিন যে হেসেছি।

তারপর তো ও এলো পূজার মধ্যে 'পরিচয়'খানি নিয়ে সন্ধ্যাবেলা। আমি বললাম, 'বাবা, তুমি তো আমার উপন্যাস রুই মাছটার ল্যাজা কেটে বৌভাত করলে, এখন যে ওর পেট ভরা ডিমের বড়াও হবে, মস্ত মাথাটার মুড়িঘণ্টও হবে। ও হাসল। আমার বৌমা—অরুণাচলের স্ত্রী, আমার কন্যা মহাশ্বেতা, আমার মেজছেলে, আমি ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললাম, ও হাসিমুখে চলে গেল।

তখন তো জানি না এই ওর শেষ বিদায়। আমার হতভাগ্য জীবনে ছেলেটি যেন কত আপন, উজ্জ্বল হয়ে রইল।

তার পরের কথা সংক্ষিপ্ত। গত শ্রাবণ মাসে আমার শরীরটা বেশ অসুস্থ হয়ে উঠছে। আমি আমার বইগুলির বহু আবেদন-নিবেদন করেও কিছুই করতে পারলাম না। তখন ওকে ও সুভাষকে দু-খানা চিঠি দিলাম। লিখলাম বাবা, আমার বইগুলি থাকল। দীপেন উত্তর দিল তার নানারকম অসুখের কথা লিখে, আর আমার সঙ্গে তার দেখা করবার খুবই ইচ্ছা ছিল কিন্তু অসুখের জন্য পারছে না। তবু চেষ্টায় রইল। বইগুলি যেন গুছিয়ে রাখি, কখন কি হয়। আর লিখল সর্বনেশে একটি কথা, আমার জন্য ওর

খুবই কষ্ট হয়। আমি ওর চিঠির উত্তর দিলাম, বাবা তোমার যে অসুখগুলি ওই অসুখগুলিই আমার চিরকাল আছে, মাত্র দু-একটা নেই। তুমি ওষুধ খাও, সেরে যাবে।

যে ছেলেদের আমার জন্য কষ্ট হয়, তারা কি আমার কাছে থাকে! না আছে। আমি থাকি টেলিভিশনের টাওয়ারটার নিচে। আমার বামে টি বি. হাসপাতাল, গাছ-গাছালির মধ্যে সুকান্ত ওয়ার্ডে আমার বানার ঘুমিয়ে গেছে, চিঁড়ে-দৈটুকু আলমারিতে পড়ে আছে, ঘুম-ক্লান্তের খাওয়া হয় নি।

আমার ডাইনে ভাঙড় হাসপাতাল, ওখানেই গ্রাম-শ্যামল ছেলেটি কোন 'শ্যামল নীলে নীল দেশের' স্বপ্ন দেখতে দেখতে শ্রাবণের বৃষ্টি ধারায়, অপ্সরীর পায়ের টুপুর টুপুর নূপুরধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে গেছে।

আমার বয়স ছিয়াত্তর, চোখে দেখতে পাইনে, তাই তো আমার সঙ্গে দুষ্টুমি করে ওরা পালিয়ে যায়।

অবশেষে, আমার বুকের রক্তে, চোখের জলে লেখা শেষ রচনা অপ্রকাশিত 'কতোদিনের কতো ব্যথা' উপন্যাসখানি সুকান্ত-অরুণাচলের আত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলাম। আজ থাকল ওদের সঙ্গেই আমার দীপেনের নাম। যে-ছেলেটি আমার সৃষ্টির সূচনাটুকুকে মুক্তি দিয়ে পুত্রশোকাতুর মনে একটু স্বস্তি দিয়েছিল, তাকে ভুলব না। তার জন্য রইল জীবন-ক্লান্ত মায়ের বুকভরা হাহাকার।

সম্ভবত নিশ্চয়ই

সন্‌জীদা খাতুন

উনিশশো চুয়ান্ন সালে তাঁকে প্রথম দেখি। এদেশের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর ঢাকাতে সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল। একটি সুন্দর সম্মিলন উৎসব। সাংবাদিক হিসেবেই বুঝি এসেছিলেন তিনি। ফিরে গিয়ে 'নতুন সাহিত্যে' যে রিপোর্ট লিখেছিলেন—তা পড়ে হেসেছিলাম আমরা। ঢাকার রিক্সাওয়ালাও জীবনানন্দের কবিতা আওড়ায়—এ-ধরনের কথায় হাসব না-ই বা কেন! ওই উচ্ছ্বাসই তো খায়। বড্ড আশা বাড়িয়ে দেয়। আকাশে তুলে দিয়ে, তারপর ধুলায় ফেলে দেয় ধপ্ করে, আচমকা।

এই উচ্ছ্বাসের মরণে মরতে হয়েছে তাঁকে জীবনে কতবার!

আগে, তাঁকে কেমন করে জানলাম, সে কথা বলি।

'নতুন সাহিত্যে'ই তাঁর 'তৃতীয় ভুবন' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বড় সাহিত্যিক বলে স্থান দিয়েছিলাম মনে। তারপরে বহুদিন দেখাশোনা নেই। উনসত্তর সালে ঢাকায় ছেলেমেয়ে ফেলে রংপুরে চাকরি করতে গিয়ে, একাকিত্ব কাটাবার জন্যে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' পাঠাগারে গিয়ে পেলাম তাঁর বই 'চর্যাপদের হরিণী'। ফিরে জানাশোনা হল। তারপর একাত্তরের বিপর্যয়ের ঢেউয়ের মাথায় ভাসতে ভাসতে কলকাতায় পৌঁছে আবার দেখা। বললেন, 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'র পক্ষ থেকে তাঁরা ভাবছেন, একটি বাড়ি ভাড়া করে তাতে বুদ্ধিজীবীদের থাকবার ব্যবস্থা করবেন। সেখানে শিল্পীরা রিহার্স্যাল করে অনুষ্ঠানের জন্যে তৈরি হতে পারবেন—অনুষ্ঠান করে টাকা তোলা যাবে।

প্ল্যানটা শীগগির কার্যকর হওয়া দুষ্কর মনে হল বলে, তখনকার মতো একখানা রিহার্স্যালের জায়গা ঠিক করা স্থির হল। সেখানে সব শিল্পীদের জমা করতে পারলে অনুষ্ঠানের মহড়া শুরু করা যাবে। চিঠি লিখে খবর দিয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে-থাকা বিভ্রান্ত বাংলাদেশী শিল্পীদের জড়ো করলেন দীপেন। তৈরি হল আমাদের 'রূপান্তরের গান'। ক্রমে গড়ে উঠল 'মুক্তি-যোদ্ধা শিল্পী সংস্থা'—যাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে, শরণার্থী শিবিরে মানুষের মনোবল বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন, গান গেয়েছেন 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে', দিল্লীতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থাপন করেছেন বাংলাদেশের রূপান্তরের ইতিহাস।

উচ্ছ্বাসের মরণের কথা হচ্ছিল। একাত্তরের ঘটনার সঙ্গেও আছে সেই কাহিনী। সে-সময়টায় ওপারের রাজনীতি তাঁকে কোনো কথা বলবার আগে 'সম্ভবত নিশ্চয়ই' বলবার অবস্থায় ফেলেছিল—সে জানেন তাঁর বন্ধুরা—জানেন তাঁরাও, যাঁরা পড়েছেন তাঁর 'হওয়া না-হওয়া'। ওই অবস্থায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তাঁকে আবার 'নিশ্চয়' প্রতীতিতে বলিষ্ঠ করে তুলল।

কতবার বলেছেন—তারাশঙ্কর থেকে শুরু করে ডাউন টু দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়—কতদিন পর আবার সবরকমের লোক নিয়ে হতে পেরেছে 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'—ভাবুন তো একবার। এ সম্ভব হল কেবল বাংলাদেশের এই অনন্য সংগ্রামের দৃষ্টান্তে। এই রকমের বড় ব্যাপার হলে এমন মিলন সম্ভব হয়।

বাংলাদেশের সে-সংগ্রাম কতটা স্বাধীনতার জন্য, আর কতটা মার খেয়ে মরতে-মরতে মরিয়া হয়ে ফিরে-দাঁড়ানো সংগ্রাম—এ বিষয়ে আমার সংশয় ছিল। যারা মারছিল, তারা অবশ্য স্বাধীনতা দিয়ে ফেলবার ইচ্ছেয় নয়—মেরে শেষ করে দেবার জন্যেই মারছিল। আবার, স্বাধীনতার কথা যারা বলছিল, মার খাওয়ার পিছনে মহৎ আদর্শের দৃষ্টান্তের কথা যারা প্রচার করছিল, তাদের মধ্যে যে কতখানি দ্বিধা কাজ করে যাচ্ছিল, তা-ও অপ্রত্যক্ষ ছিল না। মুজিবনগরের সরকারের পাশাপাশি খন্দকার মোশতাক আহ্‌মেদের নিজের একটি গভর্নমেণ্ট চালিয়ে যাবার চেষ্টার কথা তখন কানাঘুষায় সকলে জানত। পাকিস্তানের জন্যে এঁদের দরদ চাপা ছিল না।

আমার কেমন মনে হত, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় সত্যি-সত্যি এ সংগ্রাম শুরু হয় নি। বাঙালিয়ানা কাকে বলে, সে থোড়াই জানে বাংলা-দেশের সব মানুষ।

যুক্তিতর্ক দিয়ে বিশ্লেষণ করে, সকল দিক বিবেচনা করে দেখা আমার নয়, তবে এইরকম আমার অনুভব, সে-কথা বলতাম। শুনে দীপেন আহত হতেন। জোর দিয়ে বলতেন—আপনি কিছুই বোঝেন না।

এর কারণ অবশ্য, দীপেন আমাদের মধ্যে, যে-সব শিল্পীরা সমিতির সঙ্গে কাজ করতাম, তাদের মধ্যে দেশের জন্য কাতরতা আর ভালোবাসা দেখতে পেতেন। সচেতন শিল্পীদের কথা যে আলাদা তা বুঝতে চাইতেন না। কিন্তু হায়রে শিল্পীরা—হায় সংস্কৃতি! সংস্কৃতি যা বলে যা অনুভব করায় রাজনীতি কি চলে সেইমতো? এদেশে রাজনীতির যে চিরকালই দেখছি আলাদা রাস্তা। দশাটা এমন—সংস্কৃতিবানরা রাজনীতির জগৎটাতে শ্বাসই নিতে পারেন না ভালো করে। রাজনীতি যেমনটা হতে পারত, তা তো হয় না। বিশেষ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুন্দর সুন্দর কথা আবেগ দিয়ে উচ্চারণ করে যাই আমরা শিল্পীরা। তারপর বছরের পর বছর যায়, কথাগুলো বলা হতে হতে ঘষে ঘষে মুছে মুছে অর্থ হারায়। উচ্চারণে আর জোর থাকে না—হয়ে ওঠে শুধু আবৃত্তি। তারপরেও বলে যাই অভ্যাসবশে। ভাবতে ভালবাসি এর effect হচ্ছে দেশের উপরে। কে জানে তা কতটা সত্যি। তবু, এ না হলে আবার বাঁচিও না। নিজের বিবেকের কাছে জবাব দেবার জন্যে করতেই হয় কিছু।

যাই হোক, সংস্কৃতিবান দীপেন বাংলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রামের সেই দিনগুলোতে আদর্শের বিশ্বাসযোগ্য ছবি দেখতে পেয়েছেন ভেবে নিয়েছিলেন।

কথা অবশ্য ওইটুকুই সব নয়। মাসের পর মাস আপিস কামাই করে, সংসারে বিসর্পিত অনুচ্চারিত অসন্তোষ সৃষ্টি করে দীপেন বাংলাদেশ উদ্ধার করেছেন। তারপর, শিল্পীদের সঙ্গে পাওনাগণ্ডা নিয়ে বাদানুবাদ হয়েছে। কারণ, খাওয়া-পরা চলবার জন্যে যার যতটুকু চাই তার সবটাই কেন দেওয়া হচ্ছে না—এর জবাব তো দীপেনকেই দিতে হবে। সমিতির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তো বটে তিনি। তাছাড়া তিনিই তো সকলকে একত্র করেছেন কিছু করবার জন্য—সকলে মিলে একসাথে চলে বাঁচবার ব্যবস্থা কি হতে পারে, পাশাপাশি, সংগ্রামী মনকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা কি—এইসব খুঁজে বার করবার জন্য। দোষ তাঁর নয় তো কার?! তাছাড়া ধর্মের কথা শুনতে গিয়ে প্রতিভাবান শিল্পীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তো। ব্যবস্থা ছিল, যে যেখানে গান গাইবেন, তার টাকা এনে দেবেন কমন ফাণ্ডে, সেখান থেকে মাসে

মাসে যার যেমন বরাদ্দ নিয়ে যাবেন। এতে, ভালো গাইয়েরা যে-টাকা উপার্জন করে দিব্যি চলতে পারতেন, তার ভাগ সকলকে দিয়ে ভোগ করতে গিয়ে ক্ষতি পোহাতে লাগলেন। তখন কি আর করা—দে দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালি! সময়টা যে কী সংকটেরই ছিল।

মনে আছে, 'কলামন্দিরে' বাংলাদেশের 'রূপান্তরের গান' হচ্ছিল একবার। তখন 'রবীন্দ্রসদন', 'মহাজাতি সদন', 'কমলা গার্লস স্কুল' বহু জায়গায় 'রূপান্তরের গান' হয়ে গেছে। ততদিনে দীপেনের কাছেও কি ঘষা-ঘষা হয়ে এসেছিল এইসব কথা আর গানগুলো! বললেন, গানের সময় আমার কি-সব মনে হচ্ছিল জানেন, কি সব অন্যকথা ভাবছিলাম, কি-রকম অবাস্তব লাগছিল সব। বলে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতেই লাগলেন নিজের কথা। মনে হল দীপেন যেন ডিসইলিউসান্ড।

অনেক চেহারা দেখে ফেলেছিলেন ততদিনে বাংলাদেশের শিল্পীদের। একদল বেরিয়ে গিয়ে নানা জায়গায় নানারকম গান গেয়ে নিজেদের মধ্যে বেঁটে নিচ্ছেন পয়সা। কামাই এতে ভালো হচ্ছে তাঁদের।

তবু তখনো উচ্ছ্বাসের বিপরীত টান ভালোমতো লাগেনি। যার মনটা বেলুন হয়ে উড়তে বেজায় খুশি, সে কি সহজে পড়বে মাটিতে।

বাহাত্তর সালে এলেন বাংলাদেশের 'বাঙাল' দেখে মনের সাধ পুরাতে। এসে দেখলেন গাড়ি-বাড়ি-সোফাসেট-টেলিভিশনের চমক। শিক্ষিত শহুরে-দের জীবনযাত্রার মান দেখে কপালে উঠল চোখ। বুঝলেন মনের কল্পনার সে-'বাঙাল' বাংলাদেশে চোখে পড়বার নয়। বুঝলেন বাঙালি জাতীয়তা-বাদের হাল-হকিকত। দেয়ালের গায়ের লিখনে পড়লেন, ভারতবিরোধী প্রচারের প্রখরতা, গ্রামের দিকে ঘুরতে গিয়ে দেখলেন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জলজ্যান্ত ছবি।

বেলুন আরো কত উড়তে পারে!

বুঝি বুঝলেন, 'সম্ভবত নিশ্চয়ই' বুঝবার কিছু ভুল হয়েছিল।

আর উচ্ছ্বাস করেন নি বোধকরি বাংলাদেশ নিয়ে। তবু মনটা টনটন করত বেদনায়, ভালো খবর শুনবার ঐকান্তিক কামনায়। লোকের মুখে অথবা চিঠিতে কত সময় সেকথা জেনেছি।

একাত্তর সালে একসাথে পথ চলতে চলতে, তাঁর চলার রকমটি তাকিয়ে দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, কাঁধের ঝোলাটিতে করে মানুষের সব বেদনা-

গুলোকে বয়ে বয়ে পথ হাঁটছেন যেন তিনি। আমার মনের মধ্যে তাঁর সেই চলাটা এখনো চলছে, ও-চলা থামে না।

গত বছর ডিসেম্বরের ছয় তারিখে লেখা হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর উনচল্লিশ দিন আগের কথা। 'পরিচয়'-এর জন্যে বাংলাদেশের এক নতুন কবির কবিতা নিয়ে গিয়েছিলাম হাতে করে। তত পছন্দ করলেন না লেখা। তার আগে পাঠানো রুদ্র মহম্মদ শহিদুল্ল-র কবিতার হাত বরং 'পাওয়ারফুল' বললেন। বললেন, তবু একটি কবিতা বেছে নেব, কারণ, বাংলাদেশের জন্যে আমার বড্ড দুর্বলতা তো।

এই দুর্বলতার দরুন বহুদিন মেনে আসা এক আদর্শ বিসর্জন দিয়েছিলেন একাত্তর সালে। শুনলে হাসি পাবে, একালেও যে দিনকাল পড়েছে এ-সময়েও এমন আদর্শ নিয়ে চলবার কথা ভাবে কেউ। কিন্তু গর্ববোধ করি তাঁর ভালোবাসার কথা ভেবে। তাঁর অতিথি হয়ে বাস করছিলাম সপরিবারে, রাত্রে রুটি খেতে পারি না, ভাতই খাই। ঘরের লোকেরা একদিন বললেন, শুনুন সন্‌জীদা খাতুন, জানবেন, জীবনে এই প্রথম দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় কালোবাজারে চাল কিনেছেন, বাংলাদেশের মানুষের জন্যে।

ওই ডিসেম্বরে বলেছিলেন, সন্‌জীদা খাতুনকে বলবেন 'পরিচয়'-এ লেখা দিতে।

সেই লেখা এই পাঠাচ্ছি।

স্মৃতির প্রদীপ ভাসানো

অরুণা হালদার

দেখতে দেখতে কমাস কেটে গেছে। আশ্চর্য লাগে যে মানবজীবন কত ভঙ্গুর তা ভেবে। নিজেদের বিস্ময়কর তুচ্ছতা নিয়ে মহাকালের সামনে মাথা নত করা ছাড়া আমরা কিছুই পারি না। পারি না সুখ বা দুঃখ কোনটাকেই স্থায়ী করতে। তা হলেও কোনো কোনো ক্ষত মিলিয়ে যায় না। কোনো কোনো ক্ষত গভীর একটা বিসদৃশ চিহ্ন রেখে যায় জীবনে—সে বিসদৃশতা একদর্শনে বুঝিয়ে দেয় আঘাত বা ক্ষত কি পরিমাণ ক্ষতিকর ছিল। দীপেন্দ্রনাথের তিরোভাব আমাদের কাছে তাই। আমি দীপেন্দ্রনাথকে গত পঁচিশ বৎসর দেখে আসছি। তরুণ দীপেন্দ্রনাথ সদ্য-ছাত্রজীবন পার হয়ে এসেছেন। নবীন লেখক হিসাবে 'তৃতীয় ভুবন' উপন্যাস লিখেছেন। মানবীয় মহিমায় দীপ্ত স্নিগ্ধ হাসিমুখ সেই দীপেন্দ্রনাথকে সদ্য-পরিণীতা বধূসহ বাড়িতে (তখন আমরা বিবেকানন্দ রোডে থাকি) সানন্দে সকৌতুকে আশীর্বাদ জানিয়েছি। তাঁদের দুজনকে দেখে বারবার একটি মহামন্ত্রই মনে এসেছে—'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।'

বিগত পঁচিশ বৎসরে স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কার্যকারণের সমবায়ে আমাদের যেমন পরিবর্তন হয়েছে তেমনি দীপেন্দ্রেরও হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তনের পথে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় আরো গাঢ়তর এবং আনন্দময় হয়েছিল। আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করে এসেছি তাঁর পরিণত চিন্তাভাবনা তাঁকে ঘরোয়া আলাপে এবং লেখায় ক্রমশ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সাহিত্যিকের সঙ্গলাভ করলেই

মানুষ সাহিত্যিক হয়ে ওঠে না। আমিও তা হতে পারি নি। দীপেন্দ্রও তা জানতেন। তা সত্ত্বেও তাঁর 'হওয়া না হওয়া' গল্পগ্রন্থের আলোচনা করার জন্য আমাকেই বলেন। আর, সেই গল্পগ্রন্থেই আভাস ছিল লেখকের সমৃদ্ধ সুপরিণত মানসের। সে মানসলোকে তৎসময়ের ঘটনাপঞ্জিও বিধৃত হয়েছে বাস্তব চিন্তাভাবনার উপাদান রূপে, তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সূক্ষ্ম মানবিকতা ও বিশ্বাত্মিকতাবোধ একই সঙ্গে। এগুলির সঙ্গেই পটভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে স্রষ্টা মানুষ দীপেন্দ্রনাথের সৃজনশীল উদ্যম। মানুষকে মানুষই হতে হয় এ পরিচয় তাকে বহন করে চলতেই হয়। শুধু কল্পনায় নয়, এ পরিচয়ের দায়িত্ব প্রতি পদক্ষেপে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে পারিপার্শ্বিক ও নিজেকে অপূর্ব সমন্বয়ের জীবন-রসায়নে জারিত করে তবেই লোকে পরিবেশন করতে পারে। এই মহৎ প্রয়াস মানুষকে 'মানুষ' করে। এই মানবধর্ম দীপেন্দ্রর রচনায় উদ্ভাসিত হয়েছিল। পড়ে মনে হয়েছিল এ বস্তু নূতন। সে লেখার গঠন-শিল্প অনেক নিরীক্ষা-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ঘটেছিল তা বোঝা গেছিল। বোধ করি জীবনযন্ত্রণার রূপসাগরে ডুব দেওয়া তাঁর শুরু হয়েছিল আরো আগে, হয়ত ১৯৫০-এর তৎকালীন পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও হাঙ্গামার সময়। সে সময় তিনি সেই শহীদদের কণ্ঠে 'পাখীর ভাষা' শুনেছিলেন। 'চর্যাপদের হরিণী'—যে 'অপনা মাংসে অপনা বৈরী' এই নব রূপকথা তাঁর হাতেই তখন সৃষ্টি হয়েছিল। এই লেখার ধরনটিই ক্রমশ সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছিল দীপেন্দ্রনাথের ১৯৭৭-এর শারদীয় সংখ্যার কালান্তরে সম্ভবত তাঁর শেষ উপন্যাসটির মধ্যে। সে উপন্যাস পড়ে দেখলে দেখা যাবে তাতে রিপোর্টিং আছে, আছে বাঙালীর বিভিন্ন মানসিকতার দ্যোতক আড্ডা, আছে দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের বেজে ওঠা ঝংকার। আর, এসব শুদ্ধ, কিছুই না বাদ দিয়ে, সব কিছুর মধ্য দিয়ে মানুষ চলেছে তার নিরন্তর সংগ্রাম নিয়ে। বস্তুত: মধ্যে একা সে মানুষ, নিজের এককত্বকে বহুজনার সম্মিলিত রসায়নে মিশ্রিত করেছে। তার মধ্যেই ব্যক্ত হচ্ছে অর্কেস্ট্রাল সিমফনি। সেটা কোনও মতেই একমাত্রিক নয়, বা লাইনার নয়। অথচ শঙ্খবিবরের মুখেই যেমন আকাশ-স্পন্দনে ঘন গভীর ধ্বনি বেজে ওঠে ঠিক তেমন ভাবেই সমস্ত উপন্যাসটির সূত্র ধরা আছে 'বিবাহবার্ষিকী'র স্মরণে। সে স্মরণ একক পদাতিক লেখকের চিত্ত-গোমুখ থেকে সঞ্চারিত হচ্ছে দুবপ্লাবিনী দুকূল ছোঁওয়া ভাগীরথী ধারণায়। মানব-মহাসাগরে তার যাত্রা। দীপেন্দ্রনাথের এ রচনা সামগ্রিক জীবন-শিল্প বলে আমার মনে হয়েছে। মনে হয়েছে নিজের মধ্যে তিনি কেন্দ্র ও বৃত্ত

পরিসরেব স্থিতিস্থাপকতা পেয়েছেন বা আবিষ্কার করেছেন। আজকের দীপেন্দ্রনাথের যথার্থ মূল্যায়ন তখনই সম্ভব যখন মানুষ তার আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে গিয়েও বিপর্যস্ত হবে না, বিমূঢ় হবে না। সম্ভব হবে তখনই যখন তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানবীয় সুখদুঃখকে আমরা পরিশীলিত পবিমিতিবোধ দিয়ে দেখতে পারব—যথার্থ শিল্পীমন নিয়ে। একই সাথে সংহত বিজ্ঞানেব নিবাসক্তি এবং পর্যাপ্ত আবেগ বা প্যাশনশুদ্ধ, তখন জীবন-সঙ্গীতের পারমার্থিকতাকে প্রাত্যহিকের মধ্যে আভাসিত দেখতে পাব। সাক্ষাতে দীপেন্দ্রকে প্রশ্ন করতে পারি নি, সত্যই তিনি নিজের মধ্যে সেই সত্যকে স্পর্শ করেছিলেন কিনা। আজ মনে হচ্ছে প্রশ্নের প্রয়োজন ছিল না। কাবণ, সত্য স্বয়ম্প্রকাশ।

উপর্যুক্ত আলোচনাব মধ্যে যা আমি বলতে চেয়েছি তা হল মানুষ দীপেন্দ্র আর লেখক দীপেন্দ্রের মধ্যে সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল। এরূপ সমন্বয় জীবন বিধাতাব পরম আশীর্বাদ। সকল সুখদুঃখকে অস্বীকাব না কবেও সকল কিছুর মধ্যে সেই পবম আশীর্বাদ চরম মূল্যবোধ নিয়ে, হীরার চেয়েও আশ্চর্য দ্যুতি নিয়ে ভাস্বর হয়ে থাকে। মানুষেব তা 'স্থিতি' বা চবম আশ্রয়। আব, সকরুণ বেদনাব মধ্যেও কৃতজ্ঞ আনন্দে স্মরণ কবতে বাধা নেই যে, দীপেন্দ্র সেই 'মহৎপদ'কে ভাগ্য বলে নয় অ-পরিমেয় পুরুষকার দিয়েই আয়ত্ত কবেছিলেন। সেই কাবণেই মনে হয় যে, বর্তমানকালে রচনাসামগ্রী সম্ভার তো বঙ্গ-ভারতীর দ্বারে কম নয়, প্রতিদিন পুঞ্জ পুঞ্জ কেণোদ্গমেব মতই গল্প-উপন্যাস উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে। মানবীয় সুখদুঃখের কষ্টকল্পনা, আবেগের উৎকট আতিশয্য, প্রকাশের রূঢ় ঘোষণা, জৈব প্রেবণার অ-প্রাসঙ্গিক প্রক্ষেপ বা projection, বিশিষ্টরূপ মতবাদেব অশালীন আক্রমণ প্রভৃতি নানারকম ভাবাভাব (Affirmation-Negation) নিয়ে সাহিত্যনামা এক জটিল তত্ত্বের আক্রমণে আমরা সতত যেখানে আক্রান্ত হচ্ছি, সমাজমন, ব্যক্তিমন সজ্ঞানে অজ্ঞানে নিরন্তর ক্লিষ্ট হচ্ছে, সেখানে মনে করতেই হয় যে 'বিবাহ বার্ষিকী'র মতো উপন্যাস তো বেশি নেই। অথবা এরূপ পবিচ্ছন্ন জীবনবোধ বেশি উপন্যাসে ব্যক্ত হয় নি। আমাদের ব্যক্তি জীবনেব ক্ষয়-ক্ষতির কথাব সঙ্গে সঙ্গেই মনে না হয়ে পাবে না, এই জীবনমন্ত্রের এক উদ্গাতার তিবোভাব বড অসময়োচিত, বড বেদনার। কারণ বাঙলা সাহিত্য-জগতের এই জ্যোতিষ্কটিব আবির্ভাবও যখন সম্পূর্ণ কবে বোঝা যায় নি, আর তখনই তাঁর তিরোভাব ঘটল।

আমার কাছে লেখক দীপেন্দ্র ও মানুষ দীপেন্দ্র অচ্ছেদ্যভাবে পরিচিত। তাহলেও বেশি করে মানুষ দীপেন্দ্রকেই হারিয়েছি, একথাই সত্য হয়ে ওঠে। ১৯৭৭ সালেই তাঁর চিঠিতে জেনেছিলাম তাঁর স-পরিবার রাজগীর যাবার কথা হচ্ছে। তাতে তাঁর অসুস্থতার কিছু লাঘব হতে পারে বলে চিকিৎসকেরা মনে করেছিলেন। আমরা খুশি হয়েছিলাম আমাদের পাটনার বাড়িতে তাঁকে সপরিবার দেখতে পাব বলে। সে বৎসর যাওয়া সম্ভব হয় নি। হয়েছিল গত ১৯৭৮ সালের শারদ অবকাশের সময়। ২০শে অক্টোবর পাটনা পৌঁছে সেদিনই রাজগীর যান তাঁরা। ফিরে আসেন ৩১শে। সেদিনই সন্ধ্যায় কলকাতা ফেরেন। পাটনার প্রখ্যাত ভিষগাচার্য ডঃ অজিত সেনের সাগ্রহ ব্যবস্থাপনায় এই যাত্রা পরিকল্পিত ও সুনির্বাহিত হয়েছিল। যাওয়ার পথে ও আসার পথে দু-বারই তাঁদের সাথে দেখা আমাদের হয়েছিল। আসার পথে আমি অসুস্থ বলে তাঁরা আমাদের বাড়িতেই আসেন দেখা করতে। নিজেও তিনি তখন অসুস্থ। তবুও সেই পরমাত্মীয়-প্রতিম অনুজমুখের আশা ও আশ্বাসের তৃপ্তি থেকে মন আনন্দবোধ করেছিল। দীপেন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন তাঁর মহীয়সী জীবনসঙ্গিনী, কন্যা কল্যাণীয়া মৃত্তিকা আর আত্মজ শ্রীমান মেঘেন্দ্র। এই দেখাটা না হলে আমি সংসারের একটি সুন্দর প্রকাশের শ্রী দেখার থেকে বঞ্চিত থাকতাম বলে মনে করি। মানুষের শৌর্য-বীর্য-বিক্রম তো শুধু সভাক্ষেত্রে নয়, কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে যুযুধানত্বের মধ্যেও নয়। মানুষের সত্যকার প্রকাশ তার স্বভূমিতে, তার গৃহে, নিতান্ত নিজস্ব পরিজনদের পরিকল্পনার সসীম বৃত্তের মধ্যে, অর্থাৎ তার স্বরাজ্যে। এই দেখা, বেশি লোকের ভাগ্যে সম্ভব হয় না। সেদিনের সেই দেখার মধ্যে আমার মনে হয়েছিল দীপেন্দ্র তাঁর স্বরাজ্যে অভিষিক্ত স্বরাট্। ১৯৭৭ সালের মে মাসে আমাদের শ্রদ্ধেয় আচার্যদেব সুনীতিকুমার লোকান্তরিত হন। দীপেন্দ্র অকাতর পরিশ্রমে ভাষাচার্য সংখ্যা 'পরিচয়' বের করেছিলেন। সেই সংখ্যায় দীপেন্দ্রের অনুরোধে আমিও লিখি। আচার্যদেবকে তো ঘরে বাইরে নানাভাবে দেখেছি। তাঁকে তাঁর সংসারক্ষেত্রেও আমার স্বরাট বলে মনে হত। তাঁর প্রাচুর্য ঐশ্বর্যের তুলনা দেবার মতো বেশি লোক নেই। কিন্তু সেদিন দীপেন্দ্রের মুখের প্রসন্ন হাসিতে, উজ্জ্বল মাধুর্যে আমি একরূপ মানবীয় সাযুজ্য দেখতে পেয়েছিলাম। আচার্যদেব বহুদর্শী সুপ্রাচীন। তাঁর গৃহে তিনি সতত স্নেহময় স্বজন, সব চাইতে বড় কথা যে তিনি জ্ঞানে সমুজ্জ্বল, বিনয়ে নম্র, করুণায় প্রবাহিত। দীপেন্দ্রের মধ্যেও সেই চরিত্র

মাধুর্য, নির্লোভ নিরহঙ্কার আর অনমনীয় দৃঢ়তা দেখে সশ্রদ্ধ আনন্দে ও বিশ্বাসে পাটনায় আমাদের শেষ সাক্ষাতের সন্ধ্যা আমার কাছে অভিষিক্ত হয়েছিল। পরম মমতায় সেই পরিবারটির কল্যাণ কামনা বারবার করে আমার মনে জেগেছিল। আমাদের সীমাবদ্ধ ইচ্ছা যে ফলপ্রসূ হয় না তা বুঝবার জন্য কয়মাসই বা লাগল? আমি সুস্থ হয়েও তাঁর পত্র পেয়েছি। তার পরই জেনেছি তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আকস্মিক-ভাবে পাটনায় বসে ১৫ই জানুয়ারির কাগজে দেখে স্তম্ভিত হয়েছি যে দীপেন্দ্র লোকান্তরিত। আমার দেখা সেই বিশেষ পরিবারটি চোখে ভেসে উঠল। কেন্দ্র ও বৃত্তের সমানুপাতে বিষম অসামঞ্জস্য ঘটে গেছে! মনে হয়েছে জ্যেষ্ঠ হিসাবে আমার যাত্রাই তো বাঞ্ছনীয় হত।

সত্যই মানুষ আমরা অতি সীমিত জ্ঞানবুদ্ধির বৃত্তেই ঘুরে ফিরি। আত্মা-পরমাত্মার কোনো অস্তিত্ব আছে কি না জানি না। থাকলেও এটা বুঝি যে, মাটির-বন্ধনের মতো সহজগ্রাহ্য পরিচয় 'আত্মার' নেই। জন্মান্তর আছে কিনা সেও অজ্ঞাত। আর, থাকলেই বা সেই স্নিগ্ধ জীবন-ব্যঞ্জনা কি সেখানে অভিব্যক্ত হয়, না হতে পারে? অথচ, মানুষের বেদনাবোধ যে কী সুতীক্ষ্ণ। সূক্ষ্ম চেতনা দিয়ে তা বোধ করি স্থূল শরীরকেও খানিকটা কাটে। আজকের বিয়োগ ব্যথার মধ্যে স্মরণ হচ্ছে ১৯৭৫ সালের কোনো একটা সময়ে দীপেন্দ্র শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয়কে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। শ্রীযুক্ত হালদার তখন পাটনায়। সে পত্র তিনি আমায় পড়তে দেন। তাতে একস্থানে ছিল—'গোপালদা, মাঝে মাঝে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে'।

উপর্যুল্লিখিত কথাগুলি তার সারল্যের জন্যই মর্মস্পর্শী। কাঁদতে কজন চায়? কাঁদতে কজন পারে? দীপেন্দ্রনাথের অন্তর্দাহে সেই ক্রন্দন জাগ্রত ছিল। সে ক্রন্দনের উৎসমূল জীবনবোধের বেদনাময় চেতনা। দীপেন্দ্রনাথের আশ্চর্য চেতনায় তাঁর দেহের সকল ক্লেশ সকল ত্রুটিকে তিনি উত্তরণ করেছিলেন। কিন্তু, সে বেদনার শুদ্ধ অনল শেষ পর্যন্ত তাঁকেই আহুতি নিল। দীপজীবন একপ্রকার দিব্যজীবন তো বটেই। তার অস্তিত্বই তার বিজ্বলন্ত আত্মধ্বংসী শিখারূপ। অথচ, সেই শিখারই আলোক সঞ্চারিত হয় জীবন থেকে জীবনে, মন থেকে গভীর চেতনায় এবং অনিবত ঊর্ধ্বায়ণে। অনন্ত সে পরিক্রমার উৎস কিন্তু শান্তই।

বহু বর্ষ আগে মথুরায় বিশ্রাম ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম যমুনার

আরতি। পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণ আজ মনে পড়ে না। কিন্তু বিস্ময়করভাবে মনে আছে যে পুজার্থী নরনারী ছোট পাতার দোলায় করে কিছু ফুল ও ঘৃতদীপ একটি স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে প্রণাম জানাচ্ছিলেন। যতদূর চোখ যায় মেলে দিয়ে দেখছিলাম দূর থেকে দূরান্তরে দীপশিখা ভেসে গেল, মিলিয়ে গেল, কোনটি বা ডুবে গেল, তরঙ্গ দোলায়—কোনটি বা ভেসে উঠল একটু উঁচুতে। সর্বগ্রাসী কালস্রোতে সবই যেন ভেসে গেল। শেষ প্রদীপের দেখাও কালগর্ভে লীন হয়ে যেন ডুবে গেল। সেই যমুনার তিমির নীরে ক্ষণশিখার জলদ্যুতি আরো ভয়াবহরূপে অসহায় ও শূন্য মনে হয়েছিল সেদিন। আজকেও মানব-মূল্যায়নের নিকটে করিত পাবক মানুষটির উদ্দেশ্যে, তিরোহিত অনুজের উদ্দেশ্যে এই ব্যর্থ স্মৃতির প্রদীপ ভাসিয়ে দেওয়াও মনে হচ্ছে তেমনিই শূন্যগর্ভ এবং অসার্থক। তবুও সীমিত বুদ্ধিচিত্ত মানুষের সীমিত তৃপ্তি খোঁজে, বেদনা ভাগ করে নিতে চায়, আর, স্মরণের বেদনাকে বহন করতেও চায়।

যেমন করে আমার চেনা

জ্যোতি দাশগুপ্ত

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর কিছুক্ষণ এই সংবাদটাই আমাকে পেয়ে বসেছিল যে তিনি প্রায় আমার বিশ বছরের কনিষ্ঠ ছিলেন। সহ-কর্মীর মৃত্যু কতটা অকালে ঘটল মাত্র সেজন্য নয়, কাছাকাছি বসে কাজ করা এই মানুষটি বয়সের এতখানি ব্যবধানকে ডিঙিয়ে আমারও অভিভাবক হয়ে উঠেছিলেন কোন গুণে, এই চিন্তাই আমাকে চেপে ধরেছিল, এবং এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে খুঁজতে আজও দীপেন্দ্রনাথকে বেশি বেশি করে চিনে চলেছি। নিজের সঙ্গে তুলনায় অন্যের মতো বোঝাটা একটা সহজাত নিয়ম।

দীপেন্দ্রনাথ যে বড়ো ছিলেন সেকথা তো পঞ্জিকাতেই লিপিবদ্ধ। তেরো বছর বয়সে তিনি গল্প লিখেছেন; চৌদ্দ বছর বয়সে লিখেছেন উপন্যাস। আর তেরো-চৌদ্দ বছরে আমার গুরুজনদের নজর এড়িয়ে পাঠ্য-পুস্তকের নিচে রেখে প্রথম উপন্যাস পাঠে চোখ ও নাকের জলে একাকার হয়েছে।

বাল্যাবধি কথা-সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ অসামান্য জীবনবোধের তাড়নায় কমিউনিস্ট হয়েছেন। আর আমার লেখার জগতে প্রবেশ তিরিশোর্ধ্বে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মবিভাগের ঘূর্ণাবর্তে। আমাদের পরিচয় ঘটল পত্রিকার কাজের মধ্যে—সংবাদপত্রের দপ্তর, যেখানে দেশের ও পৃথিবীর ঝড়ঝাপ্টা সবচেয়ে আগে লাগে। কমিউনিস্ট পত্রিকার সাংবাদিকদের আরো দায় পার্টির কর্মকৌশলের আবেষ্টনির মধ্যে বিষয়কে সাজানো, অথচ ফুটিয়ে তোলা।

অসীমকে সীমার মধ্যে টানাব এই প্রক্রিয়া সৃষ্টিশীল কথকের কাছে বুঝি কিছুটা উল্টাটান, কিন্তু সংবাদের ঝড়ই অধিকাংশকে যেভাবে আলোড়িত করে তাতে তপ্ত বিতর্ক ও বিশ্বজগতের সঙ্গে একাত্ম হওয়া এখানকার সাধারণ প্রবণতা। এই সদা-চাঞ্চল্যেরই ফল হল পত্রিকার পটে একটা গড-ব্যক্তিত্বের বিকাশ—যিনি বড় তাঁর স্বকীয়তায় কিছু আঁটসাঁট লাগলেও সাধারণ দশজনের কাছে বড় হয়ে ওঠার এ এক প্রশস্ত দেশ।

পত্রিকার কাজ-কারবারে ঘনিষ্ঠ ও অন্বিষ্ট হয়ে থাকায় দীপেন্দ্রনাথের অনেক লেখা হয়ে ওঠে নি একথা স্বতঃসিদ্ধ। সাহিত্যে তাঁর যা দেবার ছিল তার অনেকটা চাপা পড়ে থেকেছে এ নালিশ অযৌক্তিক নয়। 'কালান্তর'-এর শারদীয় সংখ্যাগুলি তার একটা সাক্ষী। এগুলোর সম্পাদনায় বছরের পর বছর দীপেন্দ্রনাথ যেরকম ভূতের মতো খেটেছেন তার শতভাগের এক ভাগ শ্রমে সাহিত্যক্ষেত্র অনেক পুষ্পে মঞ্জুরিত হতে পারত। রাতদিন এবং দিনের চেয়ে রাতেই বেশি, অন্যকে দিয়ে লেখানোর জন্য, সেসব লেখার উপর স্কেচ অংকনের শিল্পী খোঁজার জন্য, এমনকি লেখার প্রুফগুলি স্বহস্তে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নির্ভুল রাখার জন্য তাঁর অন্তহীন খাটুনি কুলির শ্রমকেও হার মানাত। সম্পাদকরূপে দীপেন্দ্রনাথের নিষ্ঠা 'কালান্তর', 'পরিচয়' এবং কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত আরো কতগুলি সংকলনে মূর্ত। অথচ বছরের পর বছর এই 'কালান্তর'-এর সংখ্যাতে দীপেন্দ্রনাথ নিজের একটা লেখা দেন নি।

এ কী শুধু সময়াভাবের জন্য? কিংবা আরো কিছু কারণ ছিল?

যতটা আমি বুঝেছি, দীপেন্দ্রনাথের আচারনিষ্ঠ কমিউনিস্ট মেজাজও তাঁর লেখার অন্তরায় হয়েছে। কী লিখি, কেন লিখি, কোথায় লিখি, প্রগতিশীলদের সৃজনীশক্তির বিকাশ ও তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটা কাগজ বের করা, একটা সমবেত মঞ্চ এবং একটা সমবায় গড়া প্রভৃতি প্রশ্নকে জড়িয়ে তাঁর ক্ষ্যাপার মতো অন্বেষণ অনেকেই টের পেয়েছেন।

স্বাধীনোত্তর ভারতে উঠতি পুঁজিবাদের হাতছানি প্রলোভন মুনির মনকেও টলাবার মতো এক সামাজিক বাস্তবতা ছিল। কার্ল মার্কস-এর সেই সতর্কবাণী—লেখকের বাঁচবার জন্য টাকা চাই, কিন্তু টাকার জন্য লেখায় লেখক থাকে না—এ কি অনেক অভিজ্ঞতার পোড় না খেয়ে আপনা-আপনি আত্মস্থ হতে পারে? তবু এরই মধ্যে দীপেন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকের

মতো নিজেকে রক্ষা করে চলেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হবার গৌরববোধটা দীপেন্দ্রনাথের এসেছিল এখান থেকেই।

এরই মধ্যে আবার কমিউনিস্টদের নীড়টা ভাঙল। কমিউনিস্ট আন্দোলনে কী বিভেদ সংগঠন কী সৃষ্টিশীল উন্মাদনা দু' ক্ষেত্রেই যে হতাশা ছড়াল তার প্রধান শিকার হল মননশীলতা।

দীপেন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে মিস্ত্রি হবার কাজটাই নিজের জন্য বেছে নিলেন। লেখার জন্য তিনি অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সময় তিনি পেলেন না।

কিন্তু এরই মধ্য আশ্চর্য, কী লিখি কোথায় লিখি বলে যাঁর নিজের লেখা নিয়ে এত খুঁতখুঁতি, অন্য লেখকের বেলায় সেই দীপেন্দ্রনাথ বসুন্ধরাকে কুটুম্ব করার পক্ষপাতী। এ নিয়ে 'কালান্তর'-এ অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। টাকার টানের লেখককে কমিউনিস্ট পত্রিকায় স্থান দেবার বিতর্কে দীপেন্দ্রনাথ সর্বদা লেখকের পক্ষ নিয়েছেন। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, সৃষ্টিশীলতার মুখ কমিউনিজমের দিকেই, কুয়াসার চেয়ে সূর্য বড়ো।

সাহিত্যের ধ্রুপদী শাখায় দীপেন্দ্রনাথ সবুরপন্থী হলেও সংবাদ সাহিত্যে তাঁর রচনা কম নয়, এবং তার মধ্যে কতগুলি দীর্ঘস্থায়ী সম্পদের উপাদান বিশিষ্ট। কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত 'কালান্তর' ঘেঁটে সংবাদপত্রে দীপেন্দ্রনাথের লেখার যে তালিকা তৈরি করেছেন তাতে চল্লিশ ফর্মার পুস্তক হতে পারে। 'ঘোড়েওয়ালাবাবু', 'আমরা থানা থেকে এসেছি', 'নো পাসারান', 'আমার বুলার জন্য' প্রভৃতি লেখা এর অন্তর্ভুক্ত।

পত্রিকার এসব লেখা ষোলআনা পার্টিজান, কোন প্রতীকির আশ্রয় করে নয় বলে চাঁছাছোলা। দলাদলির কালপর্ব অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত এর সাহিত্য-মূল্য আপাতত বহুজনের নিকট থেকে আবশ্যকীয় মর্যাদা পেতে না পারে, কিন্তু প্রচার-ধর্মী এ-লেখাগুলির মধ্যেও সত্যসন্ধানী দীপেন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ দূরদর্শিতা, প্রগতিশীলতার জন্য তাঁর যে আবেগ, কথা বলার সেই অপরূপ ভঙ্গি, শিকড় ও ফলের সমাহারপূর্ণ বাস্তবতা উপস্থাপনের বিজ্ঞান প্রভৃতি সার্বজনীন উপাদানগুলি ভবিষ্যৎ পাঠক চিরদিন বর্জন করে চলতে পারবেন না।

সংবাদপত্রের পাতায় দীপেন্দ্রনাথের এ রকমের অনেক লেখার বিষয়বস্তু এবং তার উপস্থাপনের সঙ্গে আমার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। আমাদের ঘনিষ্ঠতার কাঠামোটা মুখ্যত এসবের আলোচনার মধ্যেই গঠিত হয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির 'পজিটিভ হিরো'-র জীবন-সাহিত্য রচনা সম্পর্কে আমাদের অনেক আলোচনা হয়েছে। 'ঘোড়েওয়ালাবাবু' তারই একটা ফল।

কিন্তু তার যে বিড়ম্বনা সেকথাও ভুলবার নয়।

বিহার বিধানসভায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী নক্ষত্র মালাকারের জীবন নিয়েই 'ঘোড়েওয়ালাবাবু'। তা যেমন তখনকার রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটাল, তেমনই এক সাহিত্য সৃষ্টি হল। কিন্তু একটানা ভাল হয় কোথায়? কিছুদিন পরই সংবাদ এল ঐ দুর্দ্ধর্ষ মানুষটি নকশালদের সঙ্গে ভিড়েছেন। রাজনীতির এমন এক চড়ে সাহিত্যেরও দফা রফা। আমরা দুজনেই বোকা বনে গেলাম। আমাদের ঘনিষ্ঠতা কিন্তু তাতে নিবিড়তর হয়েছে এবং পরস্পরকে বুঝা দিয়েছি একথা বলেই যে, চিরদিনের সত্য হল না বলে 'ঘোড়েওয়ালাবাবু' মিথ্যে নয়।

তবে আবার আমাদের দিন এসেছিল। নক্ষত্র মালাকার আবার পার্টিতে ফিরে এলেন।

তবু সাহিত্যের হিরোকে একজনের জীবনভিত্তিক না করে কমিউনিস্ট জীবনের বৃহত্তর পটভূমিকায় প্রতিভূ-জীবন নিয়েই তা রচনা করা উচিত বলে তখনকার মতো সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছেছিলাম।

বিপরীতে আমার লেখা একটা সম্পাদকীয় নিয়েও দীপেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার বিপদের দিনের বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। তা '৭২ সালের নির্বাচনের সময়। সি-পি-এম মুখপত্রের একটা 'শহীদ সংখ্যা' বেরিয়েছিল, এবং শহীদের নামে ভোট চাওয়া হয়েছিল। 'কালান্তর'-এর সম্পাদকীয়তে বলা হল যে, সি-পি-এম-এর শহীদনামায় নক্সালপন্থীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষে নিহতরাও স্থান পেয়েছেন। এ থেকে সম্পাদকীয়কে টেনে নেওয়া হয়েছিল এই বক্তব্যের দিকেই যে, সি-পি-এম-এর হাতে নিহত নক্সাল ও নক্সালদের হাতে নিহত সি-পি-এম দুয়ের জন্যই বাংলা-মায়ের আজ বুক চাপড়ানো ছাড়া উপায় নেই। সম্পাদকীয়ের শেষ কথা ছিল এইরূপ যে নিছক দলের শহীদনামা তৈরি করতে গেলে সকলের শহীদ বসিরহাটের মুরুল, কৃষ্ণনগরের আনন্দ হাইত এরাই নতুন করে মারা যাবে।

নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পাদকীয় ভাল কি মন্দ তার পরিবর্তে পার্টির তৎকালীন তাৎক্ষণিক রাজনীতির কষ্টিপাথরে এই সম্পাদকীয় বেশ বেসুরেই

রাজল। নির্বাচনীক্ষেত্রে সি-পি-এম কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ঠিকই, কিন্তু নির্বাচন-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টিকারী নক্সালপন্থীরা তখন কমিউনিস্ট প্রচারকদের ঠেঙাচ্ছে এবং প্রার্থীদের প্রাণনাশের হুমকিও দিচ্ছে। এমত এক সময়ে নক্সালপন্থী শহীদদের ঊর্ধ্বে তুলে ধরা কী সময়োচিত ? •

আমি বেকুব বনলাম নিঃসন্দেহে।

দীপেন্দ্রনাথ কিন্তু সহানুভূতি জানালেন আমাকে। ভ্রান্ত, এমনকি ভ্রাতৃঘাতী রাজনীতির নায়ক যাঁরা, তারা, এবং স্বপ্ন নিয়ে যে-কিশোররা প্রাণ দিল এরা এক নয় কিছুতেই। অথচ নিয়ম এমনই যে মৃত্যুর পর নেতাদের দোষ ছেড়ে গুণ ধরে জাতীয় স্বীকৃতি জুটবে, কিন্তু নিষ্পাপ কিশোরের দল মায়ের বুকের জ্বালা জুড়াবার মতো সান্ত্বনাটাও পাবে না।

দীপেন্দ্রনাথের দুটো রিপোর্টাজ 'আমরা থানা থেকে এসেছি' এবং 'আমার বুলার জন্য' বাঁশদ্রোনীর কমিউনিস্ট কর্মী নিতাই মুখার্জিকে হত্যার ঘটনার উপর রচিত। এই খুনের অভিযোগ সি-পি-এম-এর বিরুদ্ধে। 'আমার বুলার জন্য' '৭৭ সালের নির্বাচন উপলক্ষে লেখা। তখন কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক অবস্থান ছিল এইরূপ যে, নির্বাচনে সি-পি-এম-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপরিহার্য হলেও সি-পি-এম বিরোধী রাজনৈতিক ফ্রন্ট গড়া নয়।

তত্ত্বগত অবস্থান সঠিক—কিন্তু এর রাজনৈতিক রূপদান কঠিন।

এমনই এক সময় পত্রিকায় প্রকাশিত কতগুলি সংবাদ নিয়ে দীপেন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুললেন, আমরা কার্যত সি-পি-এম-বিরোধী হয়ে যাচ্ছি কিনা।

এই নির্বাচনে সি-পি-এম'এর প্রচারের একটা মুখ্য বিষয় ছিল এই যে গৃহ ও পাড়া ছাড়া তাদের ১৫ হাজার কর্মী সি-পি-এম জিতলেই ঘরে ফিরতে পারবে—নতুবা নয়।

ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা সৃষ্টিতে সি-পি-এম-এর ভূমিকা ও সেই পথ পরিহার করার কথা এই প্রচারে ছিল না। তা ছাড়া এই প্রচার এ-কারণেও অহিতকর যে গণতন্ত্র বিনাশেই সকলের মঙ্গল এর পরিবর্তে দলের জয়েই দলের কর্মীদের মঙ্গল এই ধারণা ছড়ায়।

'কালান্তর'-এর কর্তব্য পালন সহজ ছিল না বলাই বাহুল্য। দীপেন্দ্রনাথকে বললাম, নিতাই-এর স্ত্রী ঝুনু ও তার কন্যা বুলুর কাছ থেকে জেনে আসা ভাল আমাদের কী বলা উচিত। দীপেন্দ্রনাথ গেলেন এবং রিপোর্টাজ লিখলেন।

ঝুনুর সঙ্গে দীপেন্দ্রনাথের যে-কথা হল তা নিম্নরূপ :

'কাগজে দেখেছেন তো সি-পি-এম নেতারা বলছেন তাঁদের দলের পনের হাজার ক্যাডার ঘরে ফিরতে পারছেন না। আপনি কি চান যে তাঁরা যে-যার ঘরে ফিরুন।

'মুহূর্তের চিন্তা না করে আমার প্রত্যাশার অতিরিক্ত স্বাভাবিকভাবে কমবেড ঝুনু বললেন—ফিরে আসবে না কেন? তাঁদেরও তো মা-বৌ-মেয়ে আছে।

'তারপর একটু থেমে, একটু কুণ্ঠিত হয়েই বললেন, এসে যেন ভালভাবে থাকে, আবার সেই সন্ত্রাস সৃষ্টি না করে। মনের ভেতর একটা ভীতি যে থেকেই যায় দাদা।

'বললাম, আপনি কি চান ওঁরা আবার রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করুন।

'—নিশ্চয়ই। তবে রাজনীতিটা যেন সুস্থ হয়। সেদিনের পলিটিক্স মনে হলেই তো বিভীষিকা মনে পড়ে যায়।

'একবার, ঐ একবারই বুঝি কমরেড ঝুনুর চোখে আতঙ্ক ছায়া ফেলল। দমকা বাতাসে প্রদীপের স্থির শিখা কেঁপে গেল যেন। আমি দেখতে পাচ্ছি ভোর রাতে কড়া নেড়ে কারা বলছে : দরজা খোল, আমরা থানা থেকে আসছি। ঘুম জড়ানো চোখে ঝুনু ছিটকিনি খুলে দিলেন, ঘুম জড়ানো চোখে নিতাই উঠে বসল। তারপর চেনা-অচেনা অনেকে পাইপগান হাতে ঢুকল। ঝুনুর চোখের সামনে, বুলার চোখের সামনে··

'ছটফট করে উঠে বললাম, হ্যাঁ একথা আপনি বলতেই পারেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, পরের ছ-বছর ওরা তো একঘরে হয়ে কাটাল।

শান্ত স্বরে ঝুনু বললেন, ঘর ভেঙেছে। শাস্তি ঠিকই পাচ্ছে।

'তারপর কিছুটা যেন আত্মগতভাবেই বললেন, দুঃখের মূল্যেই তো ওঁরা আমাদের কষ্ট ও নিজেদের ভুলও বুঝবে।'

রিপোর্টাজ পড়ে দীপেন্দ্রনাথকে বলেছিলাম, 'কালান্তর'-এর আর দশটা লেখার চেয়ে আপনার রিপোর্টাজ যে অনেক বেশি ক্ষুরধার হল।

দীপেন্দ্রনাথ হ্যাঁ-না সেদিন কিছুই বলেন নি।

দূর ও নিকট এই দ্বন্দ্ব বড় সাংঘাতিক। স্বপ্ন দেখেই কাজ শেষ নয়। স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্য মাটিতে কোদাল চালানো বড় কঠিন।

তবে, নির্বাচনে জয়লাভের পর সি-পি-এম নেতারা আর পুরোনো হানাহানির পুনরাবৃত্তি নয় বলে যতটুকু বলেছেন তাতে দীপেন্দ্রনাথের স্বপ্নেরই জয়ের সূচনা।

দীপেন্দ্রনাথের চেষ্টা

অসীম রায়

দীপেন্দ্রনাথের শোকসভায় এমন এক ঘটনা ঘটেছিল যা ইদানীংকালে কম ঘটেছে। এ সভায় বিভিন্ন মত বিভিন্ন পথের লেখক-সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ-বৃদ্ধ-যুবা-কিশোর এসেছিলেন দলে দলে। কী এমন ছিল দীপেন্দ্রনাথের কর্মে কল্পনায়, তাঁর সাহিত্যে জীবনচর্চায়, যার ফলে অগ্রজ-অনুজ অনেকের কাছেই তিনি বাঙালি সংস্কৃতি জগতের এক অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন? তাঁর অকালমৃত্যুর স্তম্ভিত শোকের মাঝখানে এই প্রশ্নটা অনেকের মনেই নাড়াচাড়া করেছিল সেদিন।

সত্যিই তো খুব দীর্ঘ সময়ব্যাপী তন্ময় সাহিত্যচর্চা দীপেন্দ্রনাথের ছিল না। সাংগঠনিক রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন এবং সেজন্যে গর্বিতও ছিলেন। সাংগঠনিক রাজনীতির যে অপরিসীম ও অবশ্যম্ভাবী আবদার তা পুরোপুরি বছরের পর বছর ধরে নিরলসভাবে রক্ষা করেছেন। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জগতের, বিশেষ করে কমিউনিস্ট জগতের অন্তর্দ্বন্দ্বের বেদনা কাঁটার মতো তাঁর বুকে বিঁধত, কখনও কখনও মনোমালিন্যের ঝড়েও কাতর বোধ করতেন। ফলে সাহিত্যকর্মের জগতের পরিমাপ ছিল বিশেষ সঙ্কুচিত। বনের মোষ তাড়াতে অনেক সময় ব্যয় করেছেন। তাছাড়া শরীরও খুব জোরদার ছিল না। এই সব প্রবল প্রতিকূলতা অসুবিধা সত্ত্বেও দীপেন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যকর্মে ও মেজাজে এমন এক মূল ভিত্তির ওপর এসে দাঁড়িয়েছিলেন যা খুব কম বাঙালি লেখক, বিশেষ করে গদ্য লেখক সাম্প্রতিককালে দাঁড়িয়েছেন। দীপেন্দ্রনাথ

একই সঙ্গে যেমন তাঁর কালের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে নিজেকে জড়িয়েছিলেন, লেখকের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কর্মীর সমাজজিজ্ঞাসা যেমন অনন্য জীবন-জিজ্ঞাসা রূপে উপলব্ধি করেছেন, তেমনি সাহিত্যের নিরলস দুনিয়াব্যাপী প্রচেষ্টায় যে প্রবল পরাক্রান্ত শিল্পোৎকর্ষে সমুজ্জ্বল গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে তার ঐতিহ্যে বাংলা গদ্যচর্চাকে যথেষ্ট পরিমাণে কালোপযোগী আধুনিক রূপ দেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

অর্থাৎ যে দুটো জগৎকে সচরাচর আমাদের মানসিক আলস্যে অসহিষ্ণু-তায় দুটো গ্রহ বলে চিহ্নিত করে থাকি সে দুটো যে আসলে একটাই অখণ্ড ও সামগ্রিক জগত, দীপেন্দ্রনাথ তাঁর কর্মে-কল্পনায় এই মূল সত্যটি উপলব্ধি করেছেন এবং সেইভাবে কাজ করেছেন।

কথাটা বলতে যত সহজ কাজে তা যে মোটেই নয় তা বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গত দু দশকের বহুল পরিচিত ও সমাদৃত গদ্য লেখকের কাজের চেহারা দেখলেই স্পষ্ট। আধুনিকতা চর্চা বাংলা কবিতায় অনেকটা শিকড় নিয়েছে। এখন যাঁরা তরুণ কবি তাঁদের প্রকাশভঙ্গিতে কুমুদরঞ্জন মল্লিক কিংবা কালিদাস রয়ে ফিরে যাবার কথা ভাবেন না। বিশেষ করে আধুনিক বাঙালি কবিদের কর্মকাণ্ডে নতুন ভাবনা ও প্রকাশভঙ্গির এক সচেতন সমন্বয়ের প্রয়াস বারেবারে ঘটেছে। বাংলা গদ্যে এই স্বাভাবিক পরিক্রমা, অন্তত জনপ্রিয় লেখকদের ক্ষেত্রে, মোটেই স্পষ্ট নয়। সেই পুরনো ভাবাবেগ আপ্লুত আগোছাল গদ্য, কিছু কিছু চাতুর্য ও কৌশলের আশ্রয় নিলেও আধুনিকতা গদ্যে প্রায় নিরালম্ব। আসলে প্যাচপেচে ছোট্ট কান্না ও ছোট্ট হাসিকে সাজিয়ে গুছিয়ে সাহিত্যের সংসার।

সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সচেতনতা কাব্যে বেশ কিছু পরিমাণে বিধৃত হলেও গদ্যে তাকে গড়ন দেবার দুরূহ দায়িত্ব পালনের চেষ্টাও কম। গদ্য যেহেতু অনেক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা দরকার, তলিয়ে বলা দরকার, সেজন্যে তার স্থাপত্য নিয়ে ভাবনা কম। কবিতায় কতগুলো নির্দিষ্ট ছেদ আছে কিন্তু গদ্যে যে অনির্দিষ্ট যতিহীনতা, বিপরীত ভাবাবেগের সংঘর্ষ এবং অনেক সময় সেই বিপরীত ভাব-ধারার ঝাড়াঝাপ্টা সমন্বয়ের বদলে অন্তহীন সুখদুঃখের সমান্তরাল সঞ্চরণ, তার সঙ্গে সমাজ সচেতনতার চেনা মামুলি ছকের অনেক অমিল।

তাই দীপেন্দ্রনাথের ব্রত ছিল দুরূহ। প্রাণপণে তিনি আধুনিক হবার চেষ্টা করেছেন। আধুনিক গদ্যকারদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রেরণা তাঁর জীবনের গোড়ায় জল ঢেলেছে, তেমনি তিনি আমাদের এই দুঃখে বিদীর্ণ বাঙালি

জীবনের শরিক হয়েছেন। ছুটেছেন সর্বত্র। দেশের বিপদে আপদে দুঃখে আনন্দে। যেমনভাবে তিনি দৌড়েছেন খরাক্লিষ্ট বন্যায় ভাসা মানুষের কাছে, পূর্ব বাংলার মানুষের দুর্বিপাকে, তেমনি একাগ্রতায় হাত বাড়িয়েছেন যেখানেই ভালো উপন্যাস গল্প নাটক ফিল্ম। সাহিত্যে সমাজবাদী চিন্তাধারাকে যেমন সমৃদ্ধ, আরও ঐশ্বর্যশালী করে তুলবার চেষ্টায় তিনি ছিলেন সচেষ্ট, তেমনি চেষ্টা করেছেন আধুনিকতা যেন একটা বহিঃরঙ্গে পর্যবসিত না হয়, আজবের সন্ধানে ছোটা না হয়। বাস্তবের এই দ্বৈত চেহারার বিরাট স্পন্দমান পরিবর্তনশীল রূপকে তাঁর ছোট্ট শরীর আর চওড়া হৃদয় দিয়ে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

বলাবাহুল্য দীপেন্দ্রনাথের কৃতি সর্বক্ষেত্রে সমান নয়। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে কোথাও কোথাও মনে হতে পারে আরও তন্ময়তার অবকাশ আছে, যেসব কথা বলেছেন তা আরো ছড়িয়ে বিস্তৃত ক্যানভাসে সাজালে যেন আরও ভালো হত। কিন্তু লেখকের অবিরত প্রয়াস এবং তাঁর মেজাজের লক্ষ্যই আমাদের আলোচ্য। মহৎ লেখকদের ক্ষেত্রেও কি একথা প্রযোজ্য নয়?

দীপেন্দ্রনাথের নিজস্ব সাহিত্যকর্ম ছাড়াও আর একটা বিস্তৃত ও ব্যাপক জগত ছিল—তাঁর সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্র। সেখানে সমাজ সচেতন উচ্চমানের লেখা সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম দায়বোধ বিস্ময়কর। তাঁর সীমাবদ্ধ সামর্থ সত্ত্বেও অবিরত উৎসাহ দিয়েছেন লেখকদের, তাঁদের একলা চলার অনিশ্চিত পথ আলোকিত করেছেন বছরের পর বছর। অগ্রজদের কাছেও সাংস্কৃতিক জগতে তাঁর নেতৃত্ব ছিল তাই অপরিহার্য।

দীপেন্দ্রনাথ সাংগঠনিক রাজনৈতিক কর্মী হলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক মস্ত বড় মিলনের স্বপ্ন দেখতেন। এ কারণে তিনি কিছু কিছু অসহিষ্ণু বামপন্থী লোকজনের কাছে ছিলেন সন্দেহের বস্তু। আসলে মানুষের কাছে তাঁর প্রত্যাশা ছিল অনেকখানি বেশি। যাঁদের লেখা তাঁর পছন্দ হত না তাঁদের কাছেও তাঁর ছিল অবিরত প্রত্যাশা। এতগুলো গুণের সমন্বয় খুব লোকের ক্ষেত্রেই ঘটে। দীপেন্দ্রনাথের স্মৃতি আমাদের ক্লিন্ন দীন জীবনের এক মস্ত সঞ্চয়।

ছিন্ন-পক্ষ ও পূর্ণচ্ছেদ

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

নেত্যচরণের সঙ্গে জটায়ুর শরীরী সাদৃশ্য একটাই, নেত্যচরণের দুটি হাত কনুই পর্যন্ত কাটা।

জটায়ু পৌরাণিক, জটায়ুর পৌরাণিক অনুষঙ্গ এরকম : জটায়ু বায়ু-বেগ-গামী পাখি বিশেষ, পক্ষিরাজ। গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্যসারথির এক পুত্র জটায়ু, অর্থাৎ জটায়ুতে সূর্যের অংশ আছে, জটায়ু ভ্রাতা সম্পাতির সঙ্গে ইন্দ্র-জয়ের বাসনায় আকাশমার্গে যাত্রা করেছিলেন, সীতা রক্ষার্থে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধকালে জটায়ু ছিন্নপক্ষ, সীতাকে অপহরণ করে রাবণ দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেছেন—এই জরুরী-সংবাদটুকু রামচন্দ্রকে দেওয়ার পরই জটায়ুর মৃত্যু হয়।

নেত্যচরণ দুর্গাকে রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিল, সুপুরির চোরাই ব্যবসা, ছুটন্ত গাড়িতে তড়িৎ গতিই তার যাবতীয় সংগ্রাম। যার নাম নেত্য, কেন যেন সে নাচতে পারত, যে নাচ ওড়ার সামিল, যে নাচে সে উড়তে পারত। নেত্যচরণ ধুনচি নিয়ে দেবী-প্রতিমার সামনে নাচত, ধুনচিতে আগুন, চারপাশের পাট-কাঠির বেড়ায় আগুন। ফলে সে আগুনের অধিকারও পেল, নেত্যচরণ জটায়ু হয়ে গেল : 'এই যে, এই যে, এইখানে।'

অথচ সে ত নেত্যচরণ, সামান্য নেত্য। নেত্য পৌরাণিক নয়। দেশভাগ দেখেছে। অনাহার দেখেছে। হয়ত বা যুদ্ধও। দুর্গা পৌরাণিক নয়, তাকে কেবিনের (হোটেলের) ভেতর আটকে রাখা যায়, ধর্ষণ করা যায়, তার মাথার ওপর তখন বৈদ্যুতিক-পাখা ঘোরে।

আর যা কিছু সবই আগুন।

ফলে সেই পৌরাণিক জগত একেকবার গড়ে ওঠে ধোঁয়ায়, আগুনে, অন্ধকারে আবার তা মুহূর্তেই ধূলিসাৎ। এই জগত নির্মিত হয় একেবারে সূচনায় ('ট্রেনের শব্দটা ক্ষীণ হতে হতে ঝিঁ-ঝিঁর ডাকের সঙ্গে মিলে গেল')। ট্রেনটি চলে গেলে, ক্রমে, ট্রেনের শব্দ ঝিঁ-ঝিঁর ডাকে স্থিতি পায়। তখন যেমন লুট অন্ধকার ফিরে আসে পূর্ববৎ, আকাশ, গাছ, মাটি ও শূন্যতা সমেত সেই প্রাকৃত জগত উঠে আসতে থাকে, তেমনি ট্রেনের শব্দটা .....ঝিঁ-ঝিঁর ডাকে মিশে' কি ভ্রমাত্মক। 'আজ জোনাকিও ছিল না। অমাবস্যায় অবিশ্বাস্য ' সেই জগত উঠে আসতে থাকে। হ্যাজাক জ্বলছিল বলে ঐ পরিবেশ ভিন্ন মাত্রা পায়, এবং হ্যাজাকটি যেহেতু এই পরিবেশে গৃহীত হয়ে যায়, ফলে ঐ অলৌকিকতা 'আরো অবস্তার'। আসবটি 'অবস্তার'। পৌরাণিক জগতের সীমায় তখন বর্তমান প্রবিষ্ট, বা বর্তমানে সেই পৌরাণিকতা এসে যাচ্ছে। যেহেতু বর্তমান আদিম-নির্দয়, তারা অতিক্রম করে যেতে চায় এই কাল, তাদের আগ্রহে আকাঙ্ক্ষায় সেই প্রাচীন-তীব্রতা, অদম্য বাঁচার আলোড়ন। মৌল-মানবিক-উপাদানের প্রহারে তারা নির্যাতিত। তদুপরি এই অন্ধকার, অন্ধকার-কাল, তারা প্রজ্জ্বলিত করতে চায়। আবার দুর্গাকে প্রলোভিত করে কোথাও দেশলাই কাঠি জ্বলে, সমস্তই তছনছ করে দেয়, সম্পূর্ণ অ-পৌরাণিক এক ঝড়ে। এই ঝড়ের 'চশমা ছিল কি·?' তার পরনে কি ছিল, প্যান্ট না ধুতি, সে কোন স্টেশনে নামত।

অথচ...'তাকে বীর মনে হচ্ছিল।' ঢাকের মাথায় সুসজ্জিত পালক 'বীরছত্র' সাদৃশ্যে নেমে আসছে নেত্যচরণের মাথার ওপর, পরিস্থিতি বীরত্ব দাবি করে, বীরত্বের প্রয়োজন থেকে যায়। বিশ শতকী বেচা-কেনা, যন্ত্রে ও যান্ত্রিকতায়, পেষণে যা অতীতের বস্তু, পুরাকালীন সেই বীরত্বের প্রয়োজন পুনরায় রচনা করতে থাকে মায়া। ধোঁয়ায়, অন্ধকারে, নির্বাসিত অস্তিত্ব বীর হতে চায়, প্রকাশ চায়। এই উপাদান ত তার শরীরে, রক্তে ছিল বংশানুক্রমিক নৃত্যছন্দ। মানুষের যাবতীয় কাজ ও আনন্দে এই নাচ কি প্রাচীন। অথচ 'ও এবার নাচবে কেউ ভাবে নি।'

আবার নেত্যচরণ মহিমা-বর্জিত তুচ্ছ মানুষ। 'বৌয়ের রোজগারে খায়' এই অমোঘ বাক্যাংশে বড় মামুলি সে, সে কি করে বীর হবে, বীর হয়। যদিও নির্দয় অমাবস্যায় তার অস্তিত্ব ফিরে পাওয়া, সে যে আছে তা শরীরে

পেশীতে, পায়ের তলার মাটি ও পারিপার্শ্বিকে আনন্দময় করে তুলতে পারে সেই প্রাচীনত্ব। নির্বাসিত, প্রায়-বিস্মৃত ঐ অশ্ব-শক্তি।

এভাবেই নেত্য চলে যাচ্ছে নৃত্য ছন্দে, আগুন, আগুনের স্রোতে। আগুন স্রোতে সে বুঝিবা অর্জনও করতে থাকে সেই গতি ও ক্ষিপ্রতা যা বায়ু-বেগ-গামী। হয়ত বা তার বিনাশ হয়। সমগ্র কাহিনীতে এই নির্যাতিত স্বপ্নের মুক্তি-ছন্দ ও প্রহার, ফলে বিমূর্ত। প্রায় কোনো কাহিনী নেই, যা আছে সেটুকু তথ্য, কয়েকটি অসম্মানজনক সন্ধি (আধুনিকতা), যার শর্ত মেনে নেওয়া। যার শর্ত গ্লানি ও অপাবগতা বিস্মৃত হওয়া—সেখানে এই স্বপ্নটি অনিবার্য। গেঁথে নিয়েছে কাল, পুরাণ-সম্পর্ক, অথচ এমনকি স্বপ্নেও কোনো পলায়ন নেই, যে-জন্যে স্বপ্নটি ঐ পৌরাণিকতা বারবার গড়ে ওঠে ও ভেঙে যায়। যুগপৎ তা মায়া ও বাস্তব বলে বড় অনাশ্রিত আমরা।

কলকাতায় এক লেখকের খোঁজে

অরুণ কৌল

তাঁকে আমি কখনো দেখি নি। দেখার, পরিচিত হওয়ার সুযোগ একবার এসেছিল, কিন্তু এক বন্ধুর কৃপায় তখন হয়ে ওঠে নি। এর দিনকয়েক পরেই আমাকে বোম্বাই-এ ফিরে যেতে হয়েছিল। কয়েক মাস পরে আবার এলাম। কিন্তু আমি এখানে পৌঁছবার ঠিক তিনদিন আগে তিনি চলে গেছেন। আর আমি এখন এই মহানগরীতে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

খুঁজতে বেরিয়ে প্রথমেই আমি পৌঁছে যাই তাঁর বাড়িতে, নিউ আলিপুরে এক বাংলোর মতো বাড়ির পেছনের অংশে যেখানে তাঁর পরিবার এখনো বাস করেন। আমার সঙ্গে দুই বন্ধু। শীতের রোদ, সন্ধ্যা হতে তখনো একটু দেরি, বাতাস তখনো স্বচ্ছ—আশপাশের বসতিতে কাঁচা কয়লা, ঘুঁটে আর কাঠের উনুনের ধোঁয়া ছড়াতে শুরু করে নি তখনো। আমরা তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করলাম। সাধারণ ঘর, সাধারণ আসবাবপত্র। আমার সঙ্গের বন্ধুরা এখানে যাতায়াত করেন, তাঁরা বেশ সহজ। আমি প্রথম এসেছি বলেই হয়তো ঘরটা একটু অন্ধকার অন্ধকার ঠেকে। কেমন শান্ত, নীরব নিঃশব্দ—অদ্ভুত এক গুমোট, উদাসীন ভাব। ঘরের ভেতরে আর বাইরে কত তফাৎ।

ষোল-সতেরো বছরের একটি মেয়ে আমাদের যত্ন করে বসায়। সম্ভবত বাড়ির লোকেরা জানেন আমি বোম্বাই থেকে এসেছি। মেয়েটি আমাকে প্রণাম করে। বাবার বন্ধু—বাইরে থেকে এসেছেন তাঁকে সম্মান দেখানোটা

আগে হলে হয়তো আমার ভালো লাগত। কিন্তু এখন, এই পরিস্থিতিতে অস্বস্তি হয়। মেয়েটি বলে, শান্ত ধীর কণ্ঠস্বর, পরিমিত শব্দ, 'না, মা এখনো ফেরে নি, দাদুর শরীর ভালো নেই, তাঁকে দেখতে গেছে··বাবার কাগজপত্র মা গুছিয়ে রেখেছে, কিন্তু তার মধ্যে কোনো নোটবই আমি দেখি নি।' একটা পাণ্ডুলিপি দীপেনবাবু হাসপাতালে দেখছিলেন—কথাবার্তা তাই নিয়েই।

আমি ভাবতে থাকি, মানুষটা তিনি কেমন ছিলেন, চেতনার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, হাসপাতালে শুয়ে শুয়েও যিনি কাজ করে গেছেন। জানা যায় তাঁর অবস্থা খারাপের দিকে যাওয়ার পর তাঁকে যখন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে পাঠানো হয়, তাঁর বালিশ এবং তোষকের নিচে থেকে নানা লেখা। বইপত্র, পাণ্ডুলিপি জড়ো করে একটা পুঁটলি করা হয়েছিল। আমার বন্ধুরা সেই পুঁটলির মধ্যে একটা পাণ্ডুলিপির খোঁজ করছেন।

সঙ্গীরা মেয়েটিকে কি সব বোঝান। চিনুবৌদির (শ্রীমতী চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়) জন্যে একটা চিরকুটও লেখেন। আমি গোটা ঘরটা, ঘরের উদাসীন গুমোট পরিবেশ এক নিঃশ্বাসে পান করতে চাই। এই নিশ্চয়ই সেই তক্তপোষ যার ওপর তিনি বসে থাকতে থাকতে শুয়ে পড়তেন, শুয়ে থাকতে থাকতে কাত হয়ে উঠে বসতেন। শরীরের কষ্ট, হাড় আর মাংসপেশীর ব্যথা, গ্রন্থির যন্ত্রণা, কাশির দমক, ক্ষীণ শরীর এই তক্তপোষের ওপর—এইটেই হয়তো ছিল তাঁর কর্মভূমি। এই হয়তো তাঁর ধর্মক্ষেত্র। এই চেয়ারগুলোতেই নিশ্চয়ই সকালসন্ধ্যায় এসে বসতেন তাঁর সাক্ষাতকারীর দল—সাহিত্যকার, কবি, নাট্যকার, অভিনেতা, চিন্তাবিদ, গায়ক—তাঁর অনেক ভক্ত—সম্ভ্রান্ত, সর্বহারা, শ্রমজীবী—সবাই। মৃত্যুকে যিনি নিয়ত তাচ্ছিল্য করতেন সেই দীপেন্দ্রনাথ হয়তো এখানে বসেই সবাইকে জীবনের সঙ্গে লড়াই করার, ঠিকভাবে বাঁচার উৎসাহ যোগাতেন। আমি এমন অনেক মানুষের দেখা পেয়েছি দীপেনবাবু যাঁদের প্রেরণার স্রোত ছিলেন—শুধু তাই নয়, বন্ধু, সখা, সহযাত্রী এবং আচার্যও ছিলেন। এঁদের অনেকেই দীপেনবাবুর চেয়ে বয়সে বড়।

দীপেনবাবুর বাড়ি থেকে আমরা চলে আসি বন্ধুর বাড়িতে। কাছেই! কিন্তু আমাদের তিনজনকে ঘিরে থাকে এক দমবন্ধ পরিবেশ। সন্ধ্যা নামছে। চারপাশে নীল, কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে কথা-বার্তা চালাবার চেষ্টা চলে। জমে না। একজনকে পরিচয়-এর দপ্তরে যেতে হবে, আমি তাকে বাস স্টপে পৌছতে যাই।

দীপেনবাবুকে চেনার জন্যে আমাকে পরিচয়-এর দপ্তরে যেতে হয়। মহাত্মা গান্ধী রোডের এক বাড়িতে, চাপা গলির মধ্যে দিয়ে দোতলায় উঠে যাই আমরা। পাশের ঘরে উচ্চকণ্ঠের কলরব, ইংরিজি মেশানো বাংলা আর বাংলা মেশানো ইংরিজিতে বাকযুদ্ধ। কলকাতার স্কুলশিক্ষক, কলেজের লেকচারার ও প্রফেসরদের সমিতি।

তার ঠিক সামনে শান্ত একটি ঘর। ধুলোয় ধূসর। মাকড়সার জালে ঘেরা, মলিন দরজা-জানলা—'পরিচয়'-এর দপ্তর। একদিকের দেয়ালে দু-তিনটে র‍্যাক, কয়েকটি আলমিরা তার ভেতরে ইতিহাস—প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে যে-পত্রিকাটি বাংলা-সাহিত্যের দর্পণ আর দিগদর্শনের ভূমিকা পালন করেছে সেই 'পরিচয়'-এর নানা সংখ্যা। সময়ে আর ধুলোতে ক্ষয়ে যাওয়া নানা সংস্করণ।

দরজা পেরিয়ে ঘরে পা দিতেই উলটো দিকের দেয়ালে কালো একটি পোস্টার—সাদা রঙের সুন্দর হরফে দীপেন্দ্রনাথের প্রতি ছোট্ট শ্রদ্ধাঞ্জলি। অন্যদিকের দেয়ালে বেঁটে একটি আলমিরার ওপর গোর্কির ছোট্ট একটি মূর্তি—প্লাস্টার অফ প্যারিসের—কোনোদিন হয়তো তার রঙ ছিল সাদা। তার ঠিক ওপরে কোনো শিল্পীর আঁকা লেনিনের ছবি। পাশের দেয়ালে তিনটি ছবি, সাদায় কালোয়, রবীন্দ্রনাথ—সাদা ঢেউতোলা দাড়ি, সুবিন্যস্ত কেশরাশি, মাঝখানে তরুণ কবি সুকান্ত—দু'চোখে অদ্ভুত দীপ্তি, তার পাশে মাঝবয়সী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—একই সঙ্গে সময়ের মার আর দৃঢ় আত্মবিশ্বাস তাঁর মুখে। একই সময়ে একই সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে বাংলা সাহিত্যের তিন ধারা। পরস্পরের থেকে কত পৃথক আবার পরস্পরের কত পরিপূরক—ক্ল্যাসিকাল রবীন্দ্রনাথ, ঘোর বাস্তববাদী মাণিকবাবু, তাঁদের মাঝখানে যৌবনের অনির্দিষ্ট আবেগ, অদম্য আশাবাদ আর বিপ্লবের বার্তাবহ সুকান্ত—'তারপর হব ইতিহাস'।

তার ঠিক নিচে টেবিলে একটি ছবি—দীপেন্দ্রনাথের। এখনও টেবিলের ওপরেই আছে, কিছুদিন পরেই হয়তো দেয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হবে। টেবিলের সঙ্গে একটি চেয়ার—এখনো খালি। দীপেন্দ্রনাথ বসতেন চেয়ারটিতে। চারপাশে ছড়ানো দু-একটা টেবিল, খানকয়েক চেয়ার, কয়েকটি বেঞ্চি-বৃত্তাকারে বসে আছেন কয়েকজন মানুষ। এঁরাই দীপেনবাবুর সহকর্মী, সমকালীন লেখক, বন্ধু। শুনেছি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাতে তিনি লিখতেন না, তাদের থেকে দূরে দূরেই থেকেছেন। এঁদের

হালও তাই। ছোটখাট শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, কলেজের অধ্যাপক, বেসরকারি দপ্তরের চাকুরিওয়ালা। জনাকয়েক মহিলাও আছেন। মনে হয় 'পরিচয়' নিছক একটি মাসিকপত্রই নয়, 'পরিচয়' একটা আন্দোলন।

এখানে সকলেই শান্ত, স্থির, সহজ। মাঝেমাঝে হাসিঠাট্টাও শোনা যায়। এঁদের মধ্যে এক অদ্ভুত সচেতনতা আছে, পরস্পরের প্রতি আছে এক ধরনের সৌহার্দ এবং আপনতাবোধ। কথাবার্তা বাংলাতেই চলে, আমি এখন অল্পস্বল্প বুঝতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু পটভূমি জানা না থাকায় অনেক কথাই ধরতে পারি না। মাঝেমাঝেই দীপু, দীপেনদা, দীপেনবাবুর উল্লেখ—ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে। কিন্তু এঁদের কথাবার্তা শুনে একথা একবারও মনে হয় না, এঁরা কেউ তাঁর অন্ধ ভক্ত বা উপাসক। বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে তিনি থাকলে কি করতেন এবং এখন আমাদের কি করা উচিত—এই নিয়েই আলোচনা।

টেবিলের ওপর দীপেনবাবুর ছবি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সাধারণ চেহারা, দাড়িতে আবৃত মুখ। চোখ দুটি যেন একটু বেশি বড়—হয়তো ফ্ল্যাশবালবের কল্যাণে, যেন বিস্ফারিত। চোখ দুটি বুঝি শুধু চোখ নয়, মানসচক্ষু—যেন তিনি নিজের প্রজন্ম, বন্ধুকুল এবং সময়ের ওপর ঠিক ঠিক নজর রেখে চলেছেন।

পরিচয়-এর মহ্‌ফিল শুরু হয় সন্ধ্যে ছ-টা নাগাদ। বাংলাভাষার আড্ডা শব্দটিই বেশি উপযুক্ত। সম্পাদকীয় বিভাগের সব কাজই অবৈতনিক বিনে পয়সায় খাটতে কারো কোনো কষ্ট হয় এমন আভাসটুকুও আমি পাই নি। অন্যরা আসেন সাহায্য করতে, কিন্তু তার তেমন প্রয়োজন হয় না। আলোচনা, চর্চা চলে নিয়মিতই, তার কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নেই, নির্দিষ্ট পদ্ধতিও কিছু নেই, কথাবার্তা শুরু হতে পারে যে-কোনো জায়গা থেকেই, আলোচনা-কারীদের যে একমত হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। কোনো সিদ্ধান্ত বা আনুগত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও নেই, কোনো প্রস্তাবও পাস হয় না।

আমাকে বলা হয়েছিল দীপেন ছিলেন ক্ষুদ্রাকৃতি। এ-ও বলা হয়েছিল, শরীরের সীমাবদ্ধতাকে তিনি কখনোই বাধা বলে মানেন নি। এবং এই না-মানার ব্যাপারটাও ছিল কোনপ্রকার প্রয়াসহীন, সম্পূর্ণ অনায়াস। শুনেছি সাহিত্য এবং বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চতা ছিল বিপুল। নিজের শারীরিক অক্ষমতা অথবা শরীরের ভেতরে ক্রমাগত বাড়তে থাকা রোগ-ভোগ—কোনোটাই তাঁকে কাবু করতে পারে নি। এইসব কথা আমাকে

বলেছিলেন বাংলা ভাষার এক নবীন গল্পকার। তখন মধ্যরাত্রি, শেষ বাস চলে গেছে, কলকাতার রাস্তায় খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে হিন্দি-ইংরিজি মিশিয়ে অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন তিনি, খেয়ালই নেই বাড়ি ফিরবেন কি করে। তাঁর সব কথা আমি বুঝেছি কিনা জানি না, তবে তাঁর প্রতি তৃতীয় বাক্যে একবার করে দীপেনদা আসার কারণটা অনায়াসে অনুভব করছিলাম তাঁর চোখের মণির দীপ্তিতে।

দীপেনবাবু কতটা ক্ষুদ্রাকৃতি ছিলেন টেবিলের ওপর রাখা ছবি থেকে বোঝা যায় না। কিছুদিন পরে তাঁর আরো কিছু ছবি দেখার সুযোগ পেয়ে—একটি বিশেষ সংখ্যার জন্যে ছবিগুলি সংগৃহীত হয়েছিল—তাঁর শরীরের মাপ সম্পর্কে একটা আন্দাজ করতে পারলাম। সাধারণ আকৃতির একটা মানুষ চেয়ারে বসলে যতোটা, ততোটাই লম্বা ছিলেন তিনি। আমি সেইসব সভা-সমাবেশের ছবিও দেখেছি যেখানে দীপেনবাবু বক্তৃতা করেছেন অথবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সেই ছবিটিও দেখলাম, চিলির শহীদ আলেন্দের পত্নীকে তিনি সম্মান জানাচ্ছেন। প্রত্যেকটি ছবিতেই তিনি কতো সহজ!

গোড়া থেকেই শুরু করা যাক। ব্যক্তিগত একটা কাজে আটাত্তরের অগাস্টে আমি কলকাতায় এসেছিলাম। তখন দীপেন্দ্রনাথ এবং পরিচয় দুটো নামই আমার অপরিচিত ছিল। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। পুরনো বন্ধু, বিশ-পঁচিশ বছর বোম্বাই-এ কাটাবার পর কলকাতায় ফিরে এসেছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা সে আমাকে জানাল, যেন একটু ইতস্তত করেই, কলকাতায় সে একটা কাজ নিয়ে পড়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফিল্ম? বলল, হ্যাঁ। কৌতূহল বা হিংসে কোনোটাই আমি অনুভব করলাম না। এক বন্ধু বহুদিন হোঁচট খাওয়ার পর একটা কাজের কাজ করছে দেখলে আর এক বন্ধু যতটুকু উৎসাহ বোধ করে ততটুকু খুশি হলাম। আমি আর-কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে প্রস্তাব করল, চিত্রনাট্য রচনার ব্যাপারে আমি কি তাকে সাহায্য করব? আমি বললাম, 'আমার ওপর তোমার জোর আছে বলে যদি মনে কর তা হলে আর জিজ্ঞেস করছ কেন? আর যদি সে জোর না থাকে আমার কাছে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব রাখ, আমি ভেবে বলব।' সে হেসে ফেলল, অনেক দুঃখ আর কঠিন সংগ্রামের দিন বোম্বাই-এ আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। সে

ছিল এক সহকারী ক্যামেরাম্যান—বেকার, আমি ছিলাম সহকারী পরিচালক—অর্ধবেকার।

গল্পটা কি জানতে চাই। 'গল্পটা বলে বোঝানো যাবে না', সে জবাব দিল, 'তবে নামটা তোমার মনে ধরবে, অশ্বমেধের ঘোড়া।' 'কার গল্প?' দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর।' আগেই বলেছি, নামটা আমার কাছে অপরিচিত। আমি আর-কিছু প্রশ্ন করার আগেই সে তার বাংলামেশানো হিন্দী আর ইংরিজিতে বলল, 'কলকাতার পটভূমিতে দু-জন মানুষের গল্প. এই শহর তাদের না দেয় একসঙ্গে মরতে, না দেয় একসাথে বাঁচতে।' 'গল্পটা ঘটনাপ্রধান নয়?' আমি যেন নিশ্চিত হতে চাই। 'না, কিছু প্রতীক, কিছু অনুভূতি, কিছু প্রতিক্রিয়া—এই নিয়েই গল্প। এইটুকু শুধু বুঝে নাও, একটা বিশেষ দিনে মানুষ দুটি কয়েকটা ঘণ্টা একসাথে কাটাতে চায়, সফর চৌরঙ্গি থেকে খিদিরপুর পর্যন্ত।' 'প্রেমিক?' 'বটেই তো, তবে এখন স্বামী-স্ত্রী-ও, আজ তাদের বিবাহবার্ষিকী।' 'তা হলে?' 'তাদের এই সফর অসফল. দু-জনেই আবার নিজের নিজের ডেরায় ফিরে যায়।' 'তার মানে একসঙ্গে বাস করে না, কোনো অসুবিধা আছে?' .. একটু একটু করে যেন বুঝতে থাকি আমি।

তা হলে এই হল সেই গল্প যা নিয়ে ছবি করার স্বপ্ন দেখছে আমার বন্ধু। বাংলাতে এবং হিন্দীতেও। অগাস্টের সেই ঝিরঝির বৃষ্টির সন্ধ্যায় সে আমাকে তার নিউ আলিপুরের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। লম্বা-চওড়া একটা নকসা এঁকে যাওয়ার রাস্তাও আমাকে বুঝিয়েছিল। নানা চিহ্নের সাহায্যে যতই সে বোঝাচ্ছিল ততই আমার গুলিয়ে যাচ্ছিল। নতুন জায়গায় একলা যেতে আমার বড় অসুবিধা হয়। আমার করুণ অবস্থা দেখে সে বলল, আরো একজন যাবেন। আমি যেন তাঁর সঙ্গেই যাই। রাত্রে ওই বাড়িতেই দীপেনবাবুর সঙ্গেও দেখা হবে। আগেই বলেছি. এই 'আরো একজন'-ই সব গণ্ডগোল করেছিলেন। তিনি নিজে শেষ পর্যন্ত গিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু দীপেনবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার ছিল না, দেখা হল না।

বোম্বাই-এ পৌঁছে বন্ধুর সঙ্গে চিঠি চালাচালি চলল, তার বাড়িতে যেতে না পারার জন্যে আমি দুঃখ প্রকাশ করলাম। ক্ষমাও চাইলাম। সে লিখল, তাতে কি হয়েছে, পরের বার কলকাতায় এলে দীপেনবাবুর সঙ্গে প্রতিদিনই দেখা করতে হবে।

মাসকয়েক পরে উনআশি সালের জানুয়ারিতে কলকাতায় এসে মৃণাল

সেনের বাড়িতে বসে কথা প্রসঙ্গে জানা গেল আমি এখানে যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তিনি আর নেই।

এখন 'অশ্বমেধের ঘোড়া'-র চিত্রনাট্য রচনার কাজ চলছে। এ কাজের ব্যবস্থা দীপেনবাবু হাসপাতালে যাওয়ার আগে করে গিয়েছিলেন। আজকাল যখনই আমরা কোনো জায়গায় এসে আটকে যাই তখন তার মীমাংসা হয় এই কথা দিয়ে যে দীপেনবাবু থাকলে এক্ষেত্রে কি করতেন। নিম্নমধ্যবিত্তদের জীবন নিয়ে লেখা তাঁর অন্যান্য গল্পের পরিপ্রেক্ষিতেও জট ছাড়াবার চেষ্টা করি আমরা। এইসব সময়ে আমার মনে হয় দীপেন আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যান নি। তাঁর ভাবনা, তাঁর বিশ্বাস এবং তাঁর রচিত চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছেই আছেন।

দীপেনের চরিত্র কাঞ্চন বলে, 'আমার আদি ও অকৃত্রিম শত্রু দেখি এতটাই, এই সময়। চরিত্রবান থাকতে দেয় না, চরিত্রহীন হতে দেয় না, ছুঁতে পারি না অথচ প্রতি মুহূর্তে নানা ছদ্মবেশে দেখি।'

চিত্রনাট্য রচনার কাজ করতে গিয়ে মাঝেমাঝেই মনে হয় দীপেনবাবু যেন জীবন ও মৃত্যু উভয়কেই খোঁচা দেন, দিতে দিতে বলেন, আমাকে চেনো বন্ধু, আমি তোমাদের কাছে আছি, তোমাদের সাথেই আছি।

আমি আমার সীমাবদ্ধতা জানি, নিজের দুর্বলতা সম্পর্কেও আমি সচেতন। এ-ও জানি আমার বন্ধুকে আমি আর বেশি সময় দিতে পারব না। কিন্তু আমি তার সাহসের ভেতরে দীপেন্দ্রনাথকে দেখতে পাই এবং হাজার চাইলেও এই দেখা-না-হওয়া বন্ধুকে আমি ফেরাতে পারি না।

দু' মাস হয়ে গেল এই মহানগরীতে আমি দীপেনকে খুঁজছি। আশ্চর্য, আমি তাকে আগে চিনতে পারি নি। সে সত্যিই আমার আশেপাশে, আমার কাছে, আমার সাথেই ছিল—কখনো উৎসাহ হয়ে, কখনো বিশ্বাস হয়ে, কখনো বা বাঁচার ইচ্ছে হয়ে।

দীপেনের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেছে। এখন আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

দীপেন

বিষ্ণু দে

দীপেনের বিষয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা খুব কষ্টকর।

অনেক বছর ধরে আমি ওকে চিনি—কবে থেকে ঠিক মনে নেই। অনেক কাজের ফাঁকে, আমার কাছে প্রায়ই সে আসত, ওর মনের কথা বলত, প্রশ্ন করত, অনেক সময়ে চুপ করে বসেও থাকত। ওর সে চুপ করে বসে থাকাতে কোনো অস্বস্তি ছিল না। অনেক সময়ে, কলেজ থেকে ফিরেছি, দেখি চুপ করে বসে আছে, আমাদের বসবার ঘরে। "আপনি কি খুব ক্লান্ত?" এসে জিজ্ঞাসা করত। আমরা দু-জনে বসে একটু চা বিস্কুট সন্দেশ খেতুম, তারপর ও নিজের প্রশ্ন বা কথা বলত। ওর চরিত্রে প্রচণ্ড দৃঢ়তা ছিল, আবার শিশুসুলভ সহজ-সরলতাও ছিল। একদিনের কথা মনে পড়ে—আমরা একবার এক যুব উৎসবের কবিতা পড়ার আসর থেকে ফিরছি—একটু আগেই, চুপিচুপিই, আমরা বেরিয়ে পড়েছিলুম, ভীড় এড়াব বলে,—মনে করেছিলুম একটু হেঁটে ফাঁকা ট্রাম ধরে বাড়ি ফিরব—হঠাৎ কোথা থেকে দীপেন আমাদের দেখে ফেলে, ধরে ফেলল। একটু ব্যথিত স্বরেই যেন বলল, 'চলে যাচ্ছেন?' আমি বুঝিয়ে বলতে কোনো বাধা দিল না। আরেক সন্ধ্যায়, খুব বড় একটি সভার পর আমরা চলে আসছিলুম, অসম্ভব ভীড় ঠেলেই, অত্যন্ত আবেগ ভরে, দীপেন বলল, 'আপনাকে প্রণাম করতে বড্ড ইচ্ছা করছে।' আমি অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম! এরকম অনেক দিনের, অনেক ছোটখাটো ঘটনা মনে পড়ে।

আমাদের সম্পর্কটা এখন আমার কাছে তাই খুব ব্যথাময় স্মৃতি হয়ে রয়েছে। বিখিয়ায়ও দীপেনের নিয়মিত চিঠি লিখে আমাদের খোঁজ-খবর রাখার কোনো ব্যতিক্রম হয় নি। অনেক সময়ে কোনো বিষয়ে খুব বিচলিত হয়ে আসত, 'আপনার কাছে একটু বসি' বলে, বসত, আলোচনা হত, আমার খুব ভালো লাগত। বিশেষ করে সেই দিনগুলির কথা খুবই মনে পড়ে—দুপুর রোদে, বা সন্ধ্যায়, বা আরো দেরিতে এসে হাজির হতো—রুক্ষ চুল, চেহারা প্রায় পাগলের মতো, মুখে প্রচণ্ড আলোড়নের ছাপ—সেই যখন কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধা-বিভক্ত হলো। তখন, আমি দীপেনকে কি সান্ত্বনা দেবো বা স্তোকবাক্যে বোঝাবো—আমার নিজের মনেই কোনো শান্তি পাচ্ছি না। শুধু আমি দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি, ওর মনে কি প্রচণ্ড আঘাত! সেই আবেগময় মূর্তি আমাকেও প্রচণ্ডভাবে বিচলিত করত। কি করে যে সেই সঙ্কটময় দিনগুলি অতিক্রম করে আবার সে স্থির অবিচল কর্মপন্থায় ফিরে এল জানি না, কিন্তু ওর দৃঢ়তা আমাকে মুগ্ধ করেছে, সর্বদাই।

গত বছর, আমরা যখন রিখিয়া থেকে এসেছিলুম, একদিন সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে হাঁপাতে হাঁপাতে এল। আমরা ওকে দেখে সকলে ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'তোমার তো খুব কষ্ট হচ্ছে হাঁপানিতে!' ও বললো, 'না, ও কিছু নয়, আমি ভালো আছি। আমার খুব আপনার কাছে আসতে ইচ্ছা করছিল ক-দিন ধরে—আজ সময় পেলুম।' কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলুম ওর খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই সেটাও মানল না। ভালো করে বসতেই পারছিল না—ওকে দেখে আমাদেরই খুব কষ্ট হচ্ছিল। বাড়ি যাবার সময়ে নাতিনাতনীদের নিয়ে আমি সঞ্জিতের (আমাদের ছোট জামাই) গাড়ি করে সকলে ওর সঙ্গে ওদের নিউ আলীপুরের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলুম। দীপেন নিজেও খুব খুশী হয়েছিল, আমাদের সকলেরও খুব আনন্দ হয়েছিল।

'৭৮-এর ডিসেম্বরে গোর্কি সদনে নবজীবনের ও জ্যোতিরিন্দ্রের অন্যান্য গানের বইয়ের প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠী যে অনুষ্ঠানটি করেছিলেন, সেইখানেই দীপেনের সঙ্গে আমাদের শেষ দেখা। আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলুম, দীপেন, কেমন আছ? এবং সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখে স্মিত উত্তর—'আমি ভালোই আছি।' সেই ছবিই আমার মনে গেঁথে আছে। তখনও, ওর উত্তরে মনেপ্রাণে ভেবেছিলুম—খুব ভালো, ভাল থাকুক দীপেন। যদিও, আমার মনে সর্বদা আতঙ্ক ছিল, ওর ছোটখাটো শরীরটিতে

কি যে ব্যাধি আছে জানি না, কখন সেটা বেরিয়ে পড়ে তাকে আক্রান্ত করবে। তবু মনের প্রচণ্ড শক্তি সেই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় নি—মনের জোরে ঠেকিয়ে রেখেছে। শত দুঃখগ্লানি কত কষ্ট পেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এবার শরীরটা আর নিষ্কৃতি দিল না—তাকে আমাদের মধ্যে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আমাদের যে কি অসীম ক্ষতি হল, তা কি আমরা নিজেরাই জানি?

অনুলিখিত: প্রণতি দে

দীপেন

মণীন্দ্র রায়

মাস চার-পাঁচ আগের কথা। পরিচয়ে দীপেনের সঙ্গে দেখা। দীপেন সেই সময়ে মারাত্মক একটা রসিকতার কথা বলে। আর তারপর—

না, এর একটু পেছনের কথা আগে বলে নেওয়া দরকার।

দীপেন ছিল আমার চেয়ে পনের বছরের ছোট। তার যখন বছর কুড়ি বয়স, তখন থেকে তার সঙ্গে পরিচয়। কিন্তু প্রথম দিকে আজ্ঞে-আচ্ছা দিয়ে শুরু করলেও সে পরিচয় গত পঁচিশ বছরে সখ্যতায় এসে নোঙর ফেলেছিল। ফলে দীপেনের সঙ্গে দেখা হলে তাকে ইংরেজিতে যাকে বলে টীজ করা, এটা আমার বহুদিনের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর দীপেনও এভাবে পেছনে লাগলে মজা পেত বেশ। কখনো-কখনো ইন্ধনও জোগাত।

তা যে কথা বলছিলাম। পরিচয় অফিসে সেদিন গিয়ে দেখি, রাজগীর থেকে ফিরেছে দীপেন। পুজোর ছুটিতে হাওয়া বদলাতে গিয়েছিল। চেহারাতে তার ছাপ ছিল, বেশ টাটকা সতেজ হাসিখুশি দেখাচ্ছিল তাকে। সে সময়ে আরো কেউ-কেউ ছিলেন সেখানে। সকলের মুখ স্পষ্ট মনে নেই, কিন্তু অমিতাভ দাশগুপ্ত ছিল তা এখনও স্মরণ করতে পারি। উত্তর দিকের বেঞ্চ-এ আমি বসেছিলাম দীপেনের মুখোমুখি, অমিতাভ ছিল আমার বাঁ পাশে। পুরো সেটিং ছিল এই রকমই।

আমি বললাম, এই যে দীপেন, চেঞ্জ-এ বেশ কাজ দিয়েছে দেখছি। খুব ভাল লাগল।

দীপেন বলল, কলকাতায় থেকেও তো আপনার কম কাজ দেয় নি মনে হচ্ছে।

আমি—দেখ, কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া, মোটাকে মোটা বলতে নেই, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলে গেছেন।

সকলে হেসে উঠলেন।

আমি—শোনো দীপেন, একটা জরুরি কথা বলছি। অনুরোধই বলতে পারো। মানে তুমি তো আমাকে দেখতে পাব না, বেঁচে থাকতে তোমার কাছ থেকে ভাল কিছু শুনতে পাব না। কিন্তু একটা কাজ অন্তত করো। আমি যখন মারা যাব, প্রবন্ধ লিখো এ-অনুরোধ করার সাহস নেই, ছোট একটা প্যারাগ্রাফ অন্তত লিখো।

দীপেন হাসল। হাসতে হাসতে বলল—আপনাকে যে কত শ্রদ্ধা করি বোঝাতে পারি নি দেখছি।

আমি—সে জানি। কিন্তু শ্রদ্ধার কথা তো বলি নি। আমি বলছিলাম ভালোবাসার কথা। ভালো তুমি আমাকে মোটেই বাসো না।

দীপেন বলল—সময় পেলে লিখে জানাব। কিন্তু এবার বলুন ত, আমি মারা গেলে আপনি কি লিখবেন?

ছি দীপেন, ও-রকম কথা বলতে নেই—আমি এবং আমরা সকলেই প্রতিবাদ করে উঠলাম একসঙ্গে। যদিও জানি ঠাট্টা। তবু কেমন যেন বেসুরো শোনাল দীপেনের কথা। হয়তো নিজেকে নিয়ে কখনো কিছু বলত না, সেজন্যেই আরো অস্বাভাবিক লেগেছিল। আমি তো বেশ একটু ধমক দিয়েই বলে উঠেছিলাম, ও-রকম বলতে নেই। বিশেষ করে বড়দের কাছে। তাতে তাদের অপমান করা হয়।

দীপেন কিন্তু প্রতিবাদ করল না। এমনিতে খুব কম কথা বলত। কিছু না-বলে চোখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

তারপর মাসখানেকও পার হল না। বড় বিশ্রী ভাবে সত্যি হয়ে গেল দীপেনের রসিকতা। আর সেই থেকে মাঝেমাঝেই যেন দীপেনের সেই তাকিয়ে থাকা দেখতে পাই।

কিন্তু দীপেন, কী লিখি বল তো? তোমার সঙ্গে আমার লেখালেখির ব্যাপার ছাড়াও অন্য সম্পর্ক ছিল। নিউ আলিপুরে আমি যখন তোমার প্রতিবেশী ছিলাম, দিনের পর দিন আমরা গল্প করেছি। হয় তুমি আসতে

আমার কাছে, নয়তো আমি যেতাম। তখনো তোমার বিয়ে হয় নি। কিন্তু চিন্ময়ীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল বোধহয় এর আগেই। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক দেখতাম। তাই নিয়ে ঠাট্টা করেছি, তুমিও অপ্রস্তুত ভাবে হেসে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে। সেই থেকেই শুরু অসমবয়সী আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব। আর তারপর ৫৯ সালের সেই রক্তক্ষরা দিনে, হাজার-বারো শ মানুষকে যখন পিটিয়ে মারা হল, সারা সন্ধ্যা, রাত প্রায় বারোটা অবধি, তোমার কী ক্রোধ আর যন্ত্রণা, যন্ত্রণা আর অভিশাপ। বয়সের চেয়ে অনেক অনেক বেশি বড় হয়ে গিয়েছিলে সেদিন তুমি। মানুষের জন্যে তোমার ঐ ভালোবাসা দেখে মাথা নুইয়েছিলাম। পরিচয়ে বসে তুমি শ্রদ্ধার কথা বলেছিলে না? তুমি জানতে না, তোমার জন্য আমার যে ভালোবাসা, সেও ছিল অনেকটা শ্রদ্ধারই মতো।

আমি জানি, এইসব ব্যক্তিগত স্মৃতি আমার সঙ্গেই শেষ হবে। কিন্তু আমার মতো আরো অনেকেরই মনে তুমি যে আত্মসম্ভ্রম জাগিয়েছ, সংক্রামিত করেছ মানুষের জন্য ভালোবাসা, তার কোনো ক্ষয় নেই। তোমার প্রতিদিনের কাজে, তোমার কর্তব্য করে যাওয়ার নিষ্ঠায়, তুমি নতুনদের সামনে আদর্শ। আমার দুঃখ হয়, তুমি বেশি লিখলে না বলে। লিখলে তুমি আরো অনেক খ্যাতি পেতে, হয়তো টাকাও। কিন্তু যখন ভাবি সাহিত্য রচনা আর দৈনন্দিন জীবন দুটোই ছিল তোমার একই বিশ্বাসের দুটি দিক, তখন আর ক্ষোভ থাকে না। কারণ আমি বুঝতে পারি, তুমি কোনো টবের গাছ ছিলে না। তুমি ছিল পাথুরে মাটির শালগাছ। তোমার যতটা লড়াই ছিল মঞ্জরী ফোটানোর দিকে, ততোটাই ছিল মাটির গভীরে শিকড় ছড়িয়ে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে। সাহিত্যে স্মরণীয় হবার দৃষ্টান্ত আরো অনেক আছে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক ক্ষমতা নিয়ে জন্মে, কাজের জন্য তোমার এই আত্মদান—এর তুলনা সহজে মিলবে না। আমি অবাক হয়ে যাই দীপেন, তোমার ঐ কোমল মনের মধ্যে এতখানি জোর তুমি কী করে পেলে।

সেও কি তোমার ঐ মানুষের জন্য ভালোবাসায়।

দীপেন

মৃণাল সেন

দীপেনের এক নতুন পরিচয় পেলাম দীপেনের স্মৃতিসভায়।

কথায়, লেখায়, প্রাত্যহিক আচরণে অথবা অখণ্ড আড্ডার আসরে কিংবা হালকা হাসির হিড়িকেও কখনোই দীপেনকে ওর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য ভেঙে বেরিয়ে আসতে দেখি নি। অবশ্যই, স্বাচ্ছন্দ্যের খামতি কখনো পাই নি তার মধ্যে, কিন্তু, যে-কোনো কারণেই হোক, সবসময়েই মনে হয়েছে মানুষটা যেন ভয়ানক ইন্‌টেন্‌স। অন্তত আমি তাই দেখেছি। কিন্তু সেদিন ওর স্মৃতিসভায়, স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে যখন ওর কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ পড়িয়ে শোনানো হচ্ছিল তখন, একসময়ে, দীপেনের একটি অপ্রকাশিত এবং হয়তো বা খানিকটা লুকোনো লেখায় এসে প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আত্মকথনের মতো একটি লেখা, যা সিদ্ধেশ্বর সেনকে দিয়ে পড়ানো হয়েছিল, যে কথনটি শুরু হয়েছিল একটি 'লোক'-কে নিয়ে, যার নাম দীপেন, যে নামটিকে নানা ভাবে বানান করা যায়, বানানের ফারাকে যে নামের অর্থ পালটে যায়, অর্থ পালটাতেই, স্বভাবতই, একের মধ্যে বহু-র এবং হয়তো বা নানা বিরোধিতার সমারোহ ঘটে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আপাত হালকা চালে, সরস ঢং-এ নিজেকে নিয়ে যে এ-ভাবে নেড়ে-চেড়ে দেখা এবং রসিকতা করা চলে এবং এই অসামান্য আটপৌরে এবং আলগা সরসতার মধ্য দিয়েও যে এক স্থির প্রজ্ঞায় পৌঁছানো সম্ভব, আজকের

দলবদ্ধ ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালরা তা প্রায় ভুলেই বসেছেন। দীপেনের অপরিপূর্ণ জীবদ্দশায় আমিও দীপেনকে এঁদেরই একজন মনে করেছিলাম—শিক্ষিত, মার্জিত, তীক্ষ্ণধী এবং অবশ্যই শিল্পের রাজ্যে নিত্যনতুন আবিষ্কারের নেশায় উদ্বেল। কিন্তু সেদিন, স্মৃতিসভায়, যা শুনলাম, দীপেন নামক একটি 'লোক'-এর আত্ম-ব্যাখ্যানে, তা আমাকে এবং হয়তো উপস্থিত আরো অনেককেই চমকে দিয়েছিল, মুগ্ধ করেছিল। সেদিন, সেই মুহূর্তে, অনুপস্থিত দীপেনের মধ্যে আন্দাজ পেয়েছিলাম এমন এক বিশিষ্টবোধের যে বোধ আজকের ইন্টেলেকচুয়াল পরিমণ্ডলে প্রায় দুর্লভ।

বেঁচে থাকতে দীপেন আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে গেছে। মৃত্যুর পরে স্মৃতিসভাতেও শেখাল। হাজার কারণে দীপেন আমাদের শিক্ষক এবং অবশ্যই বন্ধু।

পুনশ্চঃ আমার এই সশ্রদ্ধ লেখাটুকু পরিচয়-এর ধুলি-ধূসরিত অগোছালো দপ্তরে পৌঁছোবে, কিন্তু দীপেনের হাতে নয়। ভাবতেও কেমন অবশ লাগে।
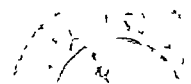
দীপেন্দ্রনাথ ঃ আন্দোলন ও সংগঠনে

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

দীপেন্দ্রনাথের সঙ্গে যেদিন আমার দেখা হতে পারত সেদিন হয় নি। কলেজ শুরু হওযার পর প্রথম দিকে দিনকতক আমার যাওয়া হয় নি। তাঁকে জানানো হয়েছিল আমি ভর্তি হয়েছি, আমাকেও বলা হয়েছিল কলকাতায় পৌঁছেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। যোগাযোগ হল এবং অবিলম্বেই আত্মীয়তাও। কমিউনিস্ট পার্টির কেউ হলে দীপেন্দ্রনাথের আত্মীয় হতে বেশিক্ষণ লাগত না, যেমন হয় কমিউনিস্টের বেলায়। কিংবা হয়ত বলা উচিত—যেমন হওয়ার কথা, যেমন হত তখন।

স্কটিশে ঢুকে দিনকযেকের মধ্যেই বোঝা গেল দীপেন্দ্রনাথ একটা ব্যাপার। তিনি কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন না, এমনকি ক্লাস থেকে নির্বাচিত সাধারণ প্রতিনিধিও না—এবং তখন কলেজ থেকেও বেরিয়ে গেছেন, তবু তাঁর ছায়া কিছুতেই পার হয়ে যাওয়া যায় না।

পঞ্চাশের দশকের একেবারে গোড়ায় কলেজের ছাত্র ফেডারেশন এবং পার্টি ইউনিট ভেঙেচুরে গুলিয়ে যায়। তারপর একজন দু-জন কমিউনিস্ট এসেছেন ডাইনে-বাঁয়ে হাতড়েছেন, বড় একটা এগোতে পারেন নি। তিপান্ন নাগাদ তাঁরা স্টুডেন্টস হেলথ হোমের আন্দোলন নিয়ে এলেন কলেজে, দলও পাকালেন খানিকটা। পরের বছর চুয়ান্ন সালে, দীপেন্দ্রনাথ এলেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে, বি-এ পড়তে। তিনি আসার আগেই তাঁর নাম এসে পৌঁছে গিয়েছিল, লেখকের নাম। ভূগোলটা পালটে গেল। ছাত্র ফেডারেশনের

সদস্য করা শুরু হল, সম্মেলন করে কমিটি হল, কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কলহ করে দেয়ালপত্রিকা বেরল এবং স্টাফরুমের গায়ে অনার্স লাইব্রেরিটা ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের ঠিকানায় পরিণত হল। সবচেয়ে বড় কথা, প্রথমে পার্টির এ. জি. এবং পরে সেল গড়ে উঠল। এই সেলেই দীপেন্দ্রনাথ পার্টি সদস্যপদ পান। মজার কথা, সেই বছরই, চুয়ান্ন সালেই, ভারতসভা হলে সভা করে অতুল্য ঘোষমশাই-এর প্রেরণায় ছাত্রদের-রাজনীতি-করা-উচিত-নয়-এর দল জন্ম দিল ছাত্র পরিষদের—কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন।

এইসবের পর, বছর দুয়েকের মধ্যেই স্কটিশ চার্চ কলেজে নির্বাচনে জিতে ছাত্র ইউনিয়ন দখল করে নেয় ছাত্র ফেডারেশন। পার্টির ইউনিটও অনেক বড় হয়, প্রভাব প্রতিপত্তিও বাড়ে। আমরা অনেকেই এই পর্যায়ে নানা কাজে ও দায়িত্বে ব্যস্ত থেকেছি, কিন্তু আসল কথা হল দীপেন্দ্রনাথের সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁর হাতে গড়া সংগঠনের জের—এই ছিল দুই মূলধন যার ওপর ভিত্তি করেই সব বাড়বাড়ন্ত।

কি বিষয়ে মনে নেই, স্কটিশের গেটে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে নামতেই, হিন্দুস্থানি দারোয়ান—লম্বাচওড়া চেহারা, মোটা গোঁফ—একটা জানলা দেখিয়ে আমাকে বলছিল,

আপনাদের নেতা, দীপেনবাবু এইখানে দাঁড়িয়ে একবার এক ভাষণ দিয়েছিলেন·····

ঘটনাটা পরেও অনেকবার শুনেছি—পুরোন ছাত্রদের কাছে, দীপেন্দ্রনাথের সহপাঠী কমরেডদের কাছে, কোনো-কোনো অধ্যাপকের কাছে, এমন কি ডঃ টেইলর—রাশভারী প্রিন্সিপ্যাল—যাঁর সঙ্গে আমাদের প্রায় প্রতিদিনই খিটিমিটি লেগেই থাকত, তাঁর কাছেও। কলেজের একদল ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছিল, স্থানীয় কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে। আর-এক দল বিরোধিতা করছিল। ছাত্র ফেডারেশন তখন তেমন কিছু শক্তিশালী নয়। তবু তারা এক তৃতীয় অবস্থানে দাঁড়াল। তারা ধর্মঘটের পক্ষে নয়, আবার ধর্মঘট ভাঙারও বিরুদ্ধে। ঠিক হয়েছিল নিজেদের কথা গেটে দাঁড়িয়ে বলা হবে। দলের সবাই দাঁড়িয়ে বক্তৃতায় এবং স্লোগ্যানে জানিয়ে দিচ্ছিল ছাত্র ফেডারেশনের বক্তব্য, জানাতে জানাতে অসীম মজুমদারের গলা থেকে হঠাৎ রক্ত পড়ল। তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল সবাই। এই ফাঁকে অন্য দুই দলে হাতাহাতি, ঘুষোঘুষি, তারপর পাথর আর ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি। মুহূর্তে কলেজটা যুদ্ধক্ষেত্র। হঠাৎ সবাই বিস্মিত হয়ে দেখল, সেই যুদ্ধের মধ্যে

দীপেন্দ্রনাথ লাফ দিয়ে জানলায় উঠে 'বন্ধুগণ' বলে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছেন আকাশের দিকে—যেখান থেকে পাথরবৃষ্টি হচ্ছে। 'আমাকে না মেরে, মেরে না ফেলে, কলেজের কোনো ছাত্র, কোনো ছাত্রীর গায়ে হাত দেওয়া যাবে না, আমি দিতে দেব না।' যেন নির্দেশ, অমোঘ, গোলমাল থেমে গেল।

কেন থামল? কি করে থামাতে পারলেন দীপেন্দ্রনাথ?

একেবারে এক না হলেও অনেকদিন পরে একই রকম পরিস্থিতি হয়েছিল শিল্পীসাহিত্যিকদের এক সর্বভারতীয় সম্মেলনে। প্রবল গোলমালে সব গুলিয়ে যাওয়ার দশা। দীপেন্দ্রনাথ লাফ দিয়ে মঞ্চে উঠে মাইকটা টেনে নিয়ে ডাকলেন ফ্রেণ্ডস্। কয়েক মিনিটের বক্তৃতা, সভা আবার শান্ত, সম্মিলিত হল। বিভিন্ন সময়ে দেশের হয়ে সাহিত্যিকদের নানা আন্তর্জাতিক সভাতে যোগ দিয়েছেন তিনি। স্কুল ছাড়ার পরেই যান পূর্ব বাংলায়, তখন পূর্ব পাকিস্তানে, পরে একবার সোভিয়েতে একবার লেবাননে। নানা তর্ক-বিতর্কে বাতাস গরম হতে হতে বেইরুটের সম্মেলন প্রায় ভেঙে যাওয়ার অবস্থা হয়। দীপেন্দ্রনাথ বিশেষ অনুমতি নিয়ে মাইকে দাঁড়ান—মিনিট কয়েকের জন্যে। সম্মেলনটা রক্ষা পায়। কি করে পারতেন তিনি? অথচ তিনি এমন কিছু বক্তা ছিলেন না। তাঁর কি কোনো গোপন মন্ত্র জানা ছিল? তাঁর আবেদনের সততা আর আন্তরিকতা, তাঁর স্বভাবের নিষ্ঠা আর তাঁর চাওয়ার মধ্যে যে প্রবল প্রাণের টান—তারই জন্য?

* * *

দীপেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আগের বছর ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে ছাত্র ফেডারেশনের হার হয়েছিল, অনেক বছর পরে। তাঁর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা এলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ছাত্র আন্দোলনের নেতা, হয়তো তাঁর চেয়ে বড় নেতাই। সে বছর ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে প্রচারের সবকিছুই —পদ্ধতি, ভঙ্গি আর মেজাজ—একেবারে পালটে গেল। গালমন্দ র জায়গায় শোনা গেল ব্যঙ্গ কবিতা, খেউড়ের বদলে আঁকা হল কার্টুন, ছবিতে কবিতায়-ছড়ায় ভরে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের লন, আড়াল হয়ে গেল প্রাচীন বিনিতি তালের মোটা মোটা শরীর। অবস্থা এমন দাঁড়াল, যাঁদের জন্যে প্রচার তাঁরা তো বটেই যাঁদের জন্যে নয় তাঁরাও এসে ভিড় করতে লাগলেন। স্টেটসম্যানে ছবিসহ রিপোর্ট বেরলো সেই প্রচারের। ছাত্র ফেডারেশনের জয় হলো। দীপেন্দ্রনাথ পর পর দু বছর ক্লাস থেকে জিতলেন, স্ট্যাণ্ডিং কমিটির

সদস্যও নির্বাচিত হলেন। দ্বিতীয় বছর প্রথম কলেজ স্ট্রিট অটোনোমাস ইউনিয়ন সংগঠিত হলে তিনি তার সভাপতি হলেন। এর মধ্যেই হলো বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান, তাতেও তিনি। সাতান্ন সালে সাধারণ নির্বাচনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে পার্টির প্রার্থী মহম্মদ ইসমাইলকে যাঁরা বৌবাজার থেকে প্রায় জিতিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি তাঁদেরই একজন। কলা-বাগানের বস্তি অঞ্চল তোলপাড় করার কাজে তিনি তাঁর পুরোন কলেজ স্কটিশের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দল বেঁধেছিলেন।

তখন তিনি শুধু সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরই নন, সংগঠনেরও নেতা, ছাত্র ফেডারেশনের কলকাতা জেলা কমিটির সহ-সভাপতি, রাজ্য কমিটির সদস্য। কথাটার মানে বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে, এই কমিটির নেতৃত্বেই তখন কলকাতা এবং সমস্ত জেলার দু-একটি ছাড়া প্রায় সব কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে জিতে দখল করে নিয়েছিল ছাত্র ফেডারেশন। কিন্তু দীপেন্দ্রনাথের প্রধান বিবরণ ক্ষেত্র তখনো শিল্প-সাহিত্য। পথের পাঁচালির পাঁচালির পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে সম্বর্ধনা জানানো হলো সেনেট হলে। খুবই বড় মাপের বড় ব্যাপার, সেই সময়ে অভিনবও বটে। সাজানো হলো হল, বাতাসে রুচি আর স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পরিচালিত হলো অনুষ্ঠান। অমন অনুষ্ঠান তার পরেও কলকাতা শহরে আর বড় একটা হয় নি। পথের পাঁচালি দিয়ে শুরু। দীপেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলির একটি হলো 'জন-অরণ্য' নিয়ে। দ্বিতীয় ঘটনা দীপেন্দ্রনাথ সম্পাদিত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের মুখপত্র 'একতা-'র প্রকাশনা। একতা-র কাছে পাঠকদের চিরকালই কিছু প্রত্যাশা থাকে। সেবারের সংখ্যাটি সব প্রত্যাশার সীমা ভেঙে দিল। পরিকল্পনার সাহসে, লেখার মানে, শ্রম আর যত্নের প্রমাণে। সম্পাদনার কাজে তিনি চিরকালই—বাল্যকাল থেকেই—সিদ্ধহস্ত। কাজটা তাঁর প্যাশন। একেবারে ছোটবেলায়, রোগশয্যা থেকেও, একদিকে যেমন নিজের লেখা লিখেছেন, তেমনি সম্পাদনা করেছেন নিজের পত্রিকা—সবুজের অভিযান। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ে বের করেছেন উজান। কিন্তু 'একতা'-র সম্পাদনাতেই পরিণত, পরিপক্ক একজন সম্পাদক এসে দাঁড়ালেন সামনে, যাঁকে ক্রমাগত এগিয়ে যেতেই দেখা গেল পরের যুগে 'পরিচয়'-এর সহসম্পাদক হিশেবে, যৌথ ও একক সম্পাদনার দায়িত্বে, শারদীয় 'কালান্তর' ও নানা ধরনের সংকলন সম্পাদনার কাজের মধ্যে দিয়ে। প্রায় বিশ বছর ধরে এই কাজে তিনি যে-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তা অনায়াসেই

তাঁকে বাংলা পত্রপত্রিকার শ্রেষ্ঠ সম্পাদকদের সারিতে স্থান করে দিয়েছে।

ছাত্রজীবন শেষ হতে না হতেই দীপেন্দ্রনাথ যুব আন্দোলনে অংশ নিতে শুরু করেন। তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল যুব উৎসবের স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ। তখনকার সেই স্মারকগ্রন্থগুলি দেখলে বোঝা যায় স্বল্প-পরিসরে দীপেন্দ্রনাথ একটি স্মারকপত্রকেও সাহিত্য মর্যাদায় উন্নীত করতেন।

ছাত্র আন্দোলন থেকে শিল্প-সাহিত্য, দীপেন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা ও অধিকারের বাইরে কোনোটিই নয়, সঙ্কল্প ও কর্তব্যের বাইরে কিছুই নেই।

হয়তো এইসব কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছাত্রনেতা হলেও, তখনকার কথা মনে করতে গেলে অনেক ছবির মধ্যে তাঁর একটা ছবিই দেখতে পাই। অল্প আলো, অল্প অন্ধকার, হিম পড়ছে, বাতাসে শীত। প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের কাছে উঁচু লরি, লরিতে খাট, খাটভরা ফুল, ফুলের ভেতর শুয়ে আছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন দীপেন্দ্রনাথ, খাটের কোণ ধরে, 'মেহগনির পালঙ্ক।' আমাদের মালা তিনি হাত বাড়িয়ে নিলেন। মানিকবাবুর ছেলে খাটের অন্যপ্রান্তে, দাঁড়িয়ে অথবা বসে, শীতে কাঁপছিল। কাদের যেন খেয়াল হলো, একটা গরম চাদর এলো, চাদরটা জড়িয়ে দেওয়া হলো তার গায়ে। আমি এখনও দেখতে পাই দীপেন্দ্রনাথ তার পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে চাদরটা ঠিকঠাক করে দিচ্ছেন।

*   *   *

দীপেন্দ্রনাথের একটা স্বপ্ন ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি পোস্টার আঁকছেন, টুল পেতে বক্তৃতা দিচ্ছেন কিংবা রাত জেগে পার্টি মিটিং করছেন অথবা তৃতীয় ভুবন লিখছেন তখন, সাহিত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা নিয়ে আর কোনো বিতর্ক নেই। 'অশ্বমেধের ঘোড়া' থেকে 'ঘাম', সম্ভবতঃ 'জটায়ু' ও লেখা হয়ে গেছে। দীপেন্দ্রনাথ তাঁর ধ্যানধারণা এবং বিশ্বাসে—রাজনীতিতে কিংবা শিল্পে—কড়া ধাতের হলেও নিজেকে কখনোই সীমাবদ্ধ হতে দেন নি। আর সেই জন্যেই তাঁর কর্মকুশলতা অন্য মত, অন্য ধারার শিল্পীসাহিত্যিকদের মধ্যেও ছড়িয়ে গেছে। একদিকে যেমন তিনি সহমতের শিল্পীসাহিত্যিকদের সংগঠন গড়ে তুলেছেন, ছুটে গেছেন দিল্লীতে আফ্রো-এশীয় সাহিত্য সম্মেলনে। সারা ভারত প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন আসামে, বিহারে, সংগঠনের কাজে, পশ্চিম বাংলায় প্রগতি লেখক সংঘ গড়ে তুলতে প্রাণপণ খেটেছেন, তেমনি সারাক্ষণ

দেখেছেন একটা স্বপ্ন। কমিউনিস্ট শিল্পী এবং শিল্পী কমিউনিস্ট হিসাবে দীপেন্দ্রনাথের স্বপ্ন ছিল এমন এক সম্মিলনের যেখানে সৎ সাহিত্য আর সৎ শিল্পের পটভূমিতে জড়ো হবেন সবাই, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা নিয়ে। তাঁর এই স্বপ্নের মধ্যে এমনই একটা প্রাণদেওয়ানেওয়া তীব্রতা ছিল, সততার এমন শক্তি ছিল, আন্তরিকতার এমন টান ছিল যে কেউ-ই তাঁকে অস্বীকার করতে পারতেন না।

ষাটের দশকের গোড়ায় রবীন্দ্র স্মরণে সাহিত্যিকদের একটি কমিটি হয়েছিল। পরে তাকে একটি স্থায়ী সংগঠনে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তার সভাপতি এবং অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত হন দীপেন্দ্রনাথ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে তিনি তখন অনিবার্যভাবেই পার্টির হোলটাইমার হয়েছেন এবং কাজ করছেন সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে—প্রধানতঃ পরিচয়-এ। কড়া ধরনের এই কমিউনিস্ট হোলটাইমারটিকে তার ওপরে বয়সে তরুণ, নিজেদেরই একজন এবং নেতৃস্থানীয় একজন বলে মেনে নিতে কোনো শিল্পীসাহিত্যিকেরই কখনো বেধেছে বলে শুনি নি।

সবাই যেন জানতেন সময় হলেই দীপেন্দ্রনাথ ডাকবেন, অকারণে, অসময়ে ডাক পড়বে না এবং যখন ডাক আসবে তখন যেতেই হবে। একাত্তর সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ডেকেছিলেন। সবাই এসেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে কঠোর কমিউনিস্টবিরোধী যাঁরা তাঁরাও না এসে পারেন নি। দীপেন্দ্রনাথকে সম্পাদক করে তাঁরা গড়ে তোলেন বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি। বাংলাদেশ থেকে ভেসে আসা শত শত শিল্পীকে, সাহিত্যিক আর বুদ্ধিজীবীকে আশ্রয়, খাদ্য বস্ত্র আর, সবচেয়ে বড় কথা, ভরসা এবং সম্মান দিতে পেরেছিল এই সমিতি। বাংলাদেশের যে কোনো জেলার, যে কোনো শহরে কয়েক ডজন মানুষ পাওয়া যাবেই যাঁরা এই সমিতির সম্পাদক ছোটখাট চেহারার দীপেন্দ্রনাথকে আত্মার আত্মীয় বলে মানেন। আর এই কলকাতায় মানুষকে উদার হতে শিখিয়েছিল, বড়ো হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল সমিতি। সেই ঝড়ের দিনে কেউ তার বাড়তি ঘরটি ছেড়ে দিয়েছেন চারজন অতিথির জন্যে, কেউ চারজনকে বাড়িতেই নিয়ে তুলেছেন পরিবারের সদস্যের মতো, কেউ নিয়মিত প্রতিমাসে রোজগারের একটা অংশ তুলে দিয়েছেন সমিতির হাতে, কোনো শিল্পী তাঁর হারমোনিয়মটাই উপহার দিয়েছেন বাংলাদেশী এক শিল্পীর রেওয়াজ করা হচ্ছে না দেখে। দেওয়ার মতো যাঁর কিছুই নেই তিনিও গোপনে

দীপেন্দ্রনাথের ঝোলায় গুঁজে দিয়ে গেছেন নিজের ব্যবহারের দুটি ধুতির একটি। ওপার বাংলার মানুষ যেমন দীপেন্দ্রনাথকে নিতান্ত তাঁদেরই লোক বলে ভাবেন, এপার বাংলার বহুজন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাই বোধ করেন, বড় হয়ে ওঠার খানিকটা সুযোগ দেওয়ার জন্যে।

আর-একবার। এমন সার্বজনীন আবেগের ব্যাপারে নয়, বরং খানিকটা বিতর্কিতই, রাজনৈতিক-সামাজিক বিষয়ে। পঁচাত্তরের এপ্রিলে শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলন করার ভার নেন দীপেন্দ্রনাথ। জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন তখন তুঙ্গে। দীপেন্দ্রনাথ ঝোলা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কলকাতার রাস্তায়। অবিশ্বাস্য সাড়া পাওয়া গেল। যাঁদের স্বাক্ষর পাওয়া অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল তাঁরাও ফেরালেন না দীপেন্দ্রনাথকে। যে দু-একজন ফেরালেন, চলচ্চিত্র জগতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা মনে পড়ছে, তাঁরাও 'পরিচয়'-এর দপ্তরে এসে তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করে গেলেন কেন স্বাক্ষর দিতে পারছেন না, 'ভুল বুঝো না, দীপেন'। বাংলার মঞ্চ জগতের এক প্রধান পুরুষ তিনদিন এলেন পরিচয়-এ, ব্যাখ্যা করতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চলল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরে এসে স্বাক্ষর দিয়ে গেলেন। ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে সম্মেলন হলো, এমন বিশাল ব্যাপার যে স্বাক্ষরকারী এক নামকরা সাহিত্যিক মঞ্চের কাছে পৌঁছতেই পারছিলেন না।

দীপেন্দ্রনাথ ডাকলে তাঁরা আসতেন আর দীপেন্দ্রনাথ যেতেন তাঁরা ডাকার আগেই, কারণ সম্ভবতঃ, তিনি তাঁর জোরের কথাটা জানতেন এবং জানতেন বলেই এক ধরনের দায়িত্ব বোধ করতেন। তাঁর কথায় ও আচরণে যে-বিনয় কখনো হারিয়ে যেত না—খুব দুর্যোগের মুহূর্তেও না—একমাত্র ক্ল্যাসিকাল চরিত্রেই মানায়--তার উৎস কি এই দায়িত্ববোধ? দায়িত্ব তাঁর বিশ্বের যাবতীয় অবিচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাবতীয় শিল্পীসাহিত্যিকের হয়ে লড়াই করার। আমরা, নিতান্ত আধুনিকরা তাঁকে ঠাট্টা করতাম বিবেকবাবু বলে, তাঁর সামনে এবং আড়ালেও। শুনেছি, ঠাট্টাটা তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই চলে আসছে।

দীপেন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁর বাড়িতে, শেষবারের মতো। অনেক মানুষের ভিড়, বাড়ির উঠোনে, রাস্তায়, ফুটপাথে, কেউ দাঁড়িয়ে কেউ মাটিতে বসে। বিখ্যাত একজন সাহিত্যিক যিনি হাসপাতাল থেকেই দীপেন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন, নীরবে গিয়ে দাঁড়ালেন দীপেন্দ্রনাথের এক বন্ধুর পাশে।

আলতো করে হাত রাখলেন তার কাঁধে, স্নেহে এবং সান্ত্বনায়, জরুরি সব মুহূর্তে মানুষ যেমন রাখে। দীপেন্দ্রনাথের বন্ধুটি ভাঙেন কিন্তু মচকান না। তিনি হাতটা হাতের মধ্যে নিয়ে হাসলেন—যেমন হাসি তখন হাসা যায়—তারপর গলায় হালকা ভঙ্গি এনে, যেন তেমন কিছুই হয় নি, বললেন, আমাদের তো যা যাওয়ার গেল, আপনাদের কি হবে এখন, বলুন তো।

সেই সাহিত্যিক কি জানতেন যে, দীপেন্দ্রনাথ টেবিল চাপড়ে, গলার শিরা ফুলিয়ে তাঁর জীবনের শেষ ঝগড়া করে গেছেন সরকারের এক কমিটির সভায় যেখানে সাহিত্যিকের বিরুদ্ধে অশ্লীল লেখার অভিযোগে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব পাশ হয়ে যাচ্ছিল? কমিটির লড়াই মন্ত্রী পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব ভেঙে দিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছিলেন তিনি।

দীপেন্দ্রনাথ তাঁর খুব অল্প সময়ের জীবনে একটা কিছু বুঝতে-বোঝাতে চেয়েছিলেন। এখন তাঁর অভাবে ভেবেচিন্তে দেখে ঠেকে আমাদেরই বুঝতে হবে সেটা কি ছিল?

এই লেখার তথ্য সংগ্রহে দীপেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ, সমবয়সী ও কনিষ্ঠ সহকর্মী ও বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি। লেখক

দীপেন্দ্রনাথ

কুমার রায়

ওর অসুখের খবরটা পাইনি,—হাসপাতালে থাকার খবরটাও,- তাই মৃত্যুর খবরটা বড় আকস্মিকভাবে আঘাত দিল। অসংখ্য অনুরাগীর সঙ্গে আমিও শোকগ্রস্ত হলাম।

আজ সেই দীপেনের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে কথার পিঠে কথা সাজিয়ে একটা লেখা তৈরি করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। যে মানুষটা সাজান গোছান নয়—যে মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে, আবেগ দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে সত্যের সারাৎসার ও সারল্যকে হৃদয়ঙ্গম করেছিল, ঝকঝকে মসৃণ প্রতিষ্ঠার পথকে পরিহার করেছিল —তাকে নিয়ে কলমবাজি করতে ইচ্ছে করছে না। যে যে বিষয়ে পারদর্শিতা সে দেখাতে পারত, বুদ্ধি ও বিদ্যা জাহির করতে পারত, তাকে সে তার জীবনে আচরণের সৌজন্যে ঢেকে রেখেছিল, তাকে নিয়ে কথা সাজান যায় না।

একালে এরকম মানুষের শুদ্ধতার দায় বড় মর্মান্তিক। নিছক সত্য কথাতো একমাত্র সত্য নয় এখন—মর্মে মর্মে অনুভবে একান্ত নিরালায় হয়তো বিশ্বাসের শক্ত শিরদাঁড়ায় টান পড়ত কখনো কখনো, তাই ওর মুখে সে সব মুহূর্তে একটা বিষণ্ণ হাসি,—নইলে এমনিতে তো ওর হাসিতে একটা অভিজ্ঞতা মেশানো তৃপ্তিই আমরা দেখেছি। চশমার ফাঁক দিয়ে চোখের দৃষ্টি বড় গভীর লাগত তখন। শিশিরমঞ্চে সেদিন ওঁর স্মৃতিসভায় মঞ্চে সাজান ফটোটা দেখেও তাই মনে হচ্ছিল, ও বড় গভীর কিন্তু বন্ধ পুরু ঠোঁটের ফাঁকে একটা তুষ্টি মিও বোধকরি উঁকি দিচ্ছিল, ছবিটাতে একটা ডঙ্কা বাজিয়ে চলে যাবার দম্ভও বোধহয় ছিল। এর সবটাই দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেদিনকার সভাতেই বোঝা গেল দীপেনকে অগণিত মানুষ ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত। কি দিয়ে সে এই ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আদায় করেছিল—কোন্ গুণে? সে কথাশিল্পী ছিল বলে,—সে 'পরিচয়'-এর সম্পাদক ছিল বলে,—সে সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিল বলে—? হয়তো সবগুলোর জন্যেই—কিংবা তার চেয়েও বড়, সে একজন সৎ মানুষ ছিল, সাধনায় একনিষ্ঠ ছিল।

অনেকদিন আগে, তখন ওর সঙ্গে পরিচয় হয়নি,—'চর্যাপদের হরিণী' গল্পটা পড়েছিলাম। আর সেদিন পড়লাম 'অশ্বমেধের ঘোড়া'। শুনলাম 'জটায়ু'। ধরা বাঁধা ছোট গল্পের ধারায় পা দেয় নি দীপেন—সেটা শুধু গল্পেই নয় জীবনেও। তাই সে দিন শিশির মঞ্চ থেকে বেরিয়ে কেবলই মনে হচ্ছিল, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামীয় একজন ছোটগল্পের শিল্পীকে আমরা অনায়াসেই অজস্র ফসল ফলাতে দেখতে পেতাম—প্রতিষ্ঠার সোপান বেয়ে নামী দামী হতে দেখতে পেতাম—কিন্তু না, বঁধা পথে, সাধারণ প্রথায় সে চলে না।

সে 'পরিচয়'-এর সম্পাদক হিসেবে অনেকদিন কাজ করেছে। 'সম্পাদকীয়' লিখেছে কমই। কিন্তু সম্পাদনা করেছে অশেষ নিষ্ঠা নিয়ে। ১৩৩৮-এ 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল, 'স্ব-কে জানিবার জন্য অপরের প্রয়োজন, আত্ম ও পর বৃন্তবৃন্তের মতো অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। তাই সে অপরের সান্নিধ্য চায়, তাই সে সাহিত্য চায়।...দেশ ও কালের বিস্তীর্ণ ব্যবধানের সমুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া এই সাহিত্য জগতেই সমধর্মী মন পরস্পরের সহিত করকম্পন করে, বিপরীতমুখী ঝটিকাবর্তের মধ্যেও তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে পারে।'

আবার লেখা হয়েছিল, 'কবিতা, কথাশিল্প, নাটক, কলানুশীলন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব—পরিশীলনের সকল বিভাগগুলিই যাহাতে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠে, এ বিষয়ে 'পরিচয়' সাধ্যমত চেষ্টা করিবে।' দীপেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'পরিচয়'-এর এই প্রাথমিক আদর্শ বজায় রাখার নিরলস প্রয়াস দেখতে পাওয়া গেছে। দীপেনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় এই 'পরিচয়'-এর আসরে এবং সূত্রটা অবশ্যই নাটক।

নাটক দেখতে দীপেন ভালোবাসতো। সেই ভালোবাসা পেয়েছে 'বহুরূপী'। সেই সঙ্গে আমরাও। অভিনয় শেষে সাজঘরে সে ভীড়ের মধ্যে নিঃশব্দে এসে বসতো। সকলের কথা বলা শেষ হলে একটি-দু-টি কথা বলতো। সারাক্ষণ অন্যের কথা শোনাই যেন ওর কাজ। একটু বিস্ময়, একটু মুগ্ধ ভাব আর অস্ফুটে কিছু কথা—এই হল ওর ভালোলাগার প্রকাশ। বরং

বাইরে অভিনয় শেষে পথে চলতে চলতে কিছু মন্তব্য, কিছু সমালোচনা—আর সবশেষে থিয়েটার-সম্পর্কিত ওর আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা। ঘটনাচক্রে দীপেনের শেষ লেখাটাও নাটক সংক্রান্ত।

বছর দুই আগে একবার একসঙ্গে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে মেদিনীপুর গিয়েছিলাম। বোধহয় ওখানকার কলেজ আয়োজিত সংস্কৃতি বিষয়ক কোনো সভায়। অনুষ্ঠান হয়েছিল বিদ্যাসাগর হলে। দুপুর বেলায় বাসে করে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে বিকেলের দিকে পৌঁছলাম। ওর শরীর খারাপ ছিল, বাসে যাওয়ার জন্যে কষ্ট পাচ্ছিল। কিন্তু কষ্টের কথা তুললেই কেমন লাজুক ছেলের মতো হেসে কষ্টকে অস্বীকার করছিল। ফেরবার পথে ট্রেনে রাত্রে আমার কিছু বক্তব্য নিয়ে কিছু প্রশ্ন তুলেছিল। আলোচনা হল কলকাতা পর্যন্ত। নিজের যুক্তিকে এমন ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করছিল যেন তার বক্তব্যের জোর কম। অথচ আমি অনুভব করছিলাম ওর বিশ্বাসের জোর কত বেশি—কিন্তু ভঙ্গিতে অসম্ভব বিনয়। শেষে বলল, 'ভেবে দেখবেন,—আমিও ভাবব আপনার কথাগুলো—কেননা একটু নতুন ঠেকছে।' আলোচনার ভিত্তিভূমিটা বিরোধের ছিল না—বুঝবার এবং বোঝাবার একটা বাতাবরণ। এমন মানুষকে ভালো না-বেসে, শ্রদ্ধা না-করে পারা যায়। কথার চকমকি কিংবা শক্ত আচরণ কোনোটাই ওর স্বভাবে ছিল না।

শিশিরমঞ্চে সেই স্মরণসভায় কেউ বক্তৃতা করেনি। উপযুক্ত কাজই হয়েছিল। কোনো প্রসঙ্গে তবু কে যেন বলেছিলেন যে, 'সর্বোপরি দীপেন কমিউনিস্ট ছিলেন।' সর্বোপরি দীপেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন সাচ্চা মানুষ—এই কথাটাই বোধহয় সমীচীন। বিশ্বাসটা তো ধর্ম। এবং নিজের ধর্ম পালন করতেই হয়—অন্তত করা উচিত। ধর্ম পালনের বাইরেও দীপেন্দ্রনাথ একজন সামাজিক মানুষ। ধর্ম ও বৃত্তির গণ্ডিতে মানুষের সীমানা ষোল আনায় পূর্ণ নয়। দীপেন তার চেয়ে বড় পশ্চাদপট রচনা করে গিয়েছে। এবং সেই চালচিত্রের সামনে দীপেন অনেক বড় মাপের মানুষ। তার নামের ধ্বনিকে অবলম্বন করে দুটি শব্দ রচনা করা যায় 'দীপ' এবং 'দ্বীপ'। সে আলো দেয়—সে চারপাশের নোনা জলের সঙ্গে সম্পৃক্ত সম্বন্ধযুক্ত হয়েও স্বতন্ত্র। সেই উজ্জ্বল এবং স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা জানাই।

দীপেনবাবু—কিছু স্মৃতি

ভীষ্ম সাহনি

বন্ধুর এপিটাফ লেখার মতো বেদনা ও যন্ত্রণা আর কি হতে পারে?

দীপেন চলে গেলেন। জীবনের প্রারম্ভে। সমাজকে তাঁর যা কিছু শ্রেষ্ঠ উপহারগুলো যখন দিচ্ছিলেন এমনি এক মুহূর্তে। মৃত্যু কি আর কটা বছর অপেক্ষা করতে পারত না? দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে দীপেন একটু একটু করে তাঁর গভীর মানবিক ভালবাসা ও রসবোধের যে উজ্জ্বল নিদর্শন সাহিত্যে প্রকাশ করছিলেন তা কি আর কটা বছর পরমায়ু পেতে পারত না? আমাদের সাহিত্য আরো সমৃদ্ধ হতে পারত তাঁর অনবদ্য শিল্পসৃষ্টিতে।

দীপেন সম্বন্ধে ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে হয় কত বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে তাঁকে সাহিত্য রচনা করতে হয়েছে। কত অসুবিধার সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুঝতে হয়েছে। প্রকৃতি ছিলেন তাঁর প্রতি উদাসীন। সুস্থ সুন্দর একটি দেহ থেকে চিরবঞ্চিত করে রেখেছিলেন। সমাজও ছিল মুখ ঘুরিয়ে। ফলে বছরের পর বছর ধরে কোনোমতে শুধু বেঁচে থাকবার জন্য তিনি বাধ্য হয়েছিলেন কঠিন সংগ্রাম করে তাঁর রুটির জোগাড় করতে। শত অসুবিধার সঙ্গে দীপেন একটার পর একটা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন অসীম সাহসিকতায়। রেখে গেছেন আমাদের জন্য কয়েকটি গ্রন্থ, যা অনেক লেখকের মনেই ঈর্ষা জাগায়, ও একটি নাম। এ নামের চারপাশে বলয়ের মতো শোভা পাচ্ছে তাঁর চারিত্রিক বিশুদ্ধতা, সাহিত্যে অবিচল নিষ্ঠা ও অনমনীয় মেজাজ। চলার পথে যত প্রতিবন্ধকতাই থাকুক না কেন, তাঁর সাহিত্য-

সৃষ্টি যত সামান্যই হোক, এ যুগের বহু নামজাদা লেখকের সমগ্র সাহিত্য রচনাকে ম্লান করে দিয়েছে। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদনা, সৃজনশীল সাহিত্য রচনা ছাড়া দীপেন আরো একটি বড় দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি ছিলেন সর্বভারতীয় সংস্থা ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ প্রোগ্রেসিভ রাইটার্সের সম্পাদক। সংস্কৃতি-ফ্রন্টের একনিষ্ঠ নিরলস কর্মী হিসেবেও তিনি নিজেকে চিহ্নিত করে গেছেন।

প্রায় সাত বছর আগে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত প্রগতি লেখক ও শিল্পী প্রতিনিধিদের সমাবেশে তাঁর তেজঃদৃপ্ত ভাষণ শুনে আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে পড়ি। সেই প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। যদিও এর অনেক আগে আমি তাঁর নাম শুনেছি। আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, প্রগতির বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের আহ্বানে সমাবেশের গোটা আবহমণ্ডল সম্পূর্ণ বদলে যায়। আত্মসন্তুষ্টির একটি ছিমছাম ধারণা নিমিষে সম্পূর্ণ উবে যেতে বাধ্য হয়। উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ অনেক সতর্কতা নিয়ে একের পর এক সিদ্ধান্ত নিতে থাকেন। আমার যতদূর মনে পড়ে এ ঘটনা ঘটেছিল প্রগতি লেখক ও শিল্পী-সঙ্ঘের গয়া সম্মেলনের প্রাক্কালে। দীপেনের খোলামেলা অথচ দৃঢ় বক্তৃতা আমার মতো অনেকেরই মনে এই সঙ্ঘের আন্দোলনের প্রতি আরো আগ্রহ জুগিয়েছিল একথা অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়বার দেখা হল গয়া সম্মেলনে। মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম সেই এক সরলতা, সাথীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ও সঙ্ঘের কর্মসূচীর প্রতি গভীর নিষ্ঠা। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করলে আমাদের ধ্যান-ধারণা নতুন নতুন দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ত। অনুষ্ঠানে সকলেই তাঁর অনুভবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতেন। এমনি ছিল তার দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও অপূর্ব বাচনভঙ্গী।

পাটনা, কলকাতা, দিল্লীতে প্রায়ই বৈঠক বসত। প্রতিটি সভাই, আমার কাছে মনে হত, তাঁর ব্যক্তিত্বের নতুন প্রকাশ। তাঁরই সম্পাদিত কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধের একটি বড় সংকলন-গ্রন্থ (প্রতিরোধ প্রতিদিন) তিনি আমাকে দিলেন। তখন আমরা দুজনেই পাটনাতে। এ-সময়ে ইংরেজিতে অনূদিত তাঁর দুটি গল্পও আমাকে পড়তে দিলেন। মনে আছে, মধ্য এশিয়ার কোনো একটি দেশে, আফ্রো-এশিয়ার কোনো একটি সম্মেলনে যোগদানের পর তিনি একটি রিপোর্ট আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বহু সম্ভাবনাপূর্ণ লেখক। প্রাণশক্তিতে ভরপুর। আবেগে অস্থির এক দীপ্ত পুরুষ লেখক।

আমরা আবার জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের গভীর পরিতাপ, এ বছর আর তাঁকে দেখতে পাব না। তাঁকে বাদ দিয়ে সম্মেলনের চেহারা কেমন হবে, বড় দুঃখ লাগে সে দৃশ্য কল্পনা করতে। মানুষ সব ক্ষতিই ধীরে ধীরে সয়ে নেয়। শুভার্থী বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুর মতো গভীর ক্ষত সৃষ্টি হলেও নিজেকে অভ্যস্ত করে নিতে পারে। কিন্তু সংগঠনের ক্ষতি? তা কি আদৌ কোনোদিন পূরণ হবে? তাঁর প্রগতি-শীলতা চারপাশের সব কিছু এমনি করে বদলে দিয়ে যেত যা আমাদের প্রগতি লেখকদের আন্দোলনের এক মস্ত বড় বিস্ময়, নির্ভরও বটে।

একথা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করতে বাধ্য, আমি বরাবরই ওর কাছ থেকে শুধু পেয়েই এসেছি। ওর মূল্যবান সমালোচনা ছিল আমার কাছে এক নতুন প্রেরণা। দীপেনের ছিল এক 'ডেডিকেটেড কমিটমেণ্ট'। এরই আকর্ষণে আমরা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। ভালোবাসতাম। আজকে ওর অভাবে আমরা অসহায় বোধ করি।

দীপেনকে দেখলে সবসময়ই বিষণ্ণ ও অসুস্থ বলে মনে হত। এ নিয়ে আমরা মজা করে বলতাম, 'ছোট্ট রুগ্ন মানুষের মধ্যে যদি এত আগুন, আর এত তেজ লুকিয়ে থাকতে পারে, ভাবা যায় না, দীপেন, আপনি যদি পরিপূর্ণ সুস্থ দেহ পেতেন তাহলে না জানি কি হত?' ওর ঐ বিষণ্ণতা ও অসুস্থতাকে ধরে নিয়েছিলাম একটা পাকাপোক্ত বন্দোবস্তেরই মতো। ভাবতাম, বছরের পর বছর এমনি করেই কাটবে। কিন্তু কখনো ভাবি নি দীপেনকে এত শীঘ্র, এত দ্রুত হারাতে হবে। তাঁর রুগ্ন বিষণ্ণ মুখখানি আমাদের সামনে থেকে কখন চুপিসাড়ে মিলিয়ে গেল। টের পেলাম না।

ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ প্রোগ্রেসিভ রাইটার্সের তরফ থেকে আমরা দীপেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

অনুবাদ: শৈবাল চট্টোপাধ্যায়

দীপেন

মহাশ্বেতা দেবী

দীপেনেব সঙ্গে আমার বহুকালের পরিচয়। প্রথম বোধহয় দেখি ওকে বিয়ের পরে, কলেজ স্ট্রীটে, চিন্ময়ীও সঙ্গে ছিলেন। কোনদিনই পরিচয় আলাপে পৌঁছয় নি। বয়সের পার্থক্য তো ছিলই। তা ছাড়া কলকাতায় সব সময়ে একই কাজের মানুষদের দেখা হয় না। আরো কোথাও দেখা হবার কথা ও পবে বলত, আমি মনে কবতে পারি নি, এখনো পারছি না। আমি মনে করতে পারতাম না বলে ও বেজায় অবাক হয়ে যেত, কিন্তু ওকে বলেছিলাম দশ-বারো বছর আগে হলে আমাব ঠিকই মনে পড়ত। ১৯৭৩ থেকে বাড়িতে বহু মৃত্যুর অভিজ্ঞতাব জন্যেই হয়তো এখন আব পেছনের কথা মনে করতে পাবি না তেমন।

দীপেনের সঙ্গে আমার সংলাপ-সংঘর্ষেব কথা কিছু বেশ মনে আছে। বাংলাদেশ সহায়ক লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সমিতি (সমিতির উদ্দেশ্য তাই, আমার শব্দস্মরণে ভুল হতে পারে) গঠনে ও আমার নাম দিতে চায়, বোধহয় চিঠিও পাঠায়। আমি 'না' বলি, বা লিখি। অন্য কেউ হলে এ নিয়ে মাথা ঘামাত না। দীপেন কিন্তু ফোন করে। আমি যা বলি, তাব বক্তব্য এ রকম—বাংলাদেশ বিষয়ে যাঁবা স্বেচ্ছাসেবীর কাজ কবছেন, তাঁদের আমি জিনিসপত্র জোগাড করে দিচ্ছি এবং আমার ধারণা আমি স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে রি-অ্যাক্ট করছি। দীপেন তখন খুব হেঁড়ে গলায় (কণ্ঠস্বর সুমধুর ছিল না) বলল, কিন্তু আপনি লেখকও তো বটেন? তখন আমি সিধে কথায় এলাম। বাংলাদেশে যা হচ্ছে তা নিন্দনীয় একেবারে। কিন্তু সেখানে অস্বাভাবিক অবস্থায় অস্বাভাবিক নৈগুণ্য চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতার ছেলেরা, এপাড়া থেকে ওপাড়ায় যেতে নিত্য নিহত হচ্ছে।

সে বিষয়ে উক্ত সমিতির কোন ইনভল্‌ভমেন্ট নেই যখন, তেমন সমিতির সঙ্গে আমি থাকতে নারাজ। পশ্চিমবঙ্গে কি স্বাভাবিক অবস্থার মুখোশের পেছনে অস্বাভাবিক বর্বরতা চলছে না? দীপেন জাত ভদ্রলোক। ও আমার স্বযুক্তিতে স্থির থাকার ব্যাপারটি মেনে নেয়। মনে ও কিছুই পুষে রাখে নি। কেননা 'দ্রৌপদী' পড়ার পর নিজেই এগিয়ে আসে বন্ধু পাতাতে। এ রকমটি কলকাতায় ঘটে না। কে কাকে পনের বছর আগে কি বলেছিল, কে কার লেখার সমালোচনায় রূঢ় সত্যভাষী কঠোর হয়েছিল, তার ভিত্তিতেই মানুষ অন্য মানুষের সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে। দীপেন ছিল সব ক্ষুদ্রতার ওপরে।

তারপর ১৯৭৭ সালের কথা। কিন্তু তার আগেই বলে নেওয়া ভাল, দীপেনের বিষয়ে আমি যা লিখব, তাতে ১৯৭৭ সালের পুজো থেকে পরের পুজো অবধি আমি যা যা লিখেছি, সে সব কথা খুব এসে পড়বে। তার কারণ হল, ওই সব লেখার ভিত্তিতে আমাদের মধ্যে একটা আশ্চর্য বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমার লেখা পড়া, সবজায়গায় তা নিয়ে কথা বলা যেন ওর একটা কাজ হয়ে উঠেছিল। তা করতে গিয়ে ও নিজেকে, নিজের স্বাস্থ্যকে আরো ক্ষয় করেছিল কিনা, তা ভাবলে পরে আমার বেজায় কষ্ট হয়। দীপেন খুব গভীর একটা ক্ষত রেখে গেছে তো। এখনো কত সময়ে বসে বসে ভাবি, এখন যা লিখব, লিখছি, সে সব কথা বলতে পারলে ওর কাছে, আমার কত ভাল লাগত। কত সময়ে মনে হয় আবার দেখা হবে। আবার এও মনে হয়, তাই যদি হবে, তাহলে চেনা মানুষদের মতো দীপেন বা ছবি হয়ে গেল কেন। বয়স হলে এলোমেলো চিন্তা বাড়ে।

দীপেন ও আমার নতুন করে পরিচয় হতই না, যদি না একদিন নবারুণ যেত তার কাছে 'পরিচয়' অফিসে, এবং প্রসঙ্গত আমার কথা না উঠত তাতে-দীপেনে। যা বললাম, তা আমি খুব বিশ্বাস করি, কেন না ৭০-৭১ সালের ভূমিকায় বহু গল্প—হাজার চুরাশির মা, অরণ্যের অধিকার, আরো আগে কবি বন্দ্যঘটী, সবই লিখেছি, এবং দীপেন তখনো লিখতে বলে নি আমাকে। এগুলি কিছু সাহিত্যের অমূল্য রত্ন নয়, তবু এর ভিত্তিতেও ওর মনে হতে পারত। কিন্তু সব কিছুরই সময় থাকে জীবনে। আমার লেখা প্রসঙ্গে ও নবারুণকে বলে, আমি 'পরিচয়'-এ লিখছি না কেন? নবারুণ বলে, আপনি কি লিখতে বলেছেন? লিখে একথা জানাব? দীপেন একটি চিঠি লেখে আমাকে, এবং আমি 'দ্রৌপদী' লিখে

সচিঠি পাঠাই। দীপেন উত্তরে উচ্ছল প্রশংসা জানিয়ে লিখেছিল 'শাবাশ মহাশ্বেতা দেবী'। দুটো তালব্য 'শ' দিয়ে 'শাবাশ' লেখা সঠিক হলেও শব্দটা দেখতে মজার। খুব হেসেছিলাম এবং সত্বর ভুলে গিয়েছিলাম। তবে 'দ্রৌপদী'র সঙ্গে যে চিঠি লিখি, তা বেশ কঠিন ছিল, এবং, আমি ওকেও বলেছি পরে, আমি ভাবি নি 'পরিচয়' ও গল্প ছাপবে। জরুরি অবস্থায় আমার একাধিক অপ্রিয় অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যা হোক, 'দ্রৌপদী' গল্প দীপেনকে যেন আমার প্রতি আগ্রহী করে। ওর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত অথচ আশ্চর্য এক বন্ধুত্বের জন্যে আমি নবারুণের কাছে ঋণী।

আটাত্তরের জানুয়ারিতে (?) দূরদর্শনে এক প্রোগ্রামে বিজয়গড় কলেজ থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে ছুটছি। দীপ্তি সিনেমার মোড়ে দেখি দীপেন। ট্যাক্সি খুঁজছে। আমরা একসঙ্গেই গেলাম, এবং দীপেন যথারীতি ভাড়া অফার করল। সেদিন খানিক গল্প হয়। তখনো আমরা কথায়-বার্তায় খুব অন্তরঙ্গ নই। সেদিন ও, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় খুব গল্প করে, তিনজন একসঙ্গেই ফেরে।

তারপর ৭৮-এর পুজোর লেখা। এর আগে থেকেই ও খুব সিরিয়াসলি পড়তে থাকে আমার লেখা। মুখফিরতি শুনতাম। মার্চে অনীশের মৃত্যু। আমি এমনিতেই যাই না কোথাও, তখন তো মোটে নয়। এমন সময়ে, পুজোর পর, একটি গল্প সংকলনের পরিকল্পনা করি। ওর সঙ্গে কথা কইব বলে ভাবছি, কলেজ থেকে ফিরে শুনি, সত্য গুহ এবং দীপেন এসেছিল। শুনে খুব ভয় পাই, সত্যর ওপর হয় রাগ। আমার ঘরে ওঠার সিঁড়িটি ঘোরানো সিঁড়ি আর ওই সিঁড়ি থেকে পড়েই অনীশ চলে যায়। সত্যকে খুব বকে জানাই, দীপেনের দরকার থাকলে আমি দেখা করতে যাব। সে এ-হেন সিঁড়ি ধরে উঠবে না, বা নামবে না। আর দীপেনকে, একই কথা জানিয়ে, পরিকল্পিত বইয়ের কথাও লিখি। ইচ্ছা ছিল, ওর কাছে বসেও এ-বিষয়ে কথা কইব। উত্তরে এই চিঠিটা এল,—

S. S. K. M. Hospital
C. I. Block
Room : 31
Calcutta.

মহাশ্বেতাদি,

আপনার ৯।১২।৭৮ তারিখের চিঠি আমি ১৫ তারিখে পেয়েছি। ১৮

তারিখে কিছু চেক্-আপের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। এইসব নানা কারণে উত্তর দিতে দেরি হল।

১ আপনার কথামতো দুটি গল্পের নাম জানাচ্ছি। (ক) 'পরিপ্রেক্ষিত': আমার 'হওয়া না-হওয়া' গল্প সংকলনে আছে। (খ) 'শোকমিছিল': সম্ভবত ১৯৭৪ সালের শারদীয় 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

২ 'শোকমিছিল' গল্পেই নকশালপন্থীদের প্রসঙ্গ আছে।

৩. গত রবিবার কুশল নাগের (ইনি প্রকাশক। দীপেন পাঠিয়েছিল: ম. দে.) সঙ্গে দেখা হয়েছে। ও কিন্তু আপনার কোনো চিঠি পায় নি।

মনে হচ্ছে আমাকে মাসখানেক থাকতে হবে। সুতরাং, মহাশ্বেতাদি, পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে তাহলে তো আপাতত দেখাশুনো হয় না। চারটে থেকে ছটা দেখা করার সময়। মনে হয় আমার ঘর তখন লোকবোঝাই থাকবে। আপনার ছুটির দিনে দুপুর নাগাদ একদিন আসুন না।

হাসপাতালে পড়ার জন্য আপনার দু-দুটো বই নিয়ে এসেছি—'অরণ্যের অধিকার' ও 'অগ্নিগর্ভ'। সহজে শুরু করছি না, বেশ তারিয়ে তারিয়ে পড়ব।

সম্প্রতি একদিন সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি গিয়েছিলাম। কথায় কথায় তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় আপনার সাম্প্রতিক রচনার প্রসংসা করলেন। একদিন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গেও নানা বিষয়ে দু-ঘণ্টার ওপর আলোচনা হল, একান্তে। বুদ্ধদেবও প্রসঙ্গত বললেন 'মহাশ্বেতা দেবীর এখনকার অনেক লেখা পড়েই বাঙলা সাহিত্যের এবং মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা জাগে।' আবার খুব সাধারণ পাঠকও আপনার অনেক লেখা পড়ে অভিভূত হচ্ছেন। এই যে নানা ধরনের মানুষ ও নানা স্তরের পাঠককে আপনি ছুঁতে পারছেন—এই ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগছে।

তবে, আপনার প্রচণ্ড গুণগ্রাহী হওয়া সত্ত্বেও, আমার মনে আপনার এবারের লেখা সম্পর্কে কিছু কিছু সমালোচনা জন্মেছে। সেসব কথা সাক্ষাতে বলা যাবে।

আপনি সুস্থ শরীরে দীর্ঘদিন বাঁচুন এবং লিখুন। নিজেকে দ্রুত পুড়িয়ে ফেলবেন না।

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি গ্রহণ করুন। ইতি

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯.১২.৭৮

পুনশ্চ: চিঠির উত্তর বাড়ির ঠিকানায় দেবেন। ঠিকানা নিশ্চয়ই লেখা আছে, তবু আবার জানাচ্ছি।

612/1
Block—O
New Alipur
Calcutta-53
700053

চিঠিটা যথাযথ তুলে দিলাম। দীর্ঘকাল কারো চিঠি রাখি না। পাই, জবাব দিই, ছিঁড়ে ফেলি। দীপেনের চিঠিটা থেকে যাবার কারণ হচ্ছে, ওটি দেখে হাসপাতালে যাই। তারপর ব্যাগে রেখে দিই, ভুলে যাই। ও চলে যাবার পর আবিষ্কার করলাম, ওটা আছে। তারপর আর ছিঁড়তে হাত ওঠে নি।

হাসপাতালে যাই ২৫শে ডিসেম্বর। কবিতা সিংহ ও আমি। সে ওর কত কথা, কত হাসি, আর শুধু আমার কথা। 'বিছন' পড়েছে, আরো আরো লেখা। 'অমৃত' জোগাড় করেছিল। সে পরের দিন দেখি। শেষ যেদিন যাই। ১০ই জানুয়ারি। প্রথম দিনে অনেকে এলেন একে একে। বেচারা গেটম্যান ভাবত, ৩১নং ঘরে কে এসেছে। এত ভিড় কেন? আমি ও কবিতা ভিজিটিং কার্ড ছাড়া, স্রেফ তাপ্পি দিয়ে ঢুকে গেলাম। সেদিন চিনুকে দেখলাম কত দিন পরে। জ্যোতি ও মালবিকা এসেছিলেন। আরো কয়েকজন। সেদিন কি ও আমাকে ছাড়ে? যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। এ সব ভাবলেই ওর ওপর আমার রাগ হয়। পারতপক্ষে আমি কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হই না। দীপেন কেন বন্ধু পাতাবার সব দায় স্বীকার করে, অনেক স্মৃতির টুকরো দিয়ে আমার মন ভরে রেখে চলে গেল? যত কথা হয়েছিল, তার মধ্যে আমি কয়েকটা পয়েন্ট ছাড়ি নি, যেমন ওর প্রথম কর্তব্য লেখক দীপেনের প্রতি। 'পুজোর 'পরিচয়' কাগজে লেখা চাই' লিখে নাম সই করা যথেষ্ট নয়। এবং সেজন্য ওকেই নির্মম হতে হবে। আমার যা মনে হত তাও বলেছিলাম—মনে করবি কিছুই লিখিস নি। যথেষ্ট ভালো লেখা কিছু লিখলেও আমার মনে হয়েছিল দীপেন অপচিত

হচ্ছে। ও কিন্তু আমার কথার প্রতিবাদ করে নি, আর যে লেখা লিখবে, তার কথা বলেছিল। আজ মনে হয়, যারা তাকে মানুষ হিসেবে জানে তারাও তো থাকবে না সবাই। একজন লেখক তো বাঁচবেন তাঁর সৃষ্টিধর্মী লেখায়? দীপেনের বেলা কেন হিসেব উলটে যায়? অন্যেরা তো রাজনীতি করতে পারেন। লিখতেও পারেন? দীপেন হয়তো নিজের জন্য নিজে যথেষ্ট সময় দিতে পারে নি। সেখানে কি কারো কোনো দায়িত্ব ছিল না? দীপেন তো জাত লেখক মানুষ। একজন দীপেনকে কেন অপচিত হতে হয়? কত বছর লেখেনি ও? আর, একজন দীপেনের না-লেখার অপরাধ যে সকলের থেকে যায়! ওর মত ছিল, বিশেষ কোনো সময় নিয়ে আমি যা লিখেছি, তারপর আর লেখার কিছু নেই। আমি প্রথমে ওকে বলি, 'তোর ভাবা হয়েছে আমার বিষয়ে', তারপর ওকে বলি, বেশ কিছু তরুণ লেখকের লেখা আমার কাছে কত আশাপ্রদ, আমার আর একলা লাগে না। এদের অনেককে দীপেনও চিনত। কিন্তু আমার আগ্রহ দেখে ও বিশ্বাস করেছিল। ওকে এদের লেখা নতুন করে পড়তে হবে। ও আমার কাছে অনেক পুরনো কথাও শুনতে চাইত, যেসব সময় ওর বয়সীরা চোখে দেখে নি। সেদিন যত কথা হয়, তা অন্যদের হয়তো মনে থাকবে। আমার শুধু মনে পড়ে ওর আনন্দে অবিশ্বাসে উজ্জ্বল মুখ আমাকে দেখে। ও তো বলতই, আমি নাকি ওর সামনে সব বলতে কইতে পারি, আমার সাত খুন মাপ। প্রথম দিন দু-ঘণ্টার বেশি ছিলাম।

তারপর 'সোভিয়েত দেশ' অাপিসের পরেশ দাশ মশাইয়ের অসুখের কারণে হাসপাতালে গেলেও ওর কাছে যাওয়া হয়নি। দুজনে দু-প্রান্তে। ফোন করে নিত্য খবর নিতাম। ১০ই জানুয়ারি বুধবার আবার যাই। সেদিন ও ভাল বোধ করছে না। অক্সিজেন দেখলাম নামানো। বন্যা গিয়েছিল। সেদিন দীপেন ব্যক্তিগত অনেক কথা বলে। আমি ওকে, ওর শুভার্থে অনেক কথা বলি, আজ সে-সব কথায় ফিরে যাব না। সেদিনই বলে, 'অমৃত' কাগজটা নিয়ে রেখেছি, পড়তে পারি নি।' চলে আসার আগে ও কয়েকটি কথা দেয়। তাতে বোঝা যায়, শরীর যাই বলুক, মনের জোর অটুট ছিল। কত কথা সেদিন বলেছিল। কত কথা দিয়েছিল।

এই তো দীপেনের কথা। খুব অল্প সময়ে ও আমাকে ওর খুব কাছে যেতে দিয়েছিল, আমার সৌভাগ্য। নিজের সবটুকু যেন মেলে ধরেছিল, আমার সৌভাগ্য। তারপর ১৪ই জানুয়ারি।

সংসারে যে আদায় করে নিতে পারে চেঁচিয়ে, বা অন্যের মদতে, তারাই সব পায়। দীপেন তেমন মানুষ ছিল না। ১৪ই জানুয়ারি আমার কাছে এখনো খুব ধোঁয়াটে। খারাপ ভয়ের ফিল্মের মতো। সেদিন আমার জন্মদিন। হঠাৎ এল সোহাগ, পিণাকী, ওদের ছেলে। মহানন্দে দিন কাটল। সকালে ফোন করে খবর নেব। কানেকশানই পাই না। বিকেলে ফোন করতে অচেনা গলায় উত্তর। তারপর নবারুণকে ফোন। ও নিজেও তখনো জানে না। 'কালান্তর' থেকে ফোন করে ও জানাল কখন কি হবে। ছুট ছুট, ট্যাক্সি। তারপর সেই অদ্ভুত দৃশ্য। দীপেন। কিন্তু বোধহয় চোখে তুলসীপাতা, পায়ের নিচে আলতা, এদিকে আন্তর্জাতিক গান। আর সমস্ত ভয়াবহতাকে সুগোল করতে আকাশবাণীর অসীম-অসহ-অশেষ ঔদ্ধত্য—সন্ধ্যার স্থানীয় সংবাদে দীপেনের নাম নেই। অথচ খবর মিলছিল না বলে মকর সংক্রান্তিতে ধর্মপ্রাণ মানুষের হাসিমুখের কথা পাকা ফলের মতো স্বাদু গলাতে বার বার বলা। আকাশবাণীই করতে পারে এই অসৌজন্য। যদিচ দানশীলা বৃদ্ধা বা অমুক ব্যবসায়ী মরলেই স্থানীয় সংবাদ হন। দীপেনের খবর না বলা মানে নিজেরা ছোট হওয়া, তাও বোধহয় আকাশবাণী জানেন না। এমন মানুষের খবর দুপুরে বলা যথেষ্ট নয়, সন্ধ্যার খবরই সবাই শোনে।

একথাও যেমন সত্যি, তেমনি এও তো সত্যি, দীপেন গেছে রাজার মতো। রাজনীতিক দল বা কাগজ ভাঙিয়ে নিজের সুবিধার্থে কিছুই করে নি কোনোদিন। তাই সকলের ভালবাসা আর সম্মানও নিয়ে চলে গেল। আর আমাকেই লিখেছিল, 'নিজেকে পুড়িয়ে শেষ করবেন না।'

আত্মার দীপ্তি

গোপাল হালদার

দীপেন নেই—তার কথা লিখতে হবে। তারাশঙ্করের 'অগ্রদানী' গল্পটার কথা মনে পড়ে।

মানুষ যখন আপনার হয়ে পড়ে তখন তার সম্বন্ধে কথা বলা দুরূহ। কারণ, তখন সে দশজনের মতো আর নয়, তখন যে সে অপরিমেয়। দশজনের সামনে তার সেই রূপ প্রত্যক্ষ করে তুলতে পারে শিল্পীর তুলি—যে-তুলিতে বুকের রক্ত ও মনের রং মিশে এক হয়ে যায়। আরো বুঝি চাই, প্রেমের নিগূঢ়তাকে ধ্যানের নিশ্চয়তার দ্বারা রূপান্বিত করে তোলার মতো শক্তি। না হলে, সে-আপনার মানুষের কথা বোঝানো যায় না। সেই অপরিমেয় মানুষের কথা এখন থাক। এখনো তার নাগাল পাব না। দশজনের সঙ্গে এক হয়েও যেখানে সে একক, অপরিমেয় ছাড়াও যেখানে তাকে অনন্য বলে অনুভব করেছি, সেই একান্ত প্রিয় অনুজের বিশিষ্ট রূপটিই স্মরণ করতে চাই।

সৃষ্টির জন্মগত অধিকার নিয়ে দীপেন জন্মেছিল। সেই সঙ্গে ছিল সাহিত্যবোধ। সাহিত্যিক মাত্রেরই যে সুস্থির সাহিত্যবোধ থাকে, তা নয়। সৃষ্টির ও দৃষ্টির সব সময় মিলন ঘটে না। কিন্তু যথার্থ স্রষ্টার থাকে সেই সুনিশ্চিত দৃষ্টি, আরো থাকে গভীরতর সত্যবোধ ও প্রেম। প্রথম থেকেই দীপেনের ছিল এই সব—সৃষ্টির শক্তি ও দৃষ্টির নিশ্চয়তা, সত্যবোধ ও প্রেম—

ছিল সবই—ছিল আপনাকে প্রকাশের বিকাশেরও সংকল্প। তাই সাহিত্যে যখন সে পা দেয় নিতান্ত তরুণ বয়সে, তখনই দেখা যায় সত্যের সেই প্রভাতী দৃষ্টি তার চোখে, তার ললাটে আর তার কথায় ও কলমে। বোঝা যায় জীবনের আশ্চর্য সত্য তাকে আহ্বান করেছে, পৃথিবীর এ যুগে স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে তার দ্বিধা নেই—সে মানুষকে ভালোবাসে। তাই প্রথম থেকেই কোথাও ছিল না তার আড়ষ্টতা, কোথাও কৃত্রিমতা। বিপ্লবই যুগের সাধনা, আর সে বিপ্লব সাম্যবাদের বিপ্লব, সকল দেশের বঞ্চিত মানুষের মুক্তি—সাম্যবাদে, সৌভ্রাত্রে, প্রেমে সকল জাতির আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠায়।

অথচ এই পথে দীপেনের পক্ষে বাধা কম ছিল না—জন্মাবধি বাধা তার নিজের নাতিদৃঢ় দেহ, ব্যাধি প্রতিবন্ধ। এক মুহূর্তের জন্যও সে-সব কোনো বাধা সে মানে নি। আবাল্য বাধা তার পারিবারিক পরিস্থিতি—যাতে সাম্যবাদের দিকে পদক্ষেপই ছিল অনভিপ্রেত, আত্মীয় ও হিতৈষীদের প্রতিকূলাচরণ। সাংসারিক ও বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আবেষ্টনীর্তে সমাজসম্মত পথে আপন প্রকাশের প্রলোভন কি কম বাধা হতে পারত সাহিত্য-যশঃপ্রার্থীর পক্ষে? অদূর সংকটের দিনে প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠাকামী সাহিত্যিকদের সে প্রলোভন বা আত্মছলনা তো কতভাবেই কুক্ষিগত করেছে। এ-সব কিছুই দীপেনকে এক নিমেষের জন্য দ্বিধান্বিত করে নি। প্রথম থেকেই দৃঢ়চিত্তে সে জেনেছে—তার পথ মানুষের মুক্তির পথ, তার তপস্যা সৃষ্টির তপস্যা, সর্বব্যাপী প্রেমের তপস্যা। জীবনের এই সত্যকে অঙ্গীকার করেই তার যাত্রারম্ভ, তার সৃষ্টিশক্তির ক্রমপ্রকাশ।

অনেকদিন পরে দীপেন একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল এই অগ্রজকে, 'কী মনে হয়—রাজনীতির দাবি কি সাহিত্যের পথে বাধা হয়ে ওঠে?'

'তা নির্ভর করে প্রত্যেকের স্বভাবের ও উপলব্ধির ওপরে। এমন মানুষ আছে যাদের স্বভাবের মধ্যে ও-দুই পথ অভেদ, তাদের জীবনের মধ্যে দুই পথ এক হয়ে ওঠে—যেমন গর্কি। অনেকের স্বভাব আবার তা নয়, তাতে দুই পথ জড়িয়ে থাকে, পৃথক হলেও সমগ্রের মধ্যে অঙ্গীভূত, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তাই। আবার কারো স্বভাবে দু পথ দু পথই—সেই ভেদরেখায় তাদের জীবন খণ্ডিত না হোক, সীমিত। তবে একালে, জীবনের সত্য এতই অখণ্ডিত আকারে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, সীমা টানা যেন মনুষ্যত্বকেই সীমাবদ্ধ করা। কারো কারো স্বভাবই এমন যে, রাজনীতি

ও সাহিত্য দুইয়ে মিলেই যেন সে 'আমি' হয়। অবশ্য স্বভাবের সঙ্গেই আছে উপলব্ধির দাবি—মাত্রাহীনতা, প্রমত্ততা, মতবাদের ঝোঁক সেই উপলব্ধির দিকটাকে আচ্ছন্ন করে দিতে পারে—ক্ষণে ক্ষণে দেয়ও। রাজনীতি কেন, সকল ঝোঁকই তা করে—ধর্মের ঝোঁক, এমন-কি কলা-কৈবল্যের ঝোঁকেই কি তা হয় না? আসল কথা জীবন-সত্যকে গ্রহণ, দৃষ্টির মধ্য দিয়ে সৃষ্টির উজ্জীবন। স্বভাব তার মধ্য দিয়ে সত্য হয়ে ওঠে, পরিণতির দিকে পৌছায়— Ripeness is all।

এ-যুগের সৃষ্টি ও এ-যুগের দৃষ্টির সঙ্গে এই বন্ধন-রচনা এ-যুগের জীবনের অপরিহার্য নির্দেশ। তাতে, আচ্ছন্ন নয়, সচেতন হওয়া, তারই দাবি—জীবন-সত্যের দাবি।"

কি বলেছিলাম, বুঝিয়ে বলতে পেরেছিলাম কি না তা জানি না। কারণ তার প্রয়োজন ছিল না—আমার সামনেই ছিল সেই দৃষ্টির ও সৃষ্টির সচেতন সাধক—দীপেন্দ্রনাথ। দেখছিলাম শুধু দেহের পুষ্টিতে, বেশবাসে অমনোযোগী সেই যুবককে নয়, দেখছিলাম—আপন দৃষ্টি ও সৃষ্টি-প্রতিভার চিহ্নাক্রান্ত সেই 'হরিণকে'—যে 'আপনা মাসেঁ হরিণা বৈরী।'

সে-প্রতিভা দীপেনকে শান্তি দিত না। দীপেন শুধু আপনার দৃষ্টিকে স্বচ্ছ ও সৃষ্টিকে সুস্থির করে তুলেই নিশ্চিন্ত নয়—দু হাতে ও ঝুলিতে রাশি রাশি বই ও সংবাদপত্র, পক্ষ-প্রতিপক্ষের কোনো কথাই সে খুঁটিয়ে না পড়ে ছাড়বে না, অনুকূল-প্রতিকূলে কোনো লেখকের সাক্ষ্যকেই সে বিচার না করে নিশ্চিন্ত নয়, সামনের সঙ্গে বন্ধন-রচনায় সে বদ্ধপরিকর—বদ্ধপরিকর গৃহবৃত্তের সঙ্গে মানববৃত্তের প্রেমের সর্বাঙ্গীন বন্ধন রচনায়। আবার শুধু সেই উপলব্ধিতেও সে শান্ত নয়। জীবন-সত্য তাকে সৃষ্টির দাবিতেই টেনে নিয়ে চলল সৃষ্টির অনুকূল দৃষ্টির স্বচ্ছতা-সাধনে, সংগঠনে, অনুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠান রচনার কর্মে। তাতে প্রমাদ গণি নি—বিস্মিত হয়েছি তার অভাবনীয় কর্মতৎপরতায়, অদ্ভুত কর্মদক্ষতায়, অদম্য তার উৎসাহে, অপরাজেয় মনোবলে। আমার মতো ক্লান্ত অগ্রজেরা তাকে দেখে তখন আশ্বাস লাভ করতে চেয়েছি, আবার সম্পূর্ণ আশ্বস্তবোধও করি নি।

যুদ্ধান্তের মুক্তি-অভিযান দেশে দেশে রঙে-রূপে আর অম্লান অক্ষত থাকছে না। সাম্যবাদের ব্যাপ্তির মধ্যেই দেখা দিয়েছে ভেদরেখা, সোভিয়েত-চীনে, আর স্বদেশে-সর্বদেশে। তাতে সাম্যবাদের প্রেরণা আর সৃষ্টির সুশৃঙ্খল উজ্জীবন অব্যাহত থাকতে পারছে কি না, জানি না। জানি, ইতিহাসের পথ,

জীবন-সত্যের বিকাশ, ঘাতে-প্রতিঘাতেই ও পতন-অভ্যুদয়েই দুর্বার গতি, শত বিঘ্ন সত্ত্বেও অপ্রতিরোধ্য সৃষ্টির দাবি। কিন্তু এ-ও জানি, আপাতত সে পথ উপল বন্ধুর। কর্মে-সংগঠনে এই বহু জটিলতায় পীড়িত আত্মঘাতী দেশে এ-পর্বে যতটা শক্তি ব্যয়িত হবে তদনুরূপ ফল লাভ হবে না। সেই দুরূহ সাধনায় তারাই এখন আহরণ করবে, যাদের মনের ঐকান্তিকতার সঙ্গে আছে দুর্ভার বহনের মতো দেহ, শুধু সঙ্কল্প নয়—সেই সঙ্গে বজ্রকঠিন স্বাস্থ্য, বাহুতে বল, সংগঠনে কৌশল। দীপেন সেই দিকে এগিয়ে গেলে আত্মবলিই দেবে—আর তার ফলে আমরা, অগ্রজরা, হারাব বর্তমানের সংবেদনশীল এই ছায়া সুন্দর চিত্তের আশ্রয়, আমাদের ভাবী দিনের রূপকারকে—তার সৃষ্টিপ্রতিভার দানে রচিত হবে আমাদের অভিজ্ঞান।

দীপেনের কর্মোৎসাহে তাই মনে মনে সম্পূর্ণ স্বস্তি বোধ করতে পারি নি। বরং চেয়েছি—দীপেন লিখুক, লিখুক, আরো লিখুক। 'জীবনে জীবন যোগ'-সে করেছে, সে এখন লিখুক। লেখাই তো তার স্বধর্ম। এক-একটি তার লেখা হাতে পৌঁছতে লাফিয়ে উঠেছি, 'হওয়া না-হওয়া' পড়তে পড়তে বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছি—লিখুক, দীপেন, লিখুক। তার গভীরে যে-আত্মপ্রত্যয় ছিল, সংগঠন কর্মে যে-কুশলতাও ছিল, তার অজস্র প্রমাণ পেয়ে তখন চমৎকৃত না হয়েছি, তা নয়। শেষ পর্যন্ত তাকে না-লিখে পারি নি, 'বিবাহ-বার্ষিকী' পড়ে—দীপেন, লেখো, লেখো, লেখো—যা কেউ লিখে উঠতে পারছে না, হয়ত লিখতে পারবেও না, তুমিই তা লিখবার অধিকারী, তোমারই আছে সে শক্তি, ঘরের সঙ্গে বাহিরের এমন প্রেম-সমন্বয়ের সাধনা তোমারই মধ্যে রূপ লাভ করছে—জীবনকে সম্পূর্ণ করে দেখার মতো দৃষ্টি, অখণ্ড করে উপলব্ধি করার মতো আত্মার দীপ্তি। আর তোমার সেই প্রকাশের মধ্যেই উজ্জ্বল হবে যুগের তপস্যা, সঞ্জীবিত হবে আমাদের প্রতিভা, আমাদের পরিচয়।

'পরিচয়' চালনার ভার যখন দীপেন নেয় তখন তার চেয়ে যোগ্যতর কাউকে আমি দেখি নি। তবু নিজের অভিজ্ঞতার ফলে আমি তাতেও সর্বাংশে আশ্বস্ত বোধ করি নি। আমার অভিজ্ঞতা একেবারে মিথ্যা নয়, কিন্তু আশঙ্কা যে কতটা অমূলক তা আমার কাছেও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল 'পরিচয়' চালনায় দীপেনের অসামান্য কর্মকুশলতায়। আমি যাঁদের দিয়ে 'পরিচয়'-এ লেখাবার কথা ভাবতেও সাহস করি নি, তাঁদের দিয়ে সে লেখাল, নিয়ে এল তাঁদের স্বাক্ষর 'পরিচয়'-এর পাতায়—এ শুধু তার অদম্য পরিশ্রম না, আত্মপ্রত্যয়

ও সৌজন্য নয়, আন্তরিকতারও প্রমাণ। তার রাজনীতির পরিচয় কারো নিকট অজানা নয়, কারো কাছে সে 'পরিচয়'-এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেনি। তথাপি প্রত্যেককে সে আকৃষ্ট করলে নিজের ঐকান্তিকতায়। দীপেনের সঙ্গে, তার নীতির সঙ্গে একমত না হয়েও তাঁরা 'পরিচয়'-এ লেখা দিয়েছেন, তা দিয়ে উঠতে না পারলে দীপেনের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন, যে মত, যে পথ দীপেনের মতো মানুষের এই চারিত্রশক্তিকে সচেতন ও সবল করে তাকে তুচ্ছ ভাবতে পারেন নি।

দীপেন যখন এক-একটি বিশেষ সংখ্যার পরিকল্পনার প্রস্তাব নিয়ে আসত আমি তখন তাতে সায় দেয়ার অপেক্ষা যা করতাম তা হচ্ছে প্রকারান্তরে তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা। মনে হত, দুশ্চেষ্টা—আমাদের সে সামর্থ নেই। বারেবারেই চমকিত ও চমৎকৃত হয়ে বুঝেছি—তার আত্মপ্রত্যয় শুধু আত্মপ্রত্যয় নয়, তার আত্মার দীপ্তি।

এই সত্যটা আরো অনুভব করতে হয়েছে যখন 'প্রগতি লেখক সংঘ' পুনর্গঠনে তার উৎসাহ ও আয়োজন দেখি। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝতাম, এ দুঃসাধ্য। এ বিষয়ে আমার একটা তাত্ত্বিক ধারণাও ছিল—এখনো তা যায় নি। অনেক প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানেরই জীবন বিশেষ পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। পরিস্থিতি বদলে গেলে প্রতিষ্ঠানের প্রাণও আর স্ফূর্তিলাভ করতে পারে না। এ-কথা অনেকটা সত্য—সর্বত্র নয়। তবে, এ প্রসঙ্গে আরো একটা ধারণা আমার মনে ঠাঁই পায়—হয়তো তাও সচরাচর মিথ্যা নয়। যেমন—প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই এক ধরনের প্রাণধর্মের অধীন, যৌবন-জরা ছাড়িয়ে তাকে টিকিয়ে রাখতে চাইলে কি হবে? তা প্রাণশক্তিতে আর সচল থাকে না, বড় জোর 'establishment' রূপে 'অচলায়তন' বা 'চার্চে' পরিণত হয়। কতকগুলি আয়োজন উপকরণের জোরে কোনো কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠান তার পরেও টিঁকে থাকতে পারে, কিন্তু হয়ত নবকলেবর ধারণ করতে হয়, নয় তা ফসিলত্ব প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে মরবার অনেক আগেই অনেক প্রতিষ্ঠান মরে, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে দলাদলিতে পচ ধরে! হয়তো এদেশে পঞ্চাশ বৎসরের বেশি কোনো প্রতিষ্ঠান জীবিত থাকে না—যুগের প্রয়োজনে তখন নতুন উদ্যোগ ও নতুন আয়োজন নতুন প্রতিষ্ঠানকে জন্ম দেয়। নতুন দৃষ্টিতে তাকে নতুন সৃষ্টিতে উদ্যোগী হতে হয়—পুরনো নামরূপ চলে না। 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'-এর যে-ঐতিহ্য তা গৌরবের। সে সময়ে প্রাণমন্ত্রের ধারক হিসাবে বাংলায় প্রায় একটা রিনাসেন্সের সূত্রপাত হয়েছিল। শুধু সাহিত্য

নয়, সংস্কৃতি সৃষ্টির বাহন হয়েছিল তখন প্রগতি আন্দোলন। কিন্তু আজ সে-রিনাসেন্স নেই। নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে নতুন রিনাসেন্সের। কিন্তু সে জন্য এখন প্রয়োজন সর্বজনীন শিক্ষার উদ্বোধন, নবজীবন সৃষ্টির তপস্যা। দীপেন সে বিষয়ে অন্ধ ছিল না—সে তপস্যাতেই ছিল তার আগ্রহ, সুদূর হলেও। বিপ্লবী সংস্কৃতিকে সন্নিকট করার জন্যই ছিল তার প্রতিজ্ঞা। স্বাস্থ্যের বাধা-বিঘ্ন ও সকল দুর্যোগের মধ্যেও সেই নবজীবনের গানকে দীপেন দিতে চেয়েছে রূপ। লেখার মতোই যখন সভায়-সম্মেলনে সে দাঁড়িয়েছে তখন তার মুখে, তার কণ্ঠে, তার সৃষ্টির বাণী-রচনায় দেখেছি তার আত্মার দীপ্তি। শুধু তার নিজ বিশ্বাস নয়—জীবন-সত্যের উপলব্ধিতে তা উজ্জ্বল। বারেবারে তখন আমারও মনে হয়েছে, প্রতিষ্ঠান (ইনস্টিটিউশান) পুনর্জীবিত না হোক, সেই প্রগতি আন্দোলন নবজীবন সৃষ্টির প্রতিজ্ঞায় অমর। সেই ভবিষ্যতের আভাস বহন করে এনেছে তাঁর সৃষ্টির তপস্যায় এই অনুজ। আমাদের ভবিষ্যৎকে তার সাধনায় দেখতাম মূর্ত।

দিনের পর দিন—কথায়, আলোচনায়, উদ্যোগে, আয়োজনে, সৃষ্টির সুগম্ভীর মহিমায় আর আত্মার দীপ্তিতে আমাদের এই একান্ত অনুজ হয়ে উঠেছিল আত্মার আত্মজ, অপরিমেয়, অপরিমেয় তার আত্মার দীপ্তিতে।

মুখোমুখি

সমরেশ বসু

দীপেন,

সম্বোধনটা এই রকমই থাক। আজ, যখন তুমি জীবন্ত শরীর নিয়ে আর উপস্থিত নেই, আর হবে না কোনোদিন, তখন একটু মুখোমুখি কথা বলা যাক। কারণ, তুমি মানুষ ও সাহিত্য রচয়িতা হিসাবে কেমন ছিলে, সে-বিচারের ভার নিতে আমি অক্ষম। সেইজন্য তোমাকে নিয়ে বিশেষ কোনো রচনায় হাত দিতে চাই না। আজ একটু নিভৃতে, মুখোমুখি কথা বলা যাক।

সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়াটা যে-কোনো রকমের সৃষ্টিকর্তার পক্ষেই নাকি ক্ষতিকর। হতে পারে। আমি তোমাকে কোনোদিক থেকেই সৃষ্টি করতে বসি নি, অতএব আমার সে-ভয় নেই। তোমার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে বসে যদি সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ি, জানবো, সেটাই আমার চরিত্রের লক্ষণ।

এ সংসার থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়াটাই শেষ যাওয়া না। মানুষ তার জীবের পরিচয়ে এখানেই বিশিষ্ট, তাই না? কেবল কবি সাহিত্যিক শিল্পীদের নিয়ে কথাটা অর্থপূর্ণ না, সকল মানুষের ক্ষেত্রেই। সকল শ্রেণীর মানুষই গতায়ু আত্মীয়র কথা স্মরণ করে, তার চিহ্ন রেখে দেয়। মুখোমুখি কথা বলাটাও, অতএব, প্রিয়জনের সঙ্গে ঘটে থাকে। এমনটা তুমি আমি আমরা অনেক দেখেছি। সদ্য লোকান্তরিতকে স্মরণ করে, মানব-মানবী মাত্রেই কতো কথা বলে ওঠে। তারা হয়তো মহাপুরুষ বা মহামানবী না।

নিতান্ত সাধারণ মানুষ। অসাধারণরা তো সহজে বিচলিত হোন না। হোন কী? হলে কি তাঁদের চলে?

যেদিন সকালে আমার বাসার সামনে ঘন ঘন গাড়ির হর্ন বেজে উঠলো, আর সেই সঙ্গে নাম ধরে ডাক, তখন ভাবতেও পারি নি, দরজায় ঘা না মেরে কে ডাকছে? এতো তাড়া কিসের? তার কিছুদিন আগেই, বারেবারেই মনে হচ্ছিল, আমার কাছে তোমার আসার সময়ের যে একটি অয়নবিন্দু তুমিই প্রায় স্থির করে দিয়েছিলে, তার অস্ত হয়ে যাচ্ছে কেন? তোমার দেখা নেই কেন? আসছো না কেন? 'জরুরি দরকার হলে এই ঠিকানায় একটা কার্ড ড্রপ করে দেবেন। অথবা কালান্তর অফিসে একবার ফোন করে জেনে নেবেন। সন্ধের দিকে পরিচয়ের পাশের ঘরে টেলিফোন করেও ডাকতে পারেন। নাম্বারটা লিখে রাখুন…।' একটু দ্বিধা, কয়েক মুহূর্তের, তারপরে, 'আলিপুরের বাড়ির ফোন নাম্বারটাও লিখে রাখতে পারেন, জরুরি কোনো দরকার পড়লে, ফোন করবেন· ।'

তোমার আমার সম্পর্কের মধ্যে জরুরি ব্যাপার যে-গুলো ছিল, আমি নিজে সে-সব বিষয়ে খুব ভাবিত ছিলাম না, কিংবা বলা চলে, সেইসব জরুরি ব্যাপারগুলোর সবই ছিল হঠাৎ হঠাৎ। আচমকা। হয়তো-দুপুরেই তোমার হাতে দরজার কড়া বেজে উঠতো, দরজা খুললেই, চোখের দিকে তাকিয়ে সেই একটু হাসি, 'কি, ব্যস্ত ছিলেন, বিরক্ত করলাম তো?'

'এসো এসো।' জবাব তো আমার একটাই ছিল। বিরক্ত করতে কী না, সে-জবাব তো আমার থেকে তোমারই ভালো জানা ছিল। ছিল না? 'বসো বসো।'

'ব্যাপারটা জরুরি।' বসেই তুমি কাঁধের ঝোলা থেকে কিছু কাগজপত্র বের করতে, 'আপনাকে কোনো পার্টির ব্যাপারে অংশ নিতে বলছি না, কিন্তু ফ্যাসিবিরোধী এই আন্দোলনে সাহিত্যিক-শিল্পীদের সঙ্গে আপনার নামটা থাকা উচিত। কাগজটা একটু চোখ বুলিয়ে নিন, তা হলেই বুঝতে পারবেন...।'

আমি ততক্ষণে কলম তুলে নিয়েছি। লাখে না মিলল এক, এরকম কারো কারো সততা, অকপটতা এমনই প্রশ্নাতীত, চোখ বুলিয়ে নিয়ে কিছু বোঝবার দরকার হয় না। অথচ দীপেন, তুমি তো জানতে, এমারজেন্সির সেই দিনগুলোকে আমি অশুভ অন্ধকারের দিন বলেই জানতাম। ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের সময়ও ছিল তখনই, কিন্তু তোমার

কাছে দলের দিক থেকে সেটা ছিল বিপরীত দিকে। তুমি অবিশ্যি আমাকে বলেছিলে, 'জয়প্রকাশ নারায়ণের বিরুদ্ধে আপনাকে কিছু বলতে বা লিখতে বলছি না। আমরা পৃথিবীর সব সাধারণ মানুষই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, আপনি শুধু…।' তুমি বৃথাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছিলে। আমি তার মধ্যে সই করে দিয়েছিলাম। তুমি হেসেছিলে।

আমাকে কেউ অন্ধ ভাবতে পারে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে, ব্যক্তিবিশেষে আমাকে অন্ধ বলা যায়, কারণ আমি জানতাম, তুমি যখন বলছো, তখন, সেটাই ঠিক। এটা কোনো সম্মোহিতের উক্তি না, অকৃত্রিম বিশ্বাসের কথা। এই বিশ্বাসের দরুন আমার ভূমিকা হয়তো অন্যের ভ্রূকুটি ও অবিশ্বাসের কারণ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আমি নির্ভয় ও দ্বিধাহীন। তার কারণ, তুমি। আমার যে অটল বিশ্বাস, তুমি কখনো অন্যায় করতে পারো না। আমি অন্ধ? তবে বলি, সব অন্ধত্বই মূঢ়তা না। আমি অবিবেচক? সব ক্ষেত্রেই বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ খুব একটা বিবেচকের কাজ না। তোমার মতো নিষ্ঠাবান সৎ মানুষের মুখোমুখি হয়েই একমাত্র এসব কথা বলা যায়।

ক'মাস আগের কথা, ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠা টেলিফোনের রিসিভার তুলতেই, তোমার কিছুটা উদ্বিগ্ন উত্তেজিত স্বর শোনা গিয়েছিল। 'একটা বিশেষ জরুরি ব্যাপার, আপনার একটা বই আমার আজ এখুনিই চাই·।' তুমি আমাকে অবাক করে দিয়ে এমন একটি বইয়ের নাম করেছিলে, যে-বইটি আমার রচনার কোনো উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠতার চিহ্ন বহন করে না। সমাজের একটা ব্যাধি, আর তার সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া দুটি নর-নারীর প্রেম-সম্মোহনের কাহিনী। তোমার উত্তেজিত স্বর শোনা গিয়েছিল, 'বইটা আপনি বের করে রাখুন, আমি লোক পাঠাচ্ছি, তার হাতে দিয়ে দেবেন…।' কিন্তু বইটা তো তখন এক কপিও বাড়িতে ছিল না। শোনা মাত্র তুমি একটু ঝেঁজেই বলেছিলে, 'তা হলে বইটির প্রকাশককে এখুনিই টেলিফোন করে জানিয়ে দিন, আমার নাম করে যে যাবে, তার হাতে যেন এক কপি বই দিয়ে দেয়। ব্যাপারটা জরুরি। বুঝলেন, খুবই জরুরি…।' তুমি লাইন কেটে দিয়েছিলে।

আমি মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি নি। প্রকাশককে টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর তিনদিন বাদে তুমি এলে। আমি তোমার চোখের দিকে জিজ্ঞাসু অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তাকিয়ে আছি। তুমি হেসে বললে, 'ফরগেট দ্যাট ম্যাটার, ওসব ভুলে যান, ও কিছু নয়। এখনো

অনেক সৎ আর চিন্তাশীল মহিলা-পুরুষ আছেন। বৃথাই শুধু কিছু তর্ক আর কথা কাটাকাটি। তবে বইটা আপনি এমন কিছু ভালো লেখেন নি।' হাসতে হাসতে বললে, 'চা খাব।'

নিশ্চয়ই। কিন্তু বইটা যে আমার লেখা হিসাবে তেমন কিছু না, সেটা তো আমিও জানতাম। তবু, ব্যাপারটা কী?

'কিছুই না। ভুলে যান।' তুমি তোমার মতো করেই হেসে বললে, এবং তবু, দু-একটি অস্পষ্ট ঝাপসা কথা বললে, যা থেকে স্পষ্ট কিছু না বুঝলেও একটা ঝাপসা অনুমান করে, বিষণ্ণ হয়ে পড়লাম। তুমি হঠাৎ বর্তমান সরকারের এক নবীন বয়সের মন্ত্রীর নাম করে বলে উঠলে, 'ও কিন্তু রিয়্যালি খুব ভালো ছেলে। ওর সম্বন্ধে যে-যা বাজে কথা বলুক, আপনি একদম বিশ্বাস করবেন না...।'

আচমকা একথাটা এতোই অপ্রাসঙ্গিক মনে হলো, আমি তোমার দিকে অবাক চোখে তাকালাম। তুমি হো-হো করে হেসে উঠে বললে, 'আমি জানি, আপনি এসব নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। তবু বললাম, মনে হলো, তাই।'

দীপেন, তুমি কি বলতে চেয়েছিলে, হয়তো বুঝতে পেরেছিলাম। কিংবা বুঝিনি। তবু অনেক কথা মনে আসছিল। সে-সব কথা বলার দরকার নেই, কারণ, তা হলে নিজের কথাই সাত কাহন বলা হয়ে যাবে। আজ তোমার সঙ্গে, কেবল তোমারই কথা।

দীপেন, তোমার এমনি নানান জরুরি কথার মধ্যে, ইদানিং কয়েক বছরের সব থেকে জরুরি কথাটা জুনের গোড়াতেই, কিংবা যে মাসের মাঝামাঝি শোনা যেতো' পরিচয়ের পুজোর লেখাটা কিন্তু অগাস্টের গোড়াতেই চাই। আরো আগেই বলতে পারতাম, তবে আমি জানি, আপনার ঠিক মনে আছে। অবিশ্যি, আপনাকে আমি মাঝে মাঝেই তাগাদা দিয়ে যাবো।'...কথার শেষেই হাসি, আসলে 'তাগাদা' কথাটা তোমার ভয় দেখানো আমি জানতাম। কারণ তুমি জানতে, তাগাদা ব্যাপারটাকে আমি সত্যি ভয় পাই। যদিও তুমি যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিতে, এবং প্রায় শেষ মুহূর্তে কোনো সুবোধ তরুণের হাতে তোমার চিরকুট আসতো, 'আর একদিনও সময় নেই, গল্পটা এর হাতে দিয়ে দিন। লেখা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে? আমি কিন্তু তাগাদা দিই নি।'

সত্যি কত বড় অস্বস্তি আর অসহায় বোধ করতাম এবং আমাকে লিখতে হতো, 'আর আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দাও...।' কিন্তু তোমার প্রেরিত দূত বলতে

ভুলতো না, 'আপনারটাই শুধু বাকি—।' আমি আটচল্লিশ ঘণ্টাকে বাহাত্তর করার চেষ্টা করতাম না, বরং কমাবার চেষ্টাই করতাম। পরিচয়ের মাঝখানে অনেকগুলো বছরে কী ঘটছিল, কিছুই জানি না। আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। কী কারণে, তাও আমি জানি না। ধরেই নিয়েছিলাম, আর বোধহয় কখনো যোগাযোগ ঘটবে না।

কিন্তু দীপেন, আমার ধরে নেওয়া বিশ্বাসটাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দিয়ে, তুমিই নতুন করে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলে, 'পরিচয়ে আপনি লিখবেন না, এটা হতেই পারে না। পরিচয় আপনার আঁতুড় ঘর—লেখক হিসাবে। বেশি দাবী করবো না, বছরে অন্তত একবার, শারদীয় সংখ্যায় একটি গল্প, চাই-ই চাই।'

কেবল সত্যি বলোনি, 'আঁতুড় ঘর' কথাটি খুব লাগসই বলেছিলে, এবং লেখাটাও তোমার দাবী ছিল প্রত্যেক শারদীয় সংখ্যাতে। ১৯৪৬ এ শারদীয় পরিচয়েই আমার লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই নতুন যোগসূত্রটা ক বছরের? চার পাঁচ বছরের হবে? কিন্তু এই একটিমাত্র কারণেই তোমার যাওয়া-আসা ছিল না। আরো কারণ ছিল, তেমন জরুরি না হলেও। কিন্তু দিন চলে যাচ্ছিল, তুমি আসছিলে না কেন? এদিক ওদিক খোঁজখবর নিতে, ঠিক মনে করতে পারছি না, কে যেন বলেছিল, তুমি পি. জি. হাসপাতালে আছো। কেন? না, উদ্বেগের কোনো কারণ নেই, নিতান্তই চেক্ আপ্-এর জন্য। অসুখ বিসুখ কিছু করেনি।

আমি তোমার দু-একটা শারীরিক কষ্টের কথা জানতাম। কিন্তু হাসপাতাল, চেক আপ্, শব্দগুলোকে ইদানিং মোটেই ভালো লাগতো না। হ্যাঁ, একরকম কুসংস্কারই বলতে পারো। তোমার বয়সের সঙ্গে শব্দগুলো আরোই বেমানান। আজকাল কথায় কথায় হাসপাতাল, চেক আপ্। হয়তো ভালোই। তবু, সবকিছুরই একটা সময় আছে তো। আমি তাড়াতাড়ি তোমার চেক আপ্ সেরে ফিরে আসার অপেক্ষা করছিলাম। তার মধ্যেই একদিন সকালে মোটরের হর্ন বেজে উঠলো। দরজায় ঠক্‌ঠক্ নয়, বাইরে ক ডাক, 'সমরেশবাবু।'

বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলাম, প্রসূন—প্রসূন বসু। ওর মুখে সেই চিরাচরিত সি নেই। চশমার আড়ালে দু চোখে তখনও যেন অবাক জিজ্ঞাসা। ডাকলাম, 'এসো।'

'না, আপনি আসুন।'

'কোথায় ?'

'পি. জি.-তে।'

'কেন ?'

'দীপেন—।'

'দীপেন ?'

'দীপেন—।' প্রসূনের চশমার কাঁচের আড়ালে, ওর বড় চোখ দুটো যেন ভাবলেশহীন। ঠোঁট দুটো ফাঁক করা।

মুহূর্তেই অমঙ্গলের কালো ছায়া আমাকে গ্রাস করল। দীপেন, এতে কোনো চমক নেই, ঝলক নেই, তোলপাড় করা নেই। অমঙ্গল সূচিত হয় যেন চেতনার গভীরতর অন্ধকারে। ঘরে ঢুকে জামাটা গায়ে চাপিয়ে রাস্তায় নেমে গেলাম। প্রসূনের গাড়ি ছুটল পি. জি.-র দিকে। সেখানে পৌঁছে শুনলাম, তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আলিপুরে তোমাদের বাড়ির সামনে দেখলাম, শববাহী শকটের কাঁচের আধারে তুমি শুয়ে আছো। তোমার মাথার কাছে ফুল। ফুলের মালাও কি ছিল ? মনে করতে পারি না। এগিয়ে গিয়ে তোমার মুখের দিকে তাকালাম। তোমার চোখ বোজা। কিন্তু আমি কি ভুল দেখলাম ? একটা কেমন কষ্টের অভিব্যক্তি যেন তোমার মুখে ফুটে রয়েছে। তোমার বাঁ নাকের ছিদ্রটা পরিষ্কার করে দিতে ইচ্ছা করল।

দীপেন, কোনো মানে হয় না, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করবো, 'তুমি কি সত্যি আর কথা বলবে না ··?' চিরদিনের জন্য বাকরুদ্ধ তুমি, আর কথা বলবে, না। কিন্তু যে-সব কথা বলে গিয়েছো, সে-কথাগুলোই এখন মনে আসছে। সে-সব কিছু কম কথা না। মুখোমুখি বলতে গেলে, অনেক সময় বয়ে যাবে। ইতিমধ্যে তোমাকে কাঁচের আধার থেকে বাড়ির ভিতর দরজার সামনে ... যাওয়া হয়েছে। রাস্তার দু-পাশে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন তোমার অগণিত কমরেডস, অনুরাগী, গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধবেরা। তোমার মেয়ে একটি লবঙ্গ শাদা চন্দনে ডুবিয়ে তোমার কপালে পরাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর চোখের জলে সব ধুয়ে যাচ্ছে। দেখে আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। অপরাহ্ণে আবার— আর একবার তোমাকে দেখতে গেলাম কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। তখন বৈদ্যুতিক চুল্লির কাছে তুমি শায়িত। তোমার গায়ে জড়ানো লাল পতাকা।

তোমার ছেলের গায়ে পিতৃদশার পরিচ্ছদ। পুরোহিত ওকে মন্ত্র

পড়াচ্ছেন। তারপরে মুখাগ্নির পালা। তোমার কমরেডরা ইন্টারন্যাশনাল গেয়ে উঠলেন।' আমি মন্ত্র শোনবার চেষ্টা করছিলাম। তখন যুগপৎ আমার বাবা, আমার পুত্রদের কথা মনে পড়ছিল।

দীপেন, এপ্রিল শেষ হলো, আজ মে মাসের প্রথম দিন। সব জেনেও, আমি কিন্তু দ্বিপ্রহর অতীত না হতেই, দরজায় করাঘাতের জন্য রোজ অপেক্ষা করবো। কাঁধে ব্যাগ, ছোটখাটো মানুষটি তুমি, দরজা খুলতেই হাসি। আমি শোনার অপেক্ষায় রইলাম, 'ব্যস্ত করলাম না তো? মনে করিয়ে দিতে এলাম, গল্পটা ·।'

১ মে, ১৯৭৯

তোমার চির প্রীতার্থী

সমরেশবাবু

উপন্যাস

শব্দের খাঁচায় : অসীম রায় ৬-০০

মস্তক বিনিময় : (Thomas Mann-এর Transposed heads-এর বঙ্গানুবাদ) অনুবাদক : ক্ষিতীশ রায় ৪-০০

লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে : গোলাম কুদ্দুস ১৫-০০

নীল নোট বই (ইমানুয়েল কাজাকোভিচের ব্লু নোটবুক-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক : নৃপেন ভট্টাচার্য ৪-০০

বেনিটোর চাওয়া পাওয়া (আনা সেগার্স-এর—Benito's Blue-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক—বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ৪-০০

মানুষ খুন করে কেন : দেবেশ রায় ৩০-০০

গোবিন্দ সামন্ত : লালবিহারী দে-র 'Bengal Peasants Life'-এর বঙ্গানুবাদ সাধারণ ৪-৫০

কমরেড : সৌরি ঘটক ৪-৫০